আমার ইউরোপ ভ্রমণ

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

অনুবাদ

পরিমল গোস্বামী

চর্চাপদ
১৩বি, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম সংস্করণ
জুন ১৯৯০

প্রকাশক
বিশ্বদীপ ঘোষ
চর্চাপদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড
১৩ বি রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা-৭০০ ০১২

অক্ষরবিন্যাস
ফ্রিবার্ড প্রোডাকশনস্
৪/৬৮ চণ্ডীতলা লেন, টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০৪০

মুদ্রক
ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি.
১৪৩ ওল্ড যশোহর রোড, গঙ্গানগর
কলকাতা ৭০০১৩২

প্রচ্ছদ
হিরণ মিত্র

মূল পুস্তকের ভূমিকা

শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অপর দুইজন ভারতীয়কে ভারত সরকার ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ঔপনিবেশিক এবং ভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন। ত্রৈলোক্যনাথ ইউরোপে ১৮৮৬ এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর, এই নয় মাস ছিলেন। তিনি প্রধানত ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপ সফর করেন। তিনি যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার ভ্রমণ সংক্রান্ত কোনও পুস্তক রচনা করিবার কথা মনে হয় নাই, সেই কারণে তিনি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও পরপর লিখিয়া রাখেন নাই। তিনি ভারতে ফিরিবার পর তাঁহার কতিপয় বন্ধু তাঁহাকে ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে অনুরোধ করেন। বিশেষ করিয়া ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকার ম্যানেজার তাঁহাকে প্রতি সপ্তাহে তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণ বিবরণ লিখিতে বলেন। ত্রৈলোক্যবাবু ওই অনুরোধে সম্মত হন, এবং প্রধানত তাঁহার স্মৃতি, কিছু জমাইয়া রাখা নিমন্ত্রণ পত্র, তালিকা এবং গাইড-বইয়ের সাহায্যে তিনি তাঁহার স্মৃতি ধারাবাহিকভাবে প্রতি সপ্তাহে প্রায় দেড় বৎসর কাল উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বর্তমান গ্রন্থটির অনেকখানিই ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকায় প্রকাশিত কাহিনীর পুনর্মুদ্রণ। কিছু যাহা পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা মৌলিক নহে, নিতান্তই ব্যবহারিক কারণে। পত্রিকায় প্রকাশ কালে পুস্তকটির কোনও অধ্যায় বিভক্ত করা ছিল না, পুস্তকে তাহা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, পত্রিকায় প্রকাশকালে বর্ণনায় যে সকল অসঙ্গতি ছিল তাহা দূর করা হইয়াছে। প্রথম প্রকাশ এবং পরবর্তী প্রকাশ, এই দুই ক্ষেত্রেই আমার প্রুফ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে—তাই, যখন ত্রৈলোক্যবাবু আমাকে এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার সম্মান দিতে চাহিলেন তখন কেবলমাত্র ওই প্রুফ দেখিয়াছিলাম বলিয়াই রাজি হইয়াছি—আর কোনও যোগ্যতা আমার নাই। এই পুস্তক কোন অবস্থায় এবং কিভাবে লিখিত এবং প্রকাশিত হইয়াছিল জানিতে পারিলে পাঠকেরা বুঝিবেন প্রসঙ্গক্রমে সাম্প্রতিক কোনও বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য কেন এই পুস্তকে করা হইল (যেমন ২৫৩—২৫৭ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে)।

লেখক হিসাবে ত্রৈলোক্যবাবুর উচ্চাকাঙ্খা নাই। তাঁহার রচনাশৈলী সম্পর্কে যদি মন্তব্য করিতেই হয় তাহা হইলে ইহা বলা যায় তাঁহার ভাষা কাটা কাটা এবং ইডিয়ম সংযুক্ত। তাঁহার ভাষার বড় গুণ হইল তাহা বাধাহীন এবং সরল। তাঁহার হৃদয়ে স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি রহিয়াছে—তিনি মধ্যে মধ্যে রূপকের ব্যবহার করিলেও তাহা কখনই অবোধ্য হয় না। যাঁহারা ইংরাজী ভাষাকে পবিত্র মনে করেন সেইসব ব্যক্তিরা হয়ত তাঁহার ব্যবহৃত ইংরাজীকে মনে করিবেন তিনি একটু বেশি স্বাধীনতা লইয়া ফেলিয়াছেন, কেননা তিনি এখানে ওখানে সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে এবং বিপদের কথা সম্পূর্ণ মনে রাখিয়াই এক-আধটা

নতুন অর্থবহ শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন।

তাঁহার প্রধান চেষ্টা ছিল তাঁহার বক্তব্য সঠিকভাবে প্রকাশ করা এবং তাহার জন্য যতটা স্বাধীনতা লওয়া প্রয়োজন তাহা লওয়া—ফলে কখনও তিনি প্রচলিত প্রথাকে সর্বত্র মানিয়া চলেন নাই। সমাজ সম্পর্কে তাঁহার কিছু কিছু মত এমন কথায় প্রকাশ করিয়াছেন যাহা আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ, কিন্তু আসল অর্থ তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু এইভাবে তিনি সমালোচনা করিলেও তাঁহার ভাষায় তিক্ততার লেশমাত্র নাই। কিছু কিছু এমন বিষয় লইয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন যেগুলি সম্পর্কে সকলে একমত না-ও হইতে পারেন, হয়ত তাঁহার মতকে সকলে গ্রহণীয় বলিয়াও মনে করিবেন না, কিন্তু তীব্রতম সমালোচনার সময়ও তাঁহার ভাষা সর্বদাই শহুরে এবং দ্বেষ-বর্জিত।

বইখানিতে কেবল ঘটনার বর্ণনা নাই—ইহার মধ্যে বর্ণনার সঙ্গে রহিয়াছে তাঁহার বক্তব্যের চমৎকার মিশ্রণ। তাঁহার রচনার সহিত আর্থার ইয়ং-এর রচনার মিলই বেশি, স্টার্ন-এর সঙ্গে মিল কম। তিনি যাহা দেখিয়াছেন তাহা ত লিখিয়াছেনই, তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাঁহার চিন্তাধারা। ত্রৈলোক্যবাবুর ক্ষুদ্র বিষয়গুলির প্রতিও দৃষ্টি পড়ে এবং তাহা প্রকাশে তাঁহার হাত খুলিয়া যায়। ৪১ পৃষ্ঠায় লিখিত ব্যাংকারের বাড়ির বর্ণনা, কিংবা ৪৫ পৃষ্ঠায় দরিদ্র দম্পতি এবং ৩১১—১২ পৃষ্ঠায় পার্লামেণ্ট ভবন সংক্রান্ত বিবরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিদেশী মানুষদের সম্পর্কে এত বিশদ বর্ণনা সচরাচর ভ্রমণ কাহিনীতে পাওয়া যায় না। মনে হয় এই কাহিনীর মধ্যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণই সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান বিষয়। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিন্তাধারাও কম মূল্যবান বলিয়া মনে হয় না। ৪০ পৃষ্ঠায় তাঁহার লণ্ডন "সিটি" সংক্রান্ত বর্ণনা অসাধারণ বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহার বর্ণনা সত্যনিষ্ঠ, কম কথায় বলিবার এবং কল্পনার প্রচণ্ড ক্ষমতাও পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ না করিয়া পারে না। কখনও তাঁহার দ্রষ্টব্যস্থল বর্ণনায় ঐতিহাসিক অংশটি একটু যেন বেশি আসিয়া গিয়াছে—তবে কম কথায় সারিবার যে দোষ তাহা অপেক্ষা বেশি কথা বলা কম দোষ ইহা স্বীকার করিতেই হয়। বড় বড় কীর্তির বর্ণনা বা তাহার সহিত জড়িত সংস্থাগুলির ঐতিহাসিক বিবরণগুলি ওইসব বিষয়গুলিতে স্পষ্ট ধারণা জন্মাইতে সাহায্য করে—অন্যথায় যাহা সম্ভব ছিল না। ত্রৈলোক্যবাবু যে সমস্ত স্থানে সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনীতির প্রসঙ্গ আনিয়াছেন এবং তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন—বিশেষ করিয়া যে সকল স্থানে নীতির প্রশ্ন জড়িত, সেগুলি লইয়া কোনও কোনও মহলে বিতর্ক উঠিতে পারে, কিন্তু সেগুলির প্রাসঙ্গিকত্ব অথবা তাঁহার স্বাধীন মতামত সম্পর্কে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। হিন্দু এবং ইংরাজ চরিত্র সম্পর্কে তাঁহার মূল্যায়ন যে নিবিড়ভাবে আলোচিত হইবে তাহা সুনিশ্চিত। তাঁহার রচনা উদ্দীপকারী অতএব তাহা বাঞ্ছনীয় বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

যেহেতু এই ভ্রমণ বিবরণ লিখিবার মূলে ছিল ভারতীয় কাঁচা বা কারখানা-জাত মাল, সেহেতু এই পুস্তকে সেসব বিষয়ে কিছু না থাকিলেই অদ্ভুত মনে হইত। তিনি ওইসব

বিষয়ে বিশদরূপেই জানাইয়াছেন—কোনও পাঠকই এই ব্যাপারে হতাশ হইবেন না। তিনি যেখানে প্রদর্শনী এবং দর্শকবৃন্দ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ভ্রমণকাহিনী বলিতে বলিতে যতখানি বলা সম্ভব ততখানিই বলা হইয়াছে—কাহিনী তথ্যভারে শ্লথ হইয়া পড়ে নাই। ভারতীয় পাঠকদের নিকট শেষ অংশটি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইবে—কেননা, তিনি ইংরাজ এবং ইংরাজ জীবন সম্পর্কে তাঁহার স্বদেশবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা শুনাইয়াছেন—সম্ভবত ইউরোপীয় মহাদেশ সম্পর্কে ভারতীয়ের অভিজ্ঞতার প্রকাশ এই প্রথম।

সমগ্র রচনাটি সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়, ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে নীতিগত তাৎপর্য বিদ্যমান। এই পুস্তক একজন ভারতীয় ব্যক্তির রচনা, যিনি কেবল যে নিজের দেশ সম্পর্কে সম্যক অবহিত তাহা নহে, তিনি ইউরোপ এবং ইউরোপীয়দের জীবনযাপনও বেশ ভালভাবেই দেখিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে বেশ ব্যাপকভাবে ঘুরিয়াছেন, ভারতের জীবনযাত্রার কঠোর বাস্তব দিকটা তিনি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার অসাধারণ সুযোগও পাইয়াছেন। ইউরোপেও তাঁহার সরকারি পদাধিকার বলে তিনি যাহা নয় মাসে দেখিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন তাহাতে অন্যদের পক্ষে অনেক অধিক সময় লাগিবার কথা। তিনি ইউরোপের সর্বোচ্চ মহলের সহিত অতি সহজেই পরিচিত হইয়াছিলেন। কেবল সর্বোচ্চ মহল নহে, তিনি সাধারণ মানুষদের সঙ্গেও যথেষ্ট মিশিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে নবীন ছাত্র হিসাবে যান নাই—তিনি গিয়াছিলেন একজন বয়স্ক দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে। তিনি নিজে ছিলেন পরিপূর্ণ হিন্দু সমাজের মানুষ, হিন্দু ঐতিহ্যে ও সংস্কৃতিতে তিনি পুষ্ট হইয়াছিলেন। এইরূপ এক ভ্রমণকারীর মন্তব্য এবং মতামত হিন্দু ও ইউরোপীয় উভয়ের পক্ষেই আকর্ষণীয় বলিয়া মনে হইবে। হিন্দুরা তাঁহার মতামতে বহু বিষয় অবহিত হইবেন—কোনও কোনও বিষয় তাঁহাদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, আবার ইউরোপীয়রাও তাঁহার মন্তব্যের মধ্য দিয়া অন্যেরা তাঁহাদের সম্পর্কে কী মনে করেন তাহা জানিতে পারিবেন।

সর্বোপরি, সকলেই তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণ কাহিনী হইতে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের সুদূরপ্রসারী নীতিশিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ত্রৈলোক্যবাবু এখনও হিন্দুসমাজের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি হিন্দুদের যে সব সামাজিক শাস্তি বিধানের কথা লিখিয়াছেন তাহা তাঁহাকে পাইতে হয় নাই। ইহাতে প্রমাণ হয় হিন্দু সমাজ কিংবা ধর্ম যাহাই বলুন না কেন, তাহার কঠিন আবরণে আর আবদ্ধ থাকিতেছে না। আর এই আবরণ ভেদ করিয়া ধর্ম কাঠামো নমনীয় হইলেই মঙ্গল—তাহাতে জীবনযাপন প্রণালীতে পরিবর্তন আসিবে, কেননা পরিবর্তন যেখানে সম্ভব হয় না সেখানে মৃত্যুই একমাত্র পরিণতি। ত্রৈলোক্যবাবুর দুঃখ যে, হিন্দু সমাজ অপরিবর্তনীয় বন্ধনে আবদ্ধ, তিনি তাঁহার পুস্তকে প্রগতির পরিবর্তন নীতির আবশ্যকতা বুঝাইয়াছেন—তাঁহার মত, তিনি এবং তাঁহার মতের সমর্থক আরও কয়েকজন সমাজের কঠিন নিয়মকানুনকে ক্রমশ নরম করিয়া আনিতেছেন। কোনও জাতিই

নিজস্ব চেষ্টায় বিরাট উন্নতি করিতে পারে নাই—তাই যে ভাবেই হউক না কেন ভারতীয় জীবনের সহিত ইংলণ্ডীয় জীবনধারার সংযোগ কাম্য—তাহাতে ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতেরই লাভ বেশি। যদি সফরকারী হিন্দু—তিনি যদি শান্ত প্রকৃতির হন, নিজেকে ক্ষুদ্র মনে না করেন, সামাজিক হন তাহা হইলে তিনি তাঁহার দেশবাসীর পক্ষে একজন শিক্ষক স্বরূপ হইতে পারিবেন, তাঁহার প্রভাবও দেশের উপকারই করিবে। তাঁহার পশ্চিমী জীবনযাপন প্রণালীর জ্ঞান, যাহা কেবল পুস্তক বা সংবাদপত্র পাঠ দ্বারা অর্জিত হয় নাই, তাহা উচ্চতর জাতির প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় সবকারী বক্তব্যকে জনসাধারণের কাছে বলিবার গুণ অর্জন করিয়াছে। *

কলিকাতা এন. এন. ঘোষ
মার্চ ২২, ১৮৮৯

---

* বর্তমান রচনায় ব্যবহৃত পৃষ্ঠাঙ্কগুলি পূর্ববর্তী মূল সংস্করণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। 'চর্চাপদ' সংস্করণের সঙ্গে উপরিউক্ত পৃষ্ঠাঙ্কের কোনো সম্পর্ক নেই।—প্রকাশক।

অনুবাদকের ভূমিকা

ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের বাল্যকাল কেটেছে দারিদ্র্যের চরম দুর্দশায়। তিনি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পেরেছিলেন (বর্তমানে অষ্টম শ্রেণী)। বিনা সম্বলে তিন দিনের পথ হেঁটে আত্মীয় বাড়ি যাবার পথে চা বাগানের দালালের হাতে পড়ে কুলিরূপে চালান হবার মুখে দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে সাজাদপুরের কাছারিতে ২৫ টাকা বেতনে চাকরি দিয়েছিলেন। সেখানে বর্ষায় ভোবা অঞ্চলে এক নির্জন টিলায় নির্বাসিত অসহায় তিনটি বন্ধুকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন এজন্য নায়েব মহাশয়ের বিরক্তিভাজন হন। দ্বিতীয়বার সাজাদপুর যাবার পথে পাবনার নিকট পদ্মা নদীতে প্রবল ঝড় আরম্ভ হয়। তিনি কোনো রকমে পাড়ে নেমে কিছু দূর গিয়ে অচেতন হয়ে পড়েন, এই অবস্থায় ডোমেরা তাঁকে তাদের ঘরে নিয়ে বাঁচিয়ে তোলে।

পরে তিনি ১৮ টাকা বেতনে স্কুলের শিক্ষক হয়েছিলেন। এই সময় ঘোর দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। সে দৃশ্য দেখে ত্রৈলোক্যনাথ বিচলিত হয়ে ওঠেন। তখন থেকেই দেশের দুর্দশা মোচনের জন্য তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তিনি পুলিসের দারোগাও হয়েছিলেন।

এই ত্রৈলোক্যনাথের যাবতীয় শিক্ষা, অভিজ্ঞতার শিক্ষা। ১৯১৯-এ তাঁর মৃত্যু ঘটে। তার আগে তিনি কলকাতা যাদুঘরের অ্যাসিস্ট্যান্ট কিউরেটর ছিলেন। তাঁর বাংলা গল্প-উপন্যাস সবারই পরিচিত। কিন্তু তিনি 'এ ভিজিট টু ইউরোপ' নামক যে ইংরেজি বই লিখেছিলেন তার সঙ্গে অনেকের পরিচয় নেই। প্রথম যাত্রায় তিনি বিদেশে মাত্র ৮ মাস ২৭ দিন ছিলেন। বিলেতের ঔপনিবেশিক শিল্প প্রদর্শনীতে তিনি ছিলেন ভারতীয় প্রতিনিধিদের অন্যতম। এই উপলক্ষে তিনি যে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন বাঙালীদের মধ্যে তার তুলনা মেলা ভার। আপন স্বাধীন চিন্তা ও মেধার গুণে তিনি তাঁর যুগের এক অসাধারণ ব্যক্তি রূপে খ্যাত হয়েছিলেন। বিলেত গিয়েছিলেন তিনি ১৮৮৬ সনে, আজ থেকে ৯০ বছর আগে। তাঁর এই ইংরেজি বইতেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে।

এর পাতায় পাতায় তাঁর দেশপ্রেম এমন আশ্চর্য রূপ গ্রহণ করেছে, যা সে যুগের অন্য কোনো বাঙালীর মধ্যে আমি খুঁজে পাই না। আবেগ নয়, উচ্ছ্বাস নয়—সদা জাগ্রত দৃষ্টিতে বিদেশের যা কিছু দেখেছেন তারই পাশাপাশি স্বদেশের কথা মনে পড়া—তুলনামূলকভাবে তার বিশ্লেষণ করা, অনেক স্থলেই স্বদেশের দুর্দশা ও অশিক্ষার কথা মনে পড়া, এবং তার প্রতিকারের ইঙ্গিত। অনেক সময় যেন তাঁর হৃদয় থেকে রক্ত ঝরেছে। ইউরোপ ভ্রমণ অনেক বাঙালী করেছেন কিন্তু এমন বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও বিশ্লেষণ এবং সমাজের প্রতিটি দিক, শিক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কৃষি, সমাজ, ধর্ম, প্রাকৃতিক প্রভাব, গোপালন, থিয়েটার, ইংরেজ

চরিত্র, দরিদ্র, ইংরেজের কথা, ধনীর কথা, কোথায় সে বড় কোথায় সে ছোট সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ ও সে বিষয়ে প্রবীণ প্রাজ্ঞজনোচিত মত-প্রকাশ পড়তে পড়তে বিস্ময়ে মন অভিভূত হয়। পৃথিবীর অগ্রগতির সূত্র কি, কোন্ পথে গেলে ভারতের দুর্দশা ঘুচবে, এ সব বিষয়ে অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ মত প্রকাশ—তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ভূত-প্রেতের কথাও বাদ নেই। পুরুষের পৌরুষ, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্যও দৃষ্টি এড়ায়নি।

তাছাড়া ইংরেজদের প্রাত্যহিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন এবং নানা মন্তব্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও বিশুদ্ধ কৌতুক প্রকাশও ত্রৈলোক্যনাথের স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর ভারত চিন্তা।

মৌমাছির পাঁচটি চোখের মধ্যে দুটি চোখে হাজার হাজার লেন্স। কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। ত্রৈলোক্যনাথের দুটি চোখেও তাই। তিনি ১৮৮৬ সনের ১৬ই মার্চ তারিখে বিলাত যাত্রা করেন। এডেনে পৌঁছেই নানা তথ্যের মধ্যে তিনি সেখানকার রামায়ণ বিষয়ে এক চমৎকার কাহিনী সংগ্রহ করেন। গোড়াতেই স্বদেশ বিষয়ে কৌতূহল আরম্ভ হল।

"প্রাচীন হিন্দুদের বিস্ময়কর সব ক্রিয়াকলাপ বা কীর্তি আবিষ্কারের জন্য আমার দেশের যাঁহারা কল্পনার বিস্তারে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুনিয়া খুশি হইবেন, ইবন এল মোজাহির নামক জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন, এডেন, দশশির নামক দানবরাজ কর্তৃক "আন্দামান" রূপে ব্যবহৃত হইত। দশশির অর্থাৎ দশমাথাওয়ালা রাবণ। যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের এডেনে নির্বাসনে পাঠাইত। কথিত আছে, এডেনের পাহাড়গুলির মধ্যে কোথাও একটি কূপ আছে, তাহার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের উপযুক্ত একটি সুরঙ্গ-পথ আছে। এই সুরঙ্গ-পথ সম্পর্কে উক্ত ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "মহম্মদ বিন মাসুদের পিতা মুরারক ইল শারোনি মৌলা আমাকে বলিয়াছেন, উক্ত দশশির দানব অযোধ্যা প্রদেশ হইতে রাম হায়দারের স্ত্রীকে খাট সমেত চুরি করিয়া আকাশ পথে চলিবার সময় জেবেলসিরা পাহাড়ের মাথায় বিশ্রাম করিবার সময় রাম হায়দারের স্ত্রীকে বলিয়াছিল, আমি তোমার মানুষের দেহটিকে একটি জিনে বদল করিব এমন ইচ্ছা। তাহাতে দুইজনের মধ্যে বচসা বাধিয়া উঠিল, তখন বানর-বেশী হন্‌বীত নামক এক এফরীত তাহা শুনিতে পাইয়া একরাত্রির পরিশ্রমে উজ্জইন বিক্রম নামক নগর হইতে সমুদ্রের নিচে দিয়া সুরঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিয়া জেবেলসিরার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইল, পাহাড়ের মাথায় একটি কাঁটাগাছের নিচে রাম হায়দারের স্ত্রী ঘুমাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঠে তুলিয়া সেই সুরঙ্গ-পথে ভোরবেলা উজ্জইন বিক্রমেতে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহাকে তাহার স্বামী রাম হায়দারের হাতে সমর্পণ করিল। রাম হায়দারের দুইটি সন্তান হইল লথ (Luth) ও কুশ।"

এমন একটি রামায়ণ কাহিনী পাওয়ামাত্র সংগ্রহ করা অথবা নোট করে নেওয়ার মধ্যেও ত্রৈলোক্যনাথের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাজ আর কোনো বাঙালী যাত্রী করেননি। এবং শুধু একটি তথ্য তো নয়।

ইংল্যাণ্ডে একটি ঐতিহাসিক রক্তপাতের কাহিনী শুনে ত্রৈলোক্যনাথ চিন্তা করছেন— এবং এ চিন্তায় এক ঘরে হওয়ার কথা।

“পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহ ও মন একই সঙ্গে পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। ...একজন বড় মানবতার শিক্ষক পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ গণ্ডদেশে কেহ আঘাত করিলে তাহার দিকে বাম গণ্ডদেশটি ফিরাইবে। আমাদের শাস্ত্রও ক্ষমা সকল ধর্মের সার বলিয়াছেন। এসব উক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তবু সবিনয়ে আমার স্বদেশবাসীকে, বিশেষ করিয়া নিম্ন বর্ণের হিন্দুদিগকে বলি, যে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা তাহাদের মনের সকল স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ চূর্ণ করিয়াছে, সমস্ত আত্মসম্মান বোধ চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রত্যেকটি আঘাত প্রত্যাঘাতের সাহায্যে তাহাদিগকে দেয়, উচ্চ বর্ণের কোনও আঘাত যেন তাহারা নীরবে সহ্য না করে। এবং সে প্রত্যাঘাত দুর্বল হইলেও যেন দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম গুরুতর হইলেও যেন দেওয়া হয়। বর্তমান পৃথিবীর যে অবস্থা তাহাতে পূর্ণ ক্ষমার নীতি অচল। ইহা পাপ, বিশেষ করিয়া ইহা যখন অন্যায়কারীর লোভ বাড়াইয়া দেয়, এবং তাহাতে সমস্ত মানবতার ক্ষতি হয়।”

একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণের পক্ষে এ চিন্তা বৈপ্লবিক। সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তা। আশ্চর্য মনে হয়। স্ত্রী শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়েও তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট।— আমাদের যৌথ পরিবারের নিজস্ব শান্তির কথা স্বীকার করেও ত্রৈলোক্যনাথ বলেছেন—

“ভারত যদি পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে বর্তমানের এ অবস্থা চলিতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে মেয়েদের নূতন কল্পনা, নূতন আশা আকাঙ্খা জাগিলে তাহা তাহারা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটুখানি ধৈর্যহীন হইতে পারে, এবং সেজন্য পরিবারিক শান্তিও কিছু বিঘ্নিত হইতে পারে, কিন্তু এসব সামান্য ত্রুটিকে বেশী রকম বাড়াইয়া দেখিয়া ইহার অপরিমিত সুফলকে অগ্রাহ্য করা প্রভুত্ববিলাসী পুরুষের দ্বারা চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। শিশু বিবাহ অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে, এবং স্ত্রীলোককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে... ভারতীয় পিতামাতাদিগকে একথা মানাইয়া লইতে হইবে যে তাহাদের একজন অসহায় জীবকে বিক্রয় অথবা সম্প্রদান করার কোনও অধিকারই নাই—দানের পাত্র যত উপযুক্তই হউক না কেন। ...স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি এই যে, তাহারা শিক্ষা পাইলেই ভ্রষ্টা হইবে। আমি বলি এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।...”

সম্প্রদান করার অধিকারও থাকা উচিত নয়, এ চিন্তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, লজিক্যাল। পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে দানের প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে। কিন্তু এই যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারা অবশ্যই ত্রৈলোক্যনাথের মনে বীজপত্রে অঙ্কুর যেমন প্রচ্ছন্ন থেকে হঠাৎ বাইরে এসে পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হয়, তেমনি অঙ্কুর তাঁর মনে ছিল, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টি এবারে সমাজের অন্য একটি বিষয়ে আকৃষ্ট। তিনি ইংল্যাণ্ডের ও ইউরোপীয় নানা গোশালা পরিদর্শন করে বেদনার সঙ্গে বলছেন—

"গোরুর প্রতি হিন্দুরা যে ব্যবহার করে, তাহার মত এতখানি লজ্জাজনক অধঃপতন সম্ভবত তাহার অন্য কোনও বিষয়ে হয় নাই। অনাহারক্লিষ্ট, কঙ্কালসার পশুগুলি এমনই দুর্বল যে ল্যাজ দিয়া মাছি তাড়াইবার ক্ষমতাও কমই অবশিষ্ট আছে, এ দৃশ্য নবাগত ইউরোপীয়ের চোখে সুখের নহে, এবং গোজাতি যে হিন্দুর বিশ্বাসমতে অতি পবিত্র এ-কথাও তাহারা বুঝিবে না। তাহার কাছে এটি বড়ই লজ্জাকর বোধ হইবে যে, যে মানুষেরা বিসমার্কের রাজনীতির ত্রুটি বাহির করে, হারবার্ট স্পেনসারের সমালোচনা করে, জন স্টুয়ার্ট মিলের ভ্রম সংশোধন করে, এবং হাক্সলি, টিনডাল এবং ফ্যারাডের গবেষণা বিষয়ে বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে, তাহারা স্থির মস্তিষ্কে এবং অতি উৎসাহের সঙ্গে এই সব দুর্দশাগ্রস্ত পশুদের যন্ত্রণা যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহার জন্য আন্দোলন করিতে পারে।"

অন্যত্র আরও মূল্যবান একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী— "আজ যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা চালিত সরকার গঠিত হয়, তাহা ব্রিটিশ জাতির সরকারের ন্যায় সফল হইবে ইহাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে কি ধরনের লোককে তাহারা নির্বাচিত করিবে তাহাই ভাবি...আমি অনুমান করি, বর্তমানে দেশের লোকের যে চরিত্র...তাহাতে এই লোকদের ভিতর হইতে যাহাদিগকে ছাঁকিয়া আনিয়া নির্বাচিত করা হইবে, তাহারা ক্ষমতা হাতে পাইবামাত্র প্রথমেই গোহত্যা সমস্যা বিষয়ে প্রশ্ন তুলিবে।"

আমি শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীকে এই কথাগুলির মূল ইংরেজি অংশ পাঠিয়েছিলাম। তিনি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে তখন লিখতেন। আমার প্রেরিত অংশটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছিলেন—

If this is not prophetic, I don't know what is.

ত্রৈলোক্যনাথের গো-চিন্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কি চমৎকার তাঁর উক্তি। তিনি বলছেন—

"গোহত্যা-নিবারণ খুবই উত্তম কাজ সন্দেহ নাই। এবং ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবারও নাই। পক্ষান্তরে একজন হিন্দুরূপে এবং ব্রাহ্মণরূপে, এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষের মনোভাবের প্রতি সম্মানবশতঃ, গোহত্যা নিবারিত হইলে আমি আনন্দিতই হইব, আরও আনন্দিত হইব, যদি মানুষের দ্বারা বা অন্য প্রাণী দ্বারা সকল প্রাণীহত্যা নিবারিত হয়, এবং সমস্ত বিশ্ব শান্তি, প্রীতি ও শুভ ইচ্ছায় পূর্ণ হইয়া উঠে—কোথাও ঈর্ষা, যুদ্ধ, বেদনা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকে। কিন্তু ইহা ত জগৎকে আমার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইবার ইচ্ছা। ...যে জাতির মধ্যে এত চারণভূমি আছে যে গোরুর সংখ্যা সীমাহীন বৃদ্ধি পাইলেও কোনও অসুবিধা হইবে না, তাহাদের মধ্যে গোরক্ষা আন্দোলন সফল হইতে পারে। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হিন্দুজাতি চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে। এই হিন্দুজাতি তিন সহস্র বৎসর পূর্বের শৈশবে যাহা পাইবার জন্য কাঁদিত, সেই জাতি বৃদ্ধ হইয়াও সেই সব তুচ্ছ খেলনার জন্য কাঁদিতেছে—এ দৃশ্য কৌতুককর।...ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত মানুষকে বিদায় করিয়া সমস্ত মহাদেশটিকে শুধু গোরুতে পূর্ণ করিয়া তুলিলেও যত গোরু, তত খাদ্য মিলিবে কল্পনা করা অসম্ভব।"

আরও একটি ভবিষ্যদ্‌বাণী : “সময় যখন আসিয়াছে, তখন ইহা (কংগ্রেস), “ন্যাশন্যাল কংগ্রেস” বা অন্য নামে টিকিয়া থাকিবে। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে অবশ্য একটি সম্প্রদায় আছে, সে সম্প্রদায়ের লোকেরা... ভারতকে ব্রিটিশ পদানত দেখিতে চাহেন। ইহার ক্ষতির দিকটি সম্পর্কে তাঁহারা অন্ধ। তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ হইবে না।”

ইউরোপ দর্শন, কিন্তু সর্বদা ভারত চিন্তা। এবং সে চিন্তা যুক্তিসঙ্গত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের। সমাজের সকল বিভাগে, শিক্ষার সকল বিভাগে, সন্ধানী দৃষ্টি। কত মজার গল্প, কত গভীর কথা। বিলেতের ছেলেদের মনে ভূতের ভয় নেই—তা থেকে আমাদের দেশের ছেলেদের ভূতভয় জর্জরিত মনেব দুর্দশার কথা বর্ণনা অতি চমৎকার। তিনি বলেছেন, আমি জীবিত বা মৃত কোনো ভূতেই বিশ্বাস করি না। এইভাবে বলতে বলতে সুর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

“নিতান্ত শিশুকাল হইতেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মনে ভূতপ্রেত এবং ঐ জাতীয় যাবতীয় জীবের ভয় ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলে চীনা মেয়েদের পায়ে যেমন লোহার জুতা পরাইয়া তাহার বৃদ্ধি রোধ করা হয়, তেমনি ভূতের ভয়ের দ্বারা তাহাদের মনেরও স্বাভাবিক সাহসকে খর্ব করিয়া দেওয়া হয়।”..

এর পরের উদ্ধৃতিতে যে কথাগুলি আছে সে কথা নব্বুই বছর আগে কজন বাঙালী ভেবেছিলেন আমার জানা নেই। আমাদের ইতিহাসে ঐশ্বর্যশালী রাজাদের কথা আছে, কিন্তু—

‘ইতিহাসে তাহাদেব কথা নেই কেন, যে-সব কোটি কোটি লোক জমি চাষ করিয়াছে, ফসলের বীজ বুনিয়াছে. শস্য ঘরে তুলিয়াছে, কিন্তু চিরকাল অনাহারে শীর্ণ হইয়াছে? ...ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাকে ঘৃণা করার শিক্ষা দেওয়া ধর্ম, পৃথিবীকে যেভাবে ভণ্ড বানাইয়াছে এমন আর কিছুতে নহে। উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত মন আমার এই মন্তব্যে হাস্য করিবেন, কিন্তু আমি বাস্তব জগতের কথা বলিতেছি, ...ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে শাস্ত্রের আইন কঠোর, অথচ পরশুরাম তাঁহার কুঠারের সাহায্যে একুশবার উদ্ধত যোদ্ধাজাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন—প্রতিবাদকারী স্ত্রীলোক বা শিশু কাহাকেও বাদ রাখেন নাই। অতঃপর দ্রোণের ন্যায় এক শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ উত্তম অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে অন্যায়ের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম উল্লেখিত ব্যক্তিকে দেবতা পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে হিন্দুজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান দেওয়া হইয়াছে।”

সেকেলে ব্রাহ্মণের আধুনিক মতবাদ পদে পদে বিস্মিত করে। ত্রৈলোক্যনাথ ইংল্যাণ্ডে যেখানেই ভারত দরদীর সন্ধান পেয়েছেন সেখানেই গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রেভরেণ্ড লং, ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, ম্যাক্সমুয়েলার এবং আরও অনেকের নাম করা যেতে পারে।

ম্যাক্সমুয়েলারের সঙ্গে সাক্ষাৎটি বড়ই মর্মস্পর্শী। আমি মূল ইংরেজি অংশটি শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীকে পাঠিয়েছিলাম। তিনি তাঁর Scholar Extraordinary বইতে (যার জন্য তিনি এফ-আর-এস লিট হয়েছেন) তার অংশ উদ্ধৃত করেছেন।

ত্রৈলোক্যনাথের বইয়ের নাম "ইউরোপ পরিদর্শন" (A visit to Eupore) কিন্তু আসলে একটি আত্মদর্শন। বাইরের থেকে দেখা সামান্য, কিন্তু তা শুধু আত্মদর্শনেই প্রেরণা দিয়েছে। আমি এই অসাধারণ বইখানি থেকে আর মাত্র তিন-চারটি উদ্ধৃতি দেব। বেশি দেবার স্থানাভাব। (অনুবাদ সবই এই লেখকের নিজস্ব)।

১। বহু বিজ্ঞান-সেবীর নিকট কৃষির উন্নতি একটি "হবি" বা শৌখিন পেশা। সাধারণ মানুষ ইহা হাস্যকর মনে করিতে পারে, কিন্তু "হবি" সাধারণ মানুষের জন্য নহে। ...ইউরোপ ও অ্যামেরিকা "হবি" হইতে মহামূল্য সব আবিষ্কার করিয়াছে। ...ইহা এমন একটি অনুভূতি যাহা মস্তিষ্ক-বিকারের সীমা স্পর্শ করিয়া চলে, এবং ইহা হইতেই এমন সব আশ্চর্য আবিষ্কার হইয়াছে, আধুনিক অগ্রগতি যাহার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আমাদের দেশে এমন "হবি" কোথাও দেখা যায় না। এবং তাহার প্রধান কারণ আমরা আপাততঃ মাঝারি শ্রেণীর মানুষ। আমাদের কোনও আবিষ্কার নাই, কোনও উদ্ভাবন নাই, পৃথিবী জোড়া কোনও খ্যাতি নাই। আমাদের "হবি"—ধর্ম। কখনও বা ইহা হবির চেয়েও অধিক, ইহা মস্তিষ্ক-বিকার। ...আমরা দুর্বল জাতি বলিয়াই কি ধর্ম আমাদের "হবি"? কারণ, দেখা যায় প্রত্যেকটি দেশেই স্ত্রীজাতি, রুগ্ন, এবং পঙ্গু, ইহারা সর্বদাই খুব ধর্মীয় ভাবাপন্ন। প্রকৃতির এই ধারা অনুসরণ করিয়া, প্রত্যেক দেশের এবং কালের শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ধর্মীয় ভাবাপন্ন হইবার জন্য নিজদিগকে কৃত্রিম উপায়ে—অনশনে, অনুশোচনায়, দুর্বল করিয়া লইয়াছে।

২। বহু লোক এই (ব্রিটিশ) মিউজীয়াম বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করিতেছে, ইহা আমার খুব ভাল লাগিল।...এখানকার অনেক সম্পদই ব্যক্তিগত দান। আমাদের সদ্গুণের ঝোঁক অন্য। মানুষ ও দেবতা পরস্পরের সম্পর্কে এমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক যাহাতে মনে হয় এইবার দেবতাদের উচিত তাঁহাদের রুচির পরিবর্তন সাধন করা। এই আত্মনির্ভরতার যুগে তাঁহাদের কৃপণতা এবং মানুষের উপর চাপ দিয়া কিছু আদায়ের অভ্যাস ছাড়া উচিত। তাঁহাদের দেহ বায়বীয়, সেজন্য তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের দেহ নির্মাণের জন্য আমরা সোনা, রূপা, এমন কি মাটিও ব্যয় করিতে সত্যই পারি না। তাঁহাদেরও উচিত আহার, বাসস্থান, সাজপোশাক এবং অলঙ্কারের জন্য আমাদের উপর নির্ভর না করা। ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করেন, তাহা আমাদের দেশে স্কুল, মিউজীয়াম, বিজ্ঞান শিক্ষালয় এবং অন্ধকারে দিশাহারা মানুষদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাইবার অন্যান্য উপকরণের জন্য প্রয়োজন। ...(এই কথাই রবীন্দ্রনাথ, হেমন্তবালা দেবীর কাছে একখানা চিঠিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে জ্বালাময়ী ভাষায় লিখেছেন —দ্র. চিঠিপত্র ৯)।

৩। আমরা সভা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি সতীদাহ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি। জলকল স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি। রামমোহন রায়, মহেন্দ্রলাল সরকার...এই রকম কয়েকজন দলত্যাগী না থাকিলে, আমাদের

নাম চির পবিত্র থাকিতে পারিত, কারণ সতীদাহ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইলে আমাদের কেহ দোষ দিতে পারিত না, দোষ সম্পূর্ণ ইংরেজের হইত।

কিন্তু বিদ্রুপ থাক। এখন গুরুতর চিন্তার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের বিশ্বের জাতিসমূহে সত্য স্থান কোথায়? কল্পনা অথবা অলীক স্বপ্ন দেখার দিন আর নাই। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে আমরা কি ছিলাম, তাহার কোনও মূল্য এখন নাই। এমন কি যদি আমরা ধরিয়াও লই তখন মহৎ এবং সৎ ছিলাম...

It matters little now whether the Mahanimba of our books were the same as the Cinchona officinalis of today. Whether Kurubarsha was the present Russia and whether Egypt and Mexico were colonised from India. It matters much to be able to see what we are today, for by that the world will judge us, not by that which we were. An antiquarian or a scholar may take a respectful interest in us, but every man and woman in Eupore are not antiquarians or Sanskrit scholars.

কিছু পরিমাণ মূলের পরিচয় দিলাম। এর পর তিনি বলছেন—"সত্য কথা বলিতে কি, কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে যাযাবর জাতি পঞ্জাবের সমতল ভূমিতে যে গান গাহিত তাহা জানিয়া পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া যায় নাই। দূরের পৃথিবী আমাদের দেশে কন্ধ এবং ব্রাহ্মণে কি তফাৎ তাহা জানে না, একজন জৈনে ও একজন মুসলমানে কি তফাৎ তাহা জানে না, অতএব জৈন জীববলির নিন্দা অথবা মুসলমান সতীদাহ প্রথার নিন্দা করিলে তাহাদের কানে তাহা পৌঁছায় না। সবাই মিলিতভাবে কিছু করিলে তাহা দ্বারা আমাদের বিচার হইবে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে..."

প্রায় ন মাস ইউরোপ পরিদর্শনে ত্রৈলোক্যনাথ যে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তা যেমন উদার তেমনি মহৎ। সে শিক্ষার প্রকাশ শুধু তাঁর স্বদেশ চিন্তার মধ্যেই প্রকাশিত নয়, মানুষকে যাঁরা উঁচুতে তোলার সাধনায় মেতেছে, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর শির নত হয়েছে। দেশের সমস্ত দুর্দশা ইউরোপের বাস্তবনিষ্ঠ মনোভাবের পটে যেন আরও বেশি করে ফুটে উঠেছে। মানুষকে গড়ে তুলতে হলে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ চাই একথা তিনি বার বার স্বীকার করেছেন। উচ্চ চিন্তার আকাশপথে চলা থামিয়ে কর্মক্ষেত্রে নামতে হবে এ শিক্ষা তাঁর মজ্জায় প্রবেশ করেছে। আর একটি মাত্র উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তাঁর নির্জন চিন্তার একটি মহামূল্য অনুচ্ছেদ। জার্মানি থেকে অস্ট্রিয়ার পথে ট্রেনের কামরায় অন্য যাত্রী নেমে যাওয়ায় তিনি একা বসে বসে বাইরের দিকে চেয়ে দেখছেন আর ভাবছেন—

"অবশেষে নিজের মনে তত্ত্বচিন্তায় নিযুক্ত হইলাম। আমি নিচের পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখি, সব যেন ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা। চলমান বামনের দল উন্মাদের মত পরস্পরকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহারই সুবিস্তীর্ণ চিত্র মনের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমাদের গুরুগণ আমাদিগকে এই সব তুচ্ছতার উর্দ্ধে থাকিতে বলিয়াছেন, শান্ত সমাহিত থাকিতে বলিয়াছেন, যেখানে কোনও মেঘ ছায়াপাত করে না, যেখানে ঝড়ের

গর্জন কানে আসে না, নিস্পৃহ মনে নিচের এই উন্মাদের লড়াই অবলোকন করিতে বলিয়াছেন।

"কিন্তু মহাশয়, পৃথিবীতে যে ক্ষুধা আছে, বেদনাবোধ আছে, তাহা ব্যক্তিগতভাবে আমি দমন করিতে পারি, কিন্তু উহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্যথাবেদনা আমি কেমন করিয়া দমন করিব? অন্যের প্রতি এই দুঃখময় সমবেদনা এবং আমার নিজের মধ্যে যে আত্মাভিমান আছে, তাহা আমাকে আমার এই কল্পলোকের উচ্চতা হইতে নিচে নিক্ষেপ করিল, এবং স্মরণ করাইয়া দিল আমিও ত উহাদেরই মত বামন, আমিও ত উহাদেরই একজন। হায়, যাহারা এই হতভাগ্য বামনদিগকে তাহাদের মত বিরাট বানাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, যদি তাহাদের জুতার ফিতা খুলিবার উপযুক্ত হইতাম!"

নব্বুই বছর আগে এমন উক্তি কোনো ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে সম্পূর্ণ নতুন তো বটেই, উপরন্তু এমন বৈপ্লবিক যে, তখনকার পাঠকমনে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল জানতে ইচ্ছা হয়। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই ত্রৈলোক্যনাথ সবচেয়ে রক্ষণশীল কাগজ সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী ও মাসিক জন্মভূমির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন কি করে। আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে ত্রৈলোক্যনাথ হিন্দু মুসলমানকে তাঁর আদর্শ ভারতে সমমর্যাদা দিয়েছেন, পৃথক করে দেখেননি। *

---

* আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যা ১৩৮৩-তে প্রকাশিত। এই লেখাটি 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' বই-এর ভূমিকা হিসেবেইপরিকল্পিত হয়েছিল। আনন্দবাজারে প্রকাশের সময় এর নাম দেওয়া হয়েছিল "ত্রৈলোক্যনাথ"। —প্রথম সংস্করণে (১৯৮২) প্রকাশক জানিয়েছেন।

** ১৩৮৩ বঙ্গাব্দে আনন্দবাজার পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় প্রকাশিত এই নিবন্ধে ব্যবহৃত মূল অনুবাদের উদ্ধৃতিগুলি নানাভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। ১৯৮২ সালে 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' প্রকাশকালে নিবন্ধটি 'অনুবাদকের ভূমিকা' হিসাবে যখন গৃহীত হয়, তখনো উদ্ধৃতিগুলি সম্পাদিত অবস্থাতেই ব্যবহার করা হয়েছিল। চর্চাপদ সংস্করণে উদ্ধৃত অংশগুলি মূল অনুবাদে যেমন ছাপা আছে তেমনভাবেই মুদ্রিত হল।

‘নব গ্রন্থনা’ সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

আমার পিতা স্বর্গত পরিমল গোস্বামী উনবিংশ শতাব্দীর অসাধাবণ প্রতিভা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘এ ভিজিট টু ইউরোপ’ গ্রন্থখানি অনুবাদ কবেছিলেন প্রায় পনের বছর আগে। এটি প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তার আগে এটি সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে হতে বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় (ইংরেজি ২০ মার্চ, ১৯৬৯) ঐ পত্রিকায় এক পণ্ডিত ব্যক্তি কলকাতা-৫০ থেকে চিঠি লেখেন, সেই চিঠিটির কিছু অংশ এখানে দেওয়া হল :

“কঙ্কাবতী”র লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক। কিন্তু সকলেই জানি আমরা, সর্বজনশ্রদ্ধেয়রাও সময় সময় এমন কিছু লিখে থাকেন, যা শাশ্বত বা কালজয়ী হয় না। ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথ-এব ‘My Visit to Europe’ ঠিক এই ধরনের একটি রচনা। দীর্ঘদিন আগে এ-বচনাব গুরুত্ব নিশ্চয়ই ছিল, কেননা উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র স্থান পেয়েছিল এতে। কিন্তু আজকের দিনে এর গুরুত্ব কতটুকু?... বাংলাদেশেব ক’জন পাঠক আজ থেকে প্রায ৭৫ বছর আগেকার লণ্ডনের সমাজজীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী?”

উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি সম্ভবত ঠিকই লিখেছিলেন। বাংলাদেশের কোনো প্রকাশকই এই বইটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে আগ্রহী হননি। পিতা নিজেই এই পুস্তকখানি তাঁর অন্যান্য অনেক বই-এর মতই নিজ ব্যয়ে ছেপে প্রকাশ কববেন স্থিব করেছিলেন, কিন্তু ১৯৭৬ সালের জুন মাসে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাও সম্ভব হয়নি। তবে প্রকাশক আগ্রহী না হলেও পাঠকেরা আগ্রহী হবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

পণ্ডিত ব্যক্তিটি অবশ্যই দারুণ কথা বলেছিলেন—সর্বজনশ্রদ্ধেযরাও সময় সময় এমন কিছু লিখে থাকেন, যা শাশ্বত বা কালজয়ী হয় না। এবং ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত বইটি (পণ্ডিত ব্যক্তির সামান্য ভুল সংশোধন করা প্রয়োজন—বইটি ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত, ১৮৯৬তে নয়) সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন, আজ থেকে প্রায় ৭৫ বছর আগেকার লণ্ডনের সমাজ জীবন সম্বন্ধে বাংলাদেশের ক’জন পাঠক কৌতূহলী হবেন?

অর্থাৎ পণ্ডিত ব্যক্তিটি মনে করেন ত্রৈলোক্যবাবুর এই বইটি মোটেই বাজারে কাটবার মত ‘মাল’ নয়। তিনি নিজে এই বই থেকে কিছুই পাননি—পেলেও তা উল্লেখযোগ্য মনে করেননি। সত্যি, ৭৫ বছর আগেকার বিদেশী সমাজ সম্পর্কে একজন চিন্তাশীল বাঙালীর

---

* প্রথম সংস্করণের (১৯৮২) সময় প্রকাশকের কথা।

বক্তব্য উক্ত পণ্ডিতের পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীয় মনে হয়নি। কিন্তু তবু আমার পিতা এই দুঃসাহসী কাজে হাত দিয়েছিলেন কেন? কারণ, পিতার সমসাময়িক নীরদচন্দ্র চৌধুরী সমেত আরও বেশ কিছু পণ্ডিত, এই বই সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরা এই বইটিকে অনুবাদের অযোগ্যও মনে করেননি।

আমার পিতা এই অনুবাদের জন্য, যতদূর জানা আছে, কোনো অর্থ গ্রহণ করেননি। এটি ছিল তাঁর ত্রৈলোক্যপ্রীতি, এবং সাহিত্য কর্তব্য। তাই অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি এই দীর্ঘ পুস্তকটি অনুবাদ করেছিলেন। খুব সম্ভবত দীর্ঘ ৪০০ পৃষ্ঠা থেকে তিনি কিছু কিছু বাদ দিয়েছিলেন, যা হয়ত যে সময়ে লেখা সে সময়ের পাঠকদের পক্ষেই বেশি উপযোগী ছিল। কিন্তু কতটা বাদ দিয়েছিলেন, কেন বাদ দিয়েছিলেন তা তিনি জানিয়ে যেতে পারেননি। মূল বইটিও সংগ্রহ করা যায়নি। একদা মূল বইটি জাতীয় গ্রন্থাগারে ছিল—এবং সম্ভবত এক কপি এশিয়াটিক সোসাইটিতেও ছিল, কিন্তু একজন গবেষক পিতা-সংক্রান্ত কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য (বিশেষ করে তাঁর অনুবাদের ব্যাপারে) বইটির খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু তিনি কোথাও বইটি পাননি। সেই কারণে মূল বইটি এখন সত্যিই দুষ্প্রাপ্য।

কিন্তু যেটুকু আমরা অনুবাদেব মাধ্যমে পেয়েছি তারও পরিমাণ কম নয়। তা উক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি যাই বলুন না কেন! এর মধ্যে, আমাদের ধারণা, কিছু এমন আছে যা বর্তমান পাঠকদেরও কৌতূহলী করে তুলবে। বিশেষ করে ত্রৈলোক্যনাথ সম্পর্কে যাঁরা বিশেষ ভাবে জানতে চান তাঁদের কাছে এই বইটি নিঃসন্দেহে একটি অভাব মেটাবে।

বইটি প্রকাশের সময় এন এন ঘোষের মূল ভূমিকাটি আমার ভাই হিমানীশ গোস্বামী অনুবাদ করে দিয়েছে। এন এন ঘোষের পুরো নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনিও তাঁর কালে (১৮৫৪-১৯০৯) একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৭১ সালে এফ-এ পরীক্ষায় ইনি চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। বি-এ পড়তে পড়তে ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে ইংল্যাণ্ডে যান, কিন্তু তাতে তিনি কৃতকার্য না হতে পেরে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করেন। ঐ সময়ে হিন্দু সমাজ যে কতখানি রক্ষণশীল ছিল এটা তার একটি প্রমাণ। তিনি নিজে অবশ্য ভূমিকায় লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথকে সামাজিক শাস্তিবিধান পেতে হয়নি, এবং তাতে তিনি প্রমাণ পান হিন্দুসমাজ, কিংবা ধর্ম কঠিন আবরণে আর আবদ্ধ থাকছে না। তিনি ১৮৭৬ সাল থেকে কলকাতার হাইকোর্টে ব্যবসা শুরু করেন। ১৮৮৩ সাল থেকে ইন্ডিয়ান নেশান পত্রিকার সম্পাদক হন এবং আমৃত্যু তিনি ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এঁর ইংরিজি ভাষায় অসাধারণ দখল ছিল। ইনি বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এই নগেন্দ্রনাথ ঘোষ। এই পত্রিকারই ম্যানেজার ত্রৈলোক্যনাথকে এই পত্রিকায় তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে অনুরোধ করেন। এই কারণে নগেন্দ্রনাথ ঘোষের ভূমিকাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে উল্লেখ্য, তাঁর ভূমিকায় যে পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া আছে তা মূল বই-এর, বর্তমান বই-এর নয়। আরও একটি কথা যোগ

করা দরকার। আমার পিতা পরিমল গোস্বামী তাঁর "আধুনিক ব্যঙ্গ পরিচয়" পুস্তকে ত্রৈলোক্যনাথ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে তাঁর ব্যঙ্গের দিকটা নিয়ে লিখেছেন। তাতেও তিনি "এ ভিজিট টু ইউরোপ" নিয়ে কিছু আলোচনা করেছেন। স্বভাবত যিনি ব্যঙ্গ লেখক, সেই ত্রৈলোক্যনাথের "এ ভিজিট টু ইউরোপ"-এও ব্যঙ্গের অভাব নেই। এটাই স্বাভাবিক—যদিও বইটির অনেক অংশই অতিরিক্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ মেজাজে রচিত।

একটি ভুল স্বীকার করা দরকার। বইটির মূল নাম "এ ভিজিট টু ইউরোপ"-এর বাংলা করা হয়েছিল "আমার ইউরোপ ভ্রমণ"। সেই অনুযায়ী বইটির ইংরিজি নাম লিখবার সময় মূল বইটা হাতের কাছে না থাকায় মলাট করবার সময় মলাটে "মাই ভিজিট টু ইউরোপ" লেখা হয়েছে। এটি একটি ত্রুটি।

পরিশেষে, সেই পণ্ডিতকে স্মরণ করি যিনি সাপ্তাহিক বসুমতীতে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে আরও যোগ করেছিলেন, "আজকের দিনে এর গুরুত্ব কতটুকু?" এছাড়া, "অনুবাদ যেখানে প্রাণহীন ও আক্ষরিক সেখানে ত্রৈলোক্যনাথ-এর আসল রচনার মর্যাদা কতটুকু বজায় থাকছে?"

অনুবাদ প্রাণহীন কিনা তা সুধী পাঠক বিচার করবেন নিশ্চয়। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের মূল বইটা না পড়লে তাঁর "আসল রচনা" কি রকম ছিল সেটা বোঝা যাবে না। কোনো প্রকাশক যদি ত্রৈলোক্যনাথের মূল বইটি আজ প্রকাশ করতে পারতেন তাহলে বোধহয় ভাল হত।

কিছু ছাপার ভুল থাকায় আন্তরিক দুঃখিত।*

মার্চ, ১৯৮২

শতদল গোস্বামী

---

* চর্চাপদ সংস্করণে অনুবাদকের বানান এবং বাক্যগঠনরীতিতে সাধারণভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়নি। কেবল কোথাও কোথাও মুদ্রণপ্রমাদ থাকায় তা সংশোধিত হয়েছে—প্রকাশক।

বর্তমান সংস্করণের ভূমিকা

'এ ভিজিট টু ইওরোপ' নামে ইংরেজি ভাষায় একটি বই লিখেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। কোন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়? উদ্ভট রসের লেখক, 'কঙ্কাবতী' এবং গুলবাজ 'ডমরুধর' যিনি রচনা করেছিলেন এটি কি তাঁর রচনা? একটু অবিশ্বাস্য মনে হতেই পারে, কিন্তু এটিই প্রকৃত ঘটনা। নানা দিক দিয়ে বিচার করলে এটি একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা বলেই মনে হতে পারে। বাংলাভাষার পণ্ডিত, অধ্যাপক, গবেষকরা এই বইটি সম্পর্কে কোথাও কোনো উল্লেখ পর্যন্ত করেননি। করলেও সে-সব বাংলাভাষার ছাত্রদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে গেছে। উনিশ শতকের 'পুনর্জাগরণ'-এর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মতো তাঁরও ছিল একটি বৈজ্ঞানিক মন, জগতেব সবই একই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত— কোথাও একফোঁটা অলৌকিকত্ব নেই, এটাই তাঁরা সহজে বুঝে নিয়েছিলেন। উনিশ শতকের এই ধ্যানধারণা যাঁরা সত্য বলে মনে করতেন তাঁদের বলা হত অজ্ঞেয়বাদী— অর্থাৎ দেবতা, ভগবান ইত্যাদির কোনো বিশেষ 'ঐশ্বরিক' ক্ষমতা ছিল এমন কথা তাঁরা মনে আনতে পারেননি।

১৯৬০-'৬১-'৬২তে নির্দিষ্ট কোনো চাকরি না থাকায় ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে প্রায়ই সময় কাটাতাম। সেখানেই হঠাৎ তালিকায় দেখতে পাই বইটির নাম। বইটি চাই এমন একটি 'অনুরোধ স্লিপ' পাঠানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার পরিচিত গ্রন্থাগার কর্মী সুভাষ সমাজদার বইটি আমার হাতে এনে দেন। বইটি পেয়ে তাড়াতাড়িই সেটি পড়ে ফেলি। প্রায় হুড়মুড় করেই পড়ে তারপর কয়েকদিন ধরে খাতায় তা টুকতে থাকি। সবটা নয়—বেছে বেছে কিছু কিছু জায়গা। খাতাটা বাড়িতে এনে বাবাকে দেখাই। বাবা অবাক হয়ে যান। তিনি স্থির করেন বইটি অনুবাদ করবেন। এমন জিনিস অজ্ঞাত থেকে যাবে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই বইটির একটি কপি প্রয়োজন হয়ে পড়ল। তখন ফোটোকপি, বা ভুল করেই বলা হয়ে থাকে জেরক্স কপি, তার সময় আসেনি। আর ওই বইটিকে লাইব্রেরির বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করাও সম্ভব ছিল না। অতএব অপেক্ষা করতে হল আরও কিছু দিন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে বইটির একটি কপির সন্ধান এনে দিলেন অমিতা রায়, আমার বিশেষ বন্ধু পুলক বসু-র ছোট বোন।

বাবা বইটির দ্রুত অনুবাদ করে ফেলেন, এবং সাপ্তাহিক বসুমতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু, ইংরেজদের প্রশংসাপূর্ণ ত্রৈলোক্যনাথের বইটির অনুবাদ ছাপা ভারী অন্যায় হয়েছে এমন তীব্র মন্তব্য করে সাপ্তাহিক বসুমতীতে চিঠি পাঠালেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নামে একজন বাংলার অধ্যাপক। সেটি প্রকাশিত হল। বাবার মেজাজ গেল বিগড়ে।

তিনি আর 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' ওই পত্রিকায় প্রকাশ করতে চাইলেন না। বইটির পঞ্চত্ব প্রাপ্তিই ঘটল, কেননা কোনো প্রকাশক সে সময় বইটি প্রকাশ করার কথা উচ্চারণও করলেন না। এমন সময় আর একটি ব্যাপার ঘটল, সেটাই ভারী রহস্যজনক। আমার লেখক বন্ধু কৃষ্ণ চক্রবর্তী—যাঁর লেখা সরকার বাহাদুর নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তিনি আমাকে বললেন, যে-সব কবি-সাহিত্যিকদের প্রকাশক জোটে না, তাদের জন্য নতুন বামফ্রন্ট সরকার একটি চমৎকার পরিকল্পনা করেছেন। পাণ্ডুলিপি জমা দিলে, তা যদি উপযুক্ত বিবেচিত হয় সেক্ষেত্রে এক হাজার কপি ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদির প্রকৃত খরচের শতকরা আশি ভাগ অনুদান দেওয়া হবে। আমরা, অর্থাৎ আমি এবং আমার দাদা শতদল আবেদন করলাম এবং এক শুভক্ষণে সেটিকে রাইটার্স বিল্ডিং-এর প্রায় মহাফেজখানার মতো একটি স্থানে ভয়ে ভয়ে জমাও দিয়ে আসা হল। কিছুদিন পরেই জানা গেল অনুমতি পাওয়া গেছে। একটি ছাপাখানার সঙ্গে সুব্যবস্থা করে যন্ত্রস্থ করা হল। যন্ত্রণারও প্রায় অবসান ঘটল। তারপর টাকাও পাওয়া গেল। আমরা বুদ্ধি খরচ করে এক হাজার কপিই ছাপালাম। শোনা গেল, অনেকে সততার সঙ্গেই বোধহয় শ-দেড়েক কপি ছেপেই পুরো টাকাটা হজম করত। সত্য-মিথ্যা জানিনা।

সবই তো হল, কিন্তু শেষ সরকারি চেকটি এল শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়েরই নামে। রেজিস্ট্রি খামে, কেয়ার অব শতদল গোস্বামী। অতএব চার-পাঁচ জনের মাথায় হাত! চেকটিতে মৃত ব্যক্তির নাম কেটে জীবিত ব্যক্তির নাম বসাতে গিয়ে বোঝা গেল ব্যাপারটি রাইফেলের নলের সামনের দিকে বসানো তীব্র ছোরাটির মতো, অর্থাৎ সঙ্গীন! জানা গেল, কিঞ্চিৎ অসুবিধের ব্যাপার ঘটেছে। এক নম্বর হল অনুবাদের জন্য কোনো অনুদান দেওয়া হয় না। দু-নম্বর, কোনো মৃত ব্যক্তির নামেও অনুদান দেওয়া হয় না। তিন নম্বর, বিষয়টি সামান্য নয়, অসামান্যভাবেই হচ-পচি কীর্তি, অর্থাৎ গভীর গাড্ডায়। তবে দোষটা যেহেতু আমাদের নয়, সেজন্য এটিকে ধামাচাপা দেওয়া হল। তবে দশ কপির বেশি বিক্রিও হল না, যদিও অনেক কাগজে এটির উচ্চ-প্রশংসা করা হয়েছিল। আমরা সিঁথির বাড়ি চিরতরে ছেড়ে আসার সময় কয়েকখানা বই ছাড়া আর সবই সেখানে ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে আর এক কেচ্ছা!

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অবশ্য এখন আর ব্রাত্য নন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপকই এঁর কথা সশ্রদ্ধভাবেই উল্লেখ করেন। কিন্তু 'আমার ইউরোপ ভ্রমণ' বইটির নাম এখনও অন্ধকারেই রয়ে গেল। ভরসার কথা একটি অবশ্যই আছে। নতুন যুগ শুরু হয়েছে, এবং জীবনের ধন আর ফেলা হচ্ছে না সর্বদা। নতুন প্রকাশকেরা আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসছেন। নতুন নতুন প্রকাশে আশ্চর্যও হতে হয়। বর্তমান প্রকাশককেও এ কারণে ধন্যবাদ জানাই।

১

১৮৮৬ সনের ১২ই মার্চ তারিখ 'নেপাল' নামক জাহাজখানা বম্বে হইতে ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিল। সেদিনের সেই বসন্ত সন্ধ্যায় 'নেপাল' বেশ একটা গর্বিত ভঙ্গিতে ভারত সমুদ্র পাড়ি দিয়া এডেন বন্দরের দিকে চলিতেছিল, এবং সেদিন জাহাজখানা যতগুলি হিন্দুর মিলিত হৃৎস্পন্দন অনুভব করিয়াছিল এমন আর কখনও কোনও ডাকবাহী জাহাজ করে নাই। তাহার গর্ব অহেতুক ছিল না। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বৃহৎ পরিণাম সার্থক করিয়া তুলিতে ইংল্যাণ্ডের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল, তাহা সে পালন করিয়াছে এই বাষ্পপোতের সাহায্যেই। সে তাহার সুবৃহৎ ভারত সাম্রাজ্যের উপর তাহার নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিয়া বহু ভারত-সন্তানকে জাতিভেদের বাধা ভাঙিয়া সংস্কার ও আচার সমূহের ঊর্দ্ধে উঠিতে সাহায্য করিয়াছে। এবং তাহাদিগকে বর্তমান সভ্যতার একেবারে উৎসমুখে আনিয়া নূতন শিক্ষা ও জ্ঞানালোক গ্রহণ করিতে উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছে। জাহাজে কত জাতীয় মানুষ! স্ত্রী, ভগিনী ও শিশুসন্তানসহ এক দীর্ঘদেহ লাহোরের পঞ্জাবী, দিল্লীর দুই জন হিন্দু বণিক, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের এক লালা, আলিগড়ের জনৈক মুসলমান, দুইজন বাঙালী ব্রাহ্মণ, উড়িষ্যার এক কায়েথ, গোয়াবাসী দুইজন খ্রীস্টান—সবাই চলিয়াছেন ভারত ভাগ্য নিয়ন্তার দেশে, যদিও প্রত্যেকের লক্ষ্য পৃথক। ভারতের অনেকগুলি জাতিরই প্রতিনিধি সেদিন 'নেপাল'-এর ডেকে আসিয়া সমবেত হইয়া ছিলেন। তাঁহারা সবাই দেখিতে লাগিলেন—ভারত সমুদ্রের জলরাশি কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সবুজাভ বর্ণ হারাইয়া নীলে রূপান্তরিত হইতেছে, ক্রমে তাঁহাদের জন্মভূমি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে, মহালক্ষ্মী পাহাড়ে আছাড়-খাওয়া ঢেউগুলির শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। সূর্য তাহার দিনের কর্তব্যশেষে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। ক্রমে সে তাহার অধঃস্থিত জগতে চোখধাঁধানো আলোকপাত বন্ধ করিয়া দিল, তাহার বৃত্ত-দেহটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার তেজ মন্দ হইয়া আসিল এবং অবশেষে রক্তরাঙা আভরণ পরিয়া পশ্চিম আকাশ গাঢ় রক্তিমার অপরূপ মহিমায় রঞ্জিত করিয়া দূর দিগন্তের নীল তরঙ্গে ডুবিয়া গেল। তারপর সন্ধ্যার ছায়া নামিয়া আসিল, পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিল, ক্রমে বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে ঢেউয়ের দোলায় জাহাজের দোলনের সঙ্গে নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব দুলিতে লাগিল। তীরভূমি এক্ষণে অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কোলাবা আলোক-স্তম্ভের ঘূর্ণমান শীর্ষ হইতে আলোর ঝলকানি দেখা যাইতেছে, তাহার সাহায্যে দূরের নাবিকেরা অ্যাপোলো-বন্দরের পথ চিনিয়া লইতেছে। আমরা সবাই এখন একসঙ্গে ডেকের উপর সমবেত হইয়া, আমাদের সম্মুখে এখন যে দৃশ্য উদঘাটিত হইতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিতবৎ দাঁড়াইয়া আছি। অন্ধকার যত

গাঢ় হইতেছে, ততই অনুপ্রভাবিশিষ্ট (ফস্‌ফোরিক) তরঙ্গের সাদা ফেনা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এই আলো ঝলমল তরঙ্গসমূহ আমাদের জাহাজের গায়ে অবিরাম আঘাত হানিতেছে। আমরা দেখিতেছি আর নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছি। আলাপের বিষয় কে কত দূর যাইবে, সমুদ্রযাত্রার বিপদ কি কি, সামুদ্রিক-পীড়ার দুঃখ ইত্যাদি যখন যাহা আমাদের অনভিজ্ঞ মনে আসিতেছে, তাহা। ভারতীয় মহিলাগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ লাজুকতা ও শিশুসুলভ স্বভাব লইয়া এক কোণে জড়োসড়ো হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারা আমাদের চরিদিকে সীমাহীন সমুদ্র বিস্তারের দৃশ্যে কিছু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই মাথার মধ্যে কেমন যেন একটা দোলন অনুভব করিতেছেন।

ভারতীয়দের পরস্পর পরিচিত হইতে বিলম্ব হয় না। আমাদের সামাজিক অভ্যাস এমন যে আমরা পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন চলিতে পারি না। আমরা আমাদের সুখ-দুঃখ আমাদের প্রতিবেশী আত্মীয় বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করিয়া লই। অপরিচিতের নাম, জাতি, কি করা হয়, কোথায় নিবাস, কোথায় যাইবেন, উপলক্ষ কি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা আমাদের বিবেচনায় অশিষ্টতা নহে। এক ভারতীয় অন্য ভারতীয়কে, দেখা হইতেই, "এই যে ভাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?" এই প্রশ্নটাই প্রথমে করে—উভয়ে একই দিকের পথিক হইলে। আবার এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে ঠগেরাও তাহাদের দুষ্কার্য চালাইবার সুবিধা পায়, এবং এইভাবেই চোরেরাও সরলমতি লোকদিগকে ঔষধ প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া থাকে।

যাহা হউক জাহাজের বুকে, আধঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা অল্পসংখ্যক ভারতীয় পরস্পব সেই অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত মানুষদের মধ্যে যতটা সম্ভব পরিচিত হইলাম।

যাত্রীবাহী জাহাজের চরিত্র আমাদের অনেক যাত্রীরই জানা ছিল না। ইহাকে নানা বিলাস সামগ্রী ও ভোগ্য সম্বলিত একখানি প্রকাণ্ড ধনীগৃহের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমে ডেকের কথা ধরা যাউক। ডেক সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট কাঠের তক্তার পাটাতন, এবং তাহা দীর্ঘ রবারের নলের সাহায্যে প্রবল জলের ধারায় ধুইয়া পরিষ্কার করিবার পূর্বে প্রতিদিন সকালে বালি ও নারিকেলের ছোবড়ার সাহায্যে ঘষিয়া দেওয়া হয়। মাঝখানে কাটা দুটি ভাগে ভাগ করা নারিকেলের মালাসমেত ছোবড়া ব্যবহার করা হয় এই কাজে। যাত্রীরা এখানে দুই পাশের দীর্ঘ খোলা পথে যাতায়াত করিয়া ভ্রমণ ব্যায়াম করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। অথবা ইচ্ছা হইলে ক্যানভাসে আবৃত স্থানে বসিয়া দাবা অথবা ঐ জাতীয় কোনো বৈঠকি খেলা খেলা যাইতে পারে। সব আয়োজনই সেখানে উপস্থিত। কোনও কোনও জাহাজে ধূমপানের জন্য পৃথকভাবে সজ্জিত কক্ষ আছে। যখন সমুদ্রের দৃশ্য, উড়ন্ত মাছ ও অন্যান্য দর্শনীয়তে আর ততটা আকর্ষণ থাকে না, প্রথম দর্শনের উল্লাস কাটিয়া যায়, তখন দীর্ঘ সময়ের একটানা একঘেয়েমির ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে অনেকে এই কক্ষে আসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে। আবহাওয়া অনুকূল থাকিলে মাঝে মাঝে ডেকের উপর পিয়ানো টানিয়া আনিয়া কোনো মহিলা বাজনার সাহায্যে যাত্রীদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। নিচে দুটি দীর্ঘ সারিতে জাহাজের দুই পাশে ক্যাবিন, প্রত্যেক ক্যাবিনে দুই

তিন অথবা বেশি সংখ্যক বার্থ বা ঘুমাইবার স্থান আছে। তবে অধিকাংশ যাত্রীই সমস্তটা দিন ডেকে কাটায়, অনেকে আবার রাত্রিও কাটায়, অবশ্য যদি ঠাণ্ডা না থাকে। অনেক জাহাজে ডাইনিং স্যালুন দুই সারি ক্যাবিনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত, আবার কোথাও একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত চওড়া দিকের সবটাই ডাইনিং স্যালুনরূপে ব্যবহৃত হয়। এখানে খাওয়া শেষ হইলে স্থানটি বসিবার জন্য অথবা লেখাপড়া করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করিয়া উপরের ডেক যদি প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা গুমোট গরমে থাকিবার অযোগ্য হইয়া উঠে, তখন।

লোহিত সমুদ্রে অনেকের সর্দি-গর্মি হয়, কিন্তু তার কারণ অতিভোজন, এমন অনুমান করা হইয়াছে। সকালের চায়ের সময় ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে। প্রাতরাশ ৮টা হইতে ৯টার মধ্যে। লাঞ্চ ১টা হইতে ২টার মধ্যে। ডিনার ৬টা হইতে ৭টার মধ্যে। ইহাই দৈনিক আহারের সময় তালিকা। সকাল ও বিকালের চা ব্যতীত অন্য সময়ের আহার বেশ পুষ্টিকর ও সারবান, এবং পদেও বহুবিধ। অবশ্য অধিকাংশ ডিশেরই প্রধান উপকরণ মাংস। রুটি, ভাত, আলু ও শাকসব্জীর প্রচুর পরিবেশন। সুতরাং নিরামিষভোজীর অসুবিধা নাই কিছু। ইচ্ছা হইলে হিন্দু জাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে পৃথক রান্না করিয়া। উনুন এবং পাত্রের ব্যবস্থাও অবশ্যই জাহাজের কর্মীরা করিয়া দিবে। এই জাতীয় যাত্রী-জাহাজে ছোটখাটো একটি লাইব্রেরী থাকে, সামান্য কিছু খরচ করিয়া বই পড়ার সুযোগ পাওয়া যায়। কোন কোন জাহাজে আবার 'লেডীজ রুম' থাকে, যাহারা ধূমপান করে না তাহারা সেখানে গিয়া বসিতে পারে, পিয়ানো সেই কক্ষেই থাকে। সুতরাং একটি প্রথম শ্রেণীর যাত্রী জাহাজ, কার্যত, সুসজ্জিত নানা বিলাসদ্রব্যে পূর্ণ এবং সভ্যজীবনের যাবতীয় উপভোগ্য আয়োজন পূর্ণ একটি প্রাসাদ বিশেষ।

জাহাজের দিনগুলিতে আর কোনও বৈচিত্র্য নাই, সুতরাং উল্লেখযোগ্যও বিশেষ কিছু নাই। আমরা সব সময়েই ঘন নীল জলের বিরাট এক চক্রাকার বিস্তারের মধ্যে অবস্থান করিয়াছি, তাহার পরিধিরেখায় সমস্ত নীল আকাশখানি নত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছে— যেন অতি বিরাট এবং উত্তাল এক কটাহ উল্টা হইয়া সমুদ্রকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কোথাও জীবনের চিহ্ন নাই, মাঝে সাঝে দেখা যায় শাদা রঙের সামুদ্রিক চিল সহজে সমুদ্রের উপর নামিয়া বসিতেছে এবং ঢেউয়ের ওঠানামার সঙ্গে ওঠানামা করিতেছে। জাহাজ তাহার কাছে অগ্রসর হইলে আকাশে উড়িয়া কখনও জাহাজের এপাশে কখনও ওপাশে যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া শিকারপ্রিয় যাত্রী ক্যাবিনে ছুটিয়া বন্দুক লইয়া আসিতে না আসিতে, জাহাজ পর্যবেক্ষণ শেষ করিয়া সে অন্যদিকে চলিয়া যাইতেছে। শিকারী দেখিতে পায় শুধু বহু দূরে একটি শ্বেতবিন্দু শাদা ঢেউয়ের ফেনার মধ্যে কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। মাঝে মাঝে উড়ন্ত মাছের ঝাঁক হঠাৎ জল থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে উঠিয়া কে কতদূরে উড়িয়া যাইতে পারে তাহার পাল্লা চালায়। চলার পথে অনেকগুলি হার মানিয়া জলে পড়িয়া যায়, শেষ পর্যন্ত দুই তিনটি টিকিয়া থাকে, কিন্তু তাহারাও ক্লান্ত হইয়া হারিয়া

যায়, একটি মাত্র শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে এবং তাহারও দৌড় শেষ হয়। কখনও হয় তো দিনের শেষে সেদিনের ঘটনা ডায়ারিতে লিখিতে বসিয়াছি এমন সময় দূরাগত অন্য জাহাজের আবির্ভাব ঘোষণা করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, আমরা ডায়ারি লেখা ফেলিয়া ডেকে ছুটিয়া আসিলাম। ডায়ারি আমরা অবশ্য প্রথম কয়েকদিন মাত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু ক্রমেই অলসতাবশতঃ বাকি পড়াতে শেষে লেখা ছাড়িয়া দিলাম। ডেকে ছুটিয়া আসিয়া কোথায় দূর জাহাজের চিহ্ন সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। কেহ কেহ চোখে দূরবীণ লাগাইয়া দূরের কালো বিন্দু দেখিতে লাগিল। ক্রমে তাহার আকার বৃদ্ধি পাইয়া স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। সেই জাহাজ ও আমাদের জাহাজের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় হইল, জাহাজের নাম ও গন্তব্যস্থল আমাদের জানা হইয়া গেল।

এইভাবে দিন কাটিবার পর, বম্বাই ছাড়িবার ছয়দিন পরে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে এডেন বন্দরের রুক্ষ পাহাড়গুলি প্রকাশিত হইল। চারিদিকে সবুজের মধ্যে বাস করিয়া অভ্যস্ত চোখে এই উলঙ্গ খাড়া পাহাড়গুলি অত্যন্ত প্রাণহীন এবং মরুভূমিতুল্য বোধ হইতে লাগিল। এগুলি আগ্নেয়গিরি-জাত পাহাড়। সূর্য মাথার উপর উঠিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ইহাদের গলিত লাভায় গঠিত অঙ্গ, ব্রাউন, ধূসর, ঘন সবুজ প্রভৃতি বর্ণ প্রতিফলিত করিতে লাগিল। এই সব পাহাড়ে অগ্ন্যুৎপাতের পরে যে সব গহ্বর সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার উপর এডেন শহর। এটি অ্যারাবিয়া ফেলিক্স-এর অন্তর্ভুক্ত ইয়েমেনের দক্ষিণ উপকূলে ছোট্ট এডেন উপদ্বীপের অংশ। আমাদের জাহাজ ক্রমে অগভীর জলে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং বন্দরের কাছে আসিবার সময় জল ঘোলাটে হইয়া উঠিল। নোঙ্গর ফেলামাত্র ছোট ছোট নৌকা ও ক্যানু তীরভূমি হইতে আসিয়া আমাদের প্রায় ঘিরিয়া ধরিল। ছোট ছোট কৃষ্ণকায় বালক নৌকা হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া "আমি ডুবছি" "আমি ডুবছি" বলিয়া অবিরাম চিৎকার করিতে লাগিল। তাহার অর্থ, কেহ যদি দয়া করিয়া একটি দুআনি জলে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে তাহারা ডুবিয়া তাহা তুলিয়া লইবে। এ বিষয়ে তাহারা একেবারে পাকা ওস্তাদ। ডেকের দশ ফুট উচ্চতা হইতে একটি দুআনি ফেলিবা মাত্র তাহারা উহা জলের ভিতর হইতে কুড়াইয়া লইবার জন্য ডুব মারিবে। জল স্বচ্ছ, মাটি পর্যন্ত দেখিতে কষ্ট হয় না, উহারা দুআনিটি ফেলিবামাত্র তাহাকে অনুসরণ করিয়া ডুবিতে থাকে, এবং মাটিতে পৌঁছবার আগেই তাহা ধরিয়া ফেলে। ইহারা অধিকাংশই আফ্রিকার সন্তান। সোমালি উপকূল হইতে যাহারা কিছু রোজগারের আশায় আসিয়া থাকে ইহারা তাহাদেরই বংশধর। তাহারা এডেনে আসিয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং কিছু রোজগার হইলে স্ত্রী-সন্তানাদি ফেলিয়া দেশে ফিরিয়া যায়। মায়েরা তখন আবার নতুন আগন্তুকের আশ্রয়ে যায়। এরাও সেই একই স্থানের বাসিন্দা। তাদের ছেলেমেয়েরা ভিক্ষা, চুরি অথবা "ডাইভিং" দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। অন্য মুসলমানেরা তাহাদের পুরুষদের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, সোমালিরা তাহাদের স্ত্রীলোকদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অদ্ভুত রীতি কয়েকটি আরব উপজাতির মধ্যেও প্রচলিত। আমাদের জাহাজে

অনেক ইহুদি ও আরব উটপাখীর পালক ও ডিম বিক্রয় করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। এডেন হইয়া যে-সব যাত্রী যাতায়াত করে তাহারা এই পালক প্রচুর পরিমাণে কিনিয়া থাকে, স্ত্রীলোকের টুপির শোভাবর্ধনের জন্য এই পালক দরকার হয়। প্রধানত এই পালকগুলি সোমালি উপকূল হইতে আনা হইয়া থাকে। খুচরা বিক্রয়ের জন্য চারিটি করিয়া পালকের এক-একটি গোছা বাঁধা হয় এবং সর্বোৎকৃষ্টগুলি কুড়ি হইতে ত্রিশ টাকা দামে বিক্রয় হইয়া যায়। কালো পালক পছন্দসই নহে, তাহার দাম এক টাকা হইতে আট টাকা। আফ্রিকায় উটপাখী শিকার করা হয় স্ত্রী পাখীর সাহায্যে। শিকারী তাহার পাখার আড়ালে থাকিয়া স্ত্রী পাখীটাকে বন্য উটপাখীর দিকে চালাইয়া লইয়া যায়, এবং যথেষ্ট কাছে আসিলে বিষাক্ত তীরের সাহায্যে তাহাকে মারিয়া ফেলে।

এডেনে আমরা জাহাজ হইতে তীবে নামিলাম, নামিবার পরে স্থানটিকে আরও বেশি নির্জীব বলিয়া বোধ হইল। নাবিকদেব মধ্যে একটি কৌতুক প্রচলিত আছে যে, এডেনের কোনও গাছের পাতা ছেঁড়া অথবা কোনও গাছের ক্ষতি করা চরম অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। এটি হাসির ব্যাপার এই কারণে যে, এডেনে কোনও গাছই নাই। ছোট ছোট গুল্ম কিছু কিছু দেখিয়াছি, কিন্তু শুষ্ক আবহাওয়া সেলিউলাব টিসু বা কোষকলা কমাইয়া ছোট ছোট কাঁটা গাছ উৎপাদনে সাহায্য করিয়াছে। আরবদের শহর এখান হইতে প্রায দুই মাইল দূরে, সেই শহর পাহাড়-ঘেরা, সেখানে ছোটখাটো একটি বাগান আছে, কিন্তু সেখানে একটিও বড় গাছ নাই। যে সব উদ্ভিদ ভারতবর্ষে বনস্পতিতে পরিণত হয়, এডেনে তাহা গুল্মের অপেক্ষা বড় হইতে পারে নাই। এই বাগানে দেখিলাম আমাদের বক ফুলের গাছ (Sesbania grandiflora, Pers.), তাহাতে ফুলও ফুটিয়াছে কিন্তু গাছটি পাঁচ ফুট দীর্ঘও নহে। এডেনের সর্বাপেক্ষা মনোহর জিনিস জলাধারগুলি। এডেন বন্দরের পত্তনের সময় হইতে জল যোগানের প্রশ্নটি সব সময়ে কঠিন মনে হইয়াছে, এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য স্মরণাতীত কাল হইতে নানা চেষ্টাই হইয়াছে। বৃষ্টি যাহা হয় তাহা নিতান্তই তুচ্ছ, সমস্ত বৎসরে মাত্র তিন চারি ইঞ্চি! বহু পূর্ব হইতেই এই সামান্য বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট যত্ন লওয়া হইয়াছে। এবং তাহা শুধু এডেনের জন্য নহে, আরবের সকল অংশের জন্যই। ২৫০০ বৎসর পূর্বে মারেব-বাঁধ এই উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হইয়াছিল। এরকম পঞ্চাশটির বেশি জলাধার রহিয়াছে, কিন্তু মেরামতের অভাবে তাহাদের মধ্যে মাত্র তেরটি ভিন্ন অন্য সমস্তগুলিই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। যে তেরটি ব্যবহার্য আছে সেগুলি লাহেজের সুলতানের সহযোগিতায় ব্রিটিশ সরকার নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়াছেন। এই জলাধারগুলি হইতে লোকেদের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল প্রতি ১০০ গ্যালন এক টাকা হিসাবে বিক্রয় কবা হয়। কিন্তু এই জল পানের উপযোগী নহে। সম্প্রতি সমুদ্রের লোনা জল পাতিত করিয়া তাহা হইতে বিশুদ্ধ পানীয় প্রস্তুত করিবার জন্য সরকার এবং প্রাইভেট কম্পানি উভয়েই কয়েকটি কনডেন্সার স্থাপন করিয়াছেন। ইহার সাহায্যে বাষ্প শীতলীকৃত হইয়া জলে পরিণত হয়। এডেনের বাজার ভারতের কোনও

বাজার হইতে ভিন্ন নহে—সেই একই অপরিচ্ছন্নতা—একই অনিয়ম এখানেও। কিন্তু ইংরেজ যেখানেই গিয়াছে, সেখানেই সঙ্গে আনিয়াছে বাণিজ্য, শান্তি এবং সমৃদ্ধি। পূর্বতন অত্যাচারী স্বভাবের শাসনকর্তাদের ব্যবহারে এবং গত শতকের অবিরাম ক্ষমতার লড়াইয়ের দরুণ এডেনে তাহার প্রাচীন বাণিজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু সে তাহার সেই বিনষ্ট বাণিজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছে। আমরা এখানে অনেক কফি-হাউস দেখিলাম, সেখানে আরব ও সোমালিয়া দিবারাত্রি কফি পান করিতেছে। মহম্মদের সময় হইতে সুরা অথবা সুরাজাতীয় পানীয় নিষিদ্ধ হওয়াতে আরবগণ অন্য বিকল্প উত্তেজকের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। কফি তাহাদেরই আবিষ্কার। অন্য একটির নাম 'কাথ'—কাথা নামক একটি উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত। ইয়েমেনের পাহাড়ে ইহার জন্ম। আরবরা ইহা হইতে প্রস্তুত নেশার দ্রব্য চিবাইয়া খায়—খুব আনন্দদায়ক উত্তেজক এটি। এক সময়ে কথা উঠিয়াছিল, কফি ও কাথও তাহাদের খাওয়া উচিত কিনা, কারণ পবিত্র কোরানের নির্দেশ "সুরা বা যে কোনও নেশার দ্রব্য ব্যবহার করিও না।" লব্ধপ্রতিষ্ঠ শাস্ত্রজ্ঞগণ এ বিষয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া ইহার পক্ষে ও বিপক্ষে কিছু দিন ধরিয়া বিতর্ক চালাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার শেষ মীমাংসা করিয়া দিলেন ফকরউদ্দীন মাক্কি ও অন্যান্য শাস্ত্রব্যাখ্যাতাগণ। ফলে আজ কফি ও কাথ ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুদের বিস্ময়কর সব ক্রিয়াকলাপ বা কীর্তি আবিষ্কারের জন্য আমার দেশের যাঁহারা কল্পনার বিস্তারে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুনিয়া খুশি হইবেন, ইবন এল মোজাহির নামক জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়া গিয়াছেন, এডেন, দশশির নামক দানবরাজ কর্তৃক "আন্দামান" রূপে ব্যবহৃত হইত। দশশির অর্থাৎ দশ মাথাওয়ালা রাবণ। যাবজ্জীবন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের এডেনে নির্বাসনে পাঠাইত। কথিত আছে, এডেনের পাহাড়গুলির মধ্যে কোথাও একটি কূপ আছে, তাহার ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগাযোগের উপযুক্ত একটি সুরঙ্গ-পথ আছে। এই সুরঙ্গ-পথ সম্পর্কে উক্ত ঐতিহাসিক বলিতেছেন, "মহম্মদ বিন মাসুদের পিতা মুবারক ইল শারোনি মৌলা আমাকে বলিয়াছেন, উক্ত দশশির দানব অযোধ্যা প্রদেশ হইতে রাম হায়দারের স্ত্রীকে খাট সমেত চুরি করিয়া আকাশ পথে চলিবার সময় জেবেলসিরা পাহাড়ের মাথায় বিশ্রাম করিবার সময় রাম হায়দারের স্ত্রীকে বলিয়াছিল, আমি তোমার মানুষের দেহটিকে একটি জিনে বদল করিব এমন ইচ্ছা। তাহাতে দুইজনের মধ্যে বচসা বাধিয়া উঠিল, তখন বানর-বেশী হন্‌বীত নামক এক এফরীত তাহা শুনিতে পাইয়া একরাত্রির পরিশ্রমে উজ্জইন বিক্রম নামক নগর হইতে সমুদ্রের নিচে দিয়া সুরঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিয়া জেবেলসিরার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইল, পাহাড়ের মাথায় একটি কাঁটাগাছের নিচে রাম হায়দারের স্ত্রী ঘুমাইতেছে। সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিঠে তুলিয়া সেই সুরঙ্গ-পথে ভোরবেলা উজ্জইন বিক্রমেতে আসিয়া পৌঁছিল এবং তাহাকে তাহার স্বামী রাম হায়দারের হাতে সমর্পণ করিল। রাম হায়দারের দুইটি সন্তান হইল লথ

(Luth) ও কুশ। রাম হায়দারের স্ত্রীর কাহিনী অতি দীর্ঘ, কিন্তু সেই সুরঙ্গ-পথ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে।" —প্রাচীনকালে ভারতবাসী ও আরবদের মধ্যে যে বাণিজ্যিক সংযোগ ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপরের বৃত্তান্তে সিংহলে দশমুণ্ড রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ, বহু পরবর্তী যুগের বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে একাকার হইয়া গিয়াছে, এবং সীতা উদ্ধারের কাহিনীটিও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

শহর হইতে জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, জাহাজ নোঙ্গর তুলিয়া বন্দর ত্যাগের আয়োজন করিতেছে। এডেনের জন্য প্রেরিত মালসমূহ আগেই খালাস করা হইয়াছে, তোলা হইতেছে অধিকাংশই কফির চালান। আমাদের জাহাজের বার্জ-বোটসমূহে একটি স্টীমলঞ্চ আসিয়া ভিড়িয়াছে। তাহা হইতে কয়লা ও জল যথারীতি 'নেপাল'-এ তোলা হইল। যথাসময়ে নোঙ্গরের কাছে কর্মীরা যে যাহার স্থান গ্রহণ করিল। ক্যাপটেন জাহাজের ব্রিজে দাঁড়াইয়া হুকুম দিলেন—'হীভ আপ' উঠাও। সব কাজ নীরবে সমাধা হইল, তাড়াহুড়া নাই, ছুটোছুটি নাই, সবই শুধু কাজ, নিপুণ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হইল। একটি মুহূর্ত বাজে নষ্ট হইল না। জাহাজের এই কর্মশৃঙ্খলা, এই ডিসিপলিন দেখিয়া আমাদের অবাক লাগে। প্রত্যেকে তাহার কর্তব্য বিষয়ে পূর্ণ সচেতন, সবই তাহারা স্বতঃস্ফূর্ত তৎপরতার সঙ্গে করিয়া গেল। এই শিক্ষার জন্যই ঝড়ের সময় উত্তাল তরঙ্গমালা পর্বত সমান উঁচু হইলেও কোথাও লেশমাত্র ভুলভ্রান্তি বিশৃঙ্খলা ঘটে না।

আমরা ১৮ই মার্চের অপরাহ্নে এডেন ত্যাগ করিলাম। সেইদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা আরবদের বাব্-দরওয়াজা —বাবেল মাণ্ডেব প্রণালী অতিক্রম করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পেরিমের আলোক-স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম। এটি লোহিত সমুদ্রমধ্যস্থ ছোট্ট একটি দ্বীপ। দ্বীপটির অবস্থান লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যবর্তী স্থানে। এতকাল ইহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই, ইহা কোনও দেশ কর্তৃক অধিকৃত হয় নাই, স্থায়ীভাবে কেহ ইহাতে বাসও করে নাই। অবশেষে ১৮৫৭ সনে ইংরেজরা একটি আলোক-স্তম্ভ করে এবং অল্পসংখ্যক সৈন্য রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। পর্টুগীজ সমুদ্র অভিযাত্রী আবুকের্কে ১৫১৩ সনে এই দ্বীপে আসিয়াছিলেন, তিনি ইহার একটি পাহাড়ের চূড়ায় একটি ক্রস্ স্থাপন করিয়া যান। ১৭৯৯ সনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি অস্থায়ীভাবে দ্বীপটি দখল করে, এই সময়ে নেপোলিয়ন ঈজিপটের পথে ভারত আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। 'লেজ অভ ইণ্ড' (ভারত-গাথা) নামক কাহিনীতে ফরাসীরা যে এই দ্বীপটি দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, এইটি জানিতে পারিয়া ইংরেজরা দ্বীপটিকে স্থায়ীভাবে দখল করিয়া লয়। কথিত আছে একখানি ফবাসী যুদ্ধজাহাজ এই দ্বীপে ফরাসী পতাকা উড়াইবার গোপন নির্দেশসহ এডেনে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই জাহাজ এডেনে পৌঁছিলে তথাকার ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ফরাসী যুদ্ধজাহাজের অফিসারদিগকে সৌজন্যবিধি অনুযায়ী ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ডিনারের পরে যখন প্রচুর মদ্যপান আরম্ভ হইল তখন ফরাসী ক্যাপটেন ব্রিটিশ রেসিডেন্টকে গোপন কথাটি প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। একথা শুনিবামাত্র ব্রিটিশ রেসিডেন্ট

এডেন হইতে গান-বোট পাঠাইয়া পেরিম দ্বীপটিকে দখল করিয়া লইলেন। আমাদের লোহিত সাগর পার হইতে চারিদিন লাগিল। শুনিলাম মাত্রাতিরিক্ত গরমবশতঃ সমুদ্রপথের এই অংশটি যাত্রীদের পক্ষে সব সময়েই বিশেষ ক্লেশকর হইয়া থাকে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের যাইবার সময় উত্তর দিকের শীতল মৃদু হাওয়া বহিতেছিল, অতএব আমাদের বেশ আরামেই কয়টা দিন কাটিয়া গেল। যাইবার পথে আমরা অনেকগুলি পাথুরে দ্বীপ পার হইয়া গেলাম, ইহারা জলের উপরে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। একটা স্থানে এরকম সাতটি দ্বীপ আছে, নাবিকরা এই দ্বীপগুলির নাম দিয়েছে "সেভেন অ্যাপোসলস্" (খ্রীস্ট দূত)। লোহিত সাগরে অনেক শুশুক দেখা গেল, উহাদের স্ফূর্তির খেলায় আমরা বেশ আমোদ অনুভব করিতেছিলাম। দূর হইতে আমাদের দেখিয়া ছুটিয়া নিকটে চলিয়া আসে এবং আসিয়াই কত রকমভাবে খেলা করে! কখনও সাঁতার কাটে, কখনও লাফাইয়া শূন্যে উঠিয়া আবার ডুবিয়া যায়, কখনও ছুটাছুটি করে। এই সমুদ্রপথে যাইতে অনেক সময় তীরভূমি দেখা যায়, কখনও আফ্রিকার দিকের, কখনও আরবীয় দিকের। আফ্রিকার দিকের তীরভূমি প্রবাল গঠিত নিমজ্জিত পাহাড়ের সারিতে ভরা, জাহাজ চলার পক্ষে তাহা বিপজ্জনক। আরও একটুখানি ভিতরের দিকে সমুদ্রের সমান্তরালভাবে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত উঁচু পাহাড়ের সারি। এগুলি মাসাওয়া ও সুদান পর্বতমালা। আঠা ও রজনের উৎপত্তিস্থল। পূর্ব উপকূলও একই রকমের অসমান এবং এবড়ো-খেবড়ো। যতদূর দৃষ্টি যায়, উচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে জমি বহুভাগে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়গুলি দূর হইতে বড়ই শুষ্ক এবং রসহীন বলিয়া বোধ হয়। সুয়েজ খালের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই দুপাশে দুটি তীরভূমি নিকটবর্তী হইতেছে। সম্ভবতঃ এই স্থানেই বাইবেল-বর্ণিত মোজেস্-পীড়নকারী ফারাও-এর অধীন ঈজিপটের দুর্বৃত্ত দল কর্তৃক ইসরায়েলবাসীরা যখন তাড়িত হইতেছিল, তখন তাহাদের পথ নিরাপদ করিবার জন্য লোহিত সাগর শুকাইয়া গিয়াছিল। সুয়েজের দিকে অগ্রসর হইবার সময় আমাদের জাহাজ আফ্রিকার কূল ঘেঁষিয়া যাইতেছিল। আমরা ২৩শে তারিখে বেলা ১০টায় সুয়েজে আসিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে 'নেপাল' ভারতীয় ডাক ঈজিপটের রেল বিভাগে বিলি করিয়া দিল, সেখান হইতে উহা ব-দ্বীপ পারে আলেকজাণ্ড্রিয়ায় চলিয়া গেল। সেখানে পি অ্যাণ্ড ও কম্পানির আর একখানি জাহাজ সেই ডাক তুলিয়া লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেখান হইতে উহা ব্রিন্দিসি নামক ইটালির বন্দরে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখান হইতে রেলপথে পুনরায় উহা কালে বন্দরে, এবং কালে হইতে চ্যানেল পারে লণ্ডনে চলিয়া যাইবে। সুয়েজে আমরা জাহাজ হইতে নামি নাই, কারণ সময় খুব কম ছিল। ডাক বিলি হইবামাত্র আমরা যাত্রা করিয়া সুয়েজ খালে প্রবেশ করিলাম।

এই খালটি আধুনিক এনজিনিয়ারিং বিদ্যার একটি বৃহত্তম কৃতিত্ব। সুয়েজ যোজক নামক সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ডটি এশিয়া ও আফ্রিকাকে যুক্ত রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহা লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। অতএব যেসব জাহাজ পূর্ব এশিয়া হইতে ইউরোপে যাইত, তাহাদিগকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে হইত। সুয়েজ খালের পথে

কলিকাতা হইতে লণ্ডনের দূরত্ব ৭.৯৫০ মাইল, এবং উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ১১,৪৫০ মাইল। সুতরাং যোজক কাটিয়া দেওয়াতে ৩,৫০০ মাইলেব দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। প্রাচীনকাল হইতেই যোজক কাটিয়া পথ করিবার সুবিধার কথা চিন্তা করা হইযাছে, এবং কাটিবার জন্য নানারূপ চেষ্টাও হইয়াছে। প্রায় ২৫০০০ বৎসর আগে নাইল নদী হইতে লোহিত সমুদ্র পর্যন্ত একটি খাল কাটা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা পলিমাটিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, যদিও তাহার চিহ্ন এখনও বর্তমান। নেপোলিয়ন যখন ঈজিপ্‌টের প্রভু তখন তিনি একবার বড় জাহাজের পথ করিবার জন্য সুযেজ যোজক কাটিবাব উদ্দেশ্যে জমি জরিপ করাইয়াছিলেন, কিন্তু ফরাসীরা ওদেশ হইতে বিতাড়িত হওয়াতে সে পরিকল্পনা আর কাজে পরিণত হইতে পারে নাই। অবশেষে ডি লেসেপ্‌স্ নামক এক ফরাসী এনজিনিয়ার একাজ সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করিলেন এবং তাহার ফলে সমগ্র মানবজাতির অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, ইহাতে বাণিজ্যজগতে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়াছে। ওখানকার জমি বালিপ্রধান, আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে, যাহার জন্য সারা দেশটাই একটা মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে, এবং পানীয় জলের অভাব ছিল, এবং তাহার পরেও—লোহিতসাগর ও ভূমধ্যসাগরের জলতলের লেভেল অসমান। এই সব অসুবিধার ভিতর কাজ করিতে হইয়াছে। দুইয়ের মধ্যবর্তী কয়েকটি ছোট ছোট হ্রদ ছিল, ডি লেসেপ্‌স্ তাহার সুবিধা গ্রহণ কবিয়া সেগুলির সঙ্গে খাল যুক্ত করিয়াছেন। ঐ হ্রদের জল তিক্ত স্বাদের। তাই তিনি নাইল নদীর মিঠা জল পাইপের সাহায্যে আনাইয়া লইয়াছিলেন। খননের জন্য এবং জলের নিচের মাটি কাটিয়া তুলিবার জন্য নূতন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিলেন। এক কথায় অসীম ধৈর্য এবং বুদ্ধিকৌশলে তিনি সকল অসুবিধাই দূব করিয়াছিলেন। তিনি এমন গভীর ভাবে এই খালটি খনন করিলেন, যাহাতে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ ঐ খালের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। তবে ইহা দুইটি জাহাজ পাশাপাশি চলিবার মত প্রশস্ত নহে। সেজন্যে স্টেশনের স্থানে ইহা বেশি প্রশস্ত করা হইয়াছে। স্থলে যেমন সিংগ্‌ল্ রেল লাইন হয়, এই খালও সেই রীতিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয় আর একটি খাল ইহার পাশে কাটিয়া ডবল লাইন জাহাজপথ করিবার পরিকল্পনা করা হইতেছে। সুয়েজ খাল কাটিতে অনেক কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। ডি লেসেপ্‌স্ একজন দরিদ্র ফরাসী এনজিনিয়ার। তিনি নিজে ইহার জন্য কোনও টাকা দিতে পারেন নাই, সে ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না, তিনি টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন জয়েন্ট স্টক রীতিতে শেয়ার বিক্রয় করিয়া। বুদ্ধি, শিক্ষা, গঠন ক্ষমতা, সাহসিকতাপূর্ণ কর্মোদ্যম এবং কাজ আরম্ভ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহাতে লাগিয়া থাকা—এই গুণগুলি থাকিলে মানুষের অসাধ্য কিছুই থাকে না। যে সব ব্যক্তি সুয়েজ খাল কাটিবার মত কৃতিত্বের অধিকারী তাঁহাদের দ্বারা জাতির মুখ উজ্জ্বল হয়। জাতির মূল্য তাহার কৃতিত্বের দ্বারাই স্বীকৃত। এই কথাটা আমাদের অবশ্যই মনে রাখা উচিত। খালটিকে নৌবাহনের উপযুক্ত রাখিতে বেশ কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। কারণ আলগা বালি অবিরাম উপর হইতে পড়িয়া খালটি ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। কয়েকটি জায়গায়

ইহার পার্শ্বদেশে পাথরের গাঁথনি দিয়া রক্ষা করিতে হইতেছে। অন্য কয়েকটি স্থানে আবার শরগাছ ও সেজ্‌গাছ রোপণ করিয়া তাহাদের শিকড়ের সাহায্যে মাটিকে ভাঙনের হাত হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু তবু তলা হইতে মাটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য ড্রেজার যন্ত্রকে সর্বদাই কাজে খাটাইতে হয়। রাত্রিকালে জাহাজ চলাচল করিতে দেওয়া হয় না। সেজন্য খাল পার হইয়া যাইতে আমাদের দুইটি দিন লাগিয়াছিল। তাহার পর পোর্ট সৈদ, খালের শেষ প্রান্তে অবস্থিত। বর্তমানে বিদ্যুতের আলো সম্বলিত জাহাজকে রাত্রিতেও খাল পার হইতে দেওয়া হয়।

আমরা পোর্ট সৈদে জাহাজ হইতে নামিলাম, কিন্তু তখন সন্ধ্যাকাল, অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তাই বিশেষ কিছুই দেখা হইল না। কয়েকটি কফি-হাউস, থিয়েটার গৃহ ও জুয়া খেলার আড্ডা মাত্র দেখা গেল। যাবতীয় ইউরোপীয় সমাজের নিচের তলার ওঁছা লোকেরা এইখানে আসিয়া সমবেত হয়। এই কারণে পোর্ট সৈদ দুর্নীতির জন্য কুখ্যাত। ২৫শে মার্চ রাত্রিকালে আমরা পোর্ট সৈদ ছাড়িয়া ভূমধ্যসাগরে আসিয়া প্রবেশ করিলাম। ঈজিপ্টে অনেক নূতন যাত্রীর আগমন ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন বিশেষ মতবাদসম্পন্ন অ্যামেরিকান মিশনারি ছিলেন। জাহাজে এত বড় একদল উচ্চাঙ্গের ধর্মজ্ঞানহীন লোককে দেখিয়া খুশি হইয়া উঠিলেন। তিনি অবিলম্বে আমাদের মধ্যে তাঁহার মতে ভজাইবার জন্য কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। একেবারে গোড়া হইতে কাজ আরম্ভ করিলেন। প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝাইলেন। তাহার পর স্বর্গের বিদ্রোহ-কথা, এবং অ্যাডাম ও ঈভের জন্মবৃত্তান্ত, অর্থাৎ তাহাদের পতনকথা এবং তাহার ফলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইল সে কথা। আমরাও পালটা আমাদের জন্মবৃত্তান্ত শুনাইতে লাগিলাম। আমরা ব্রাহ্মণেরা স্রষ্টার মুখ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, ক্ষত্রিয়রা আসিয়াছে তাঁহার হাত হইতে, বৈশ্যগণ আসিয়াছে তাঁহার জানু হইতে এবং আমাদের চাষবৃত্তিধারীরা আসিয়াছে তাঁহার পাদদেশ হইতে। আমাদের শাস্ত্রে যাহা আছে তাহা শুনিয়া তিনি খুব হাসিলেন এবং বলিলেন, ও শাস্ত্র বিকৃত এবং মিথ্যা। বলিলেন, এরকম ছেলেমি গল্পে আমরা বিশ্বাস করি কি করিয়া। তিনি অতঃপর স্যাটান (শয়তান) সম্পর্কে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, স্যাটানের আনন্দ সে যেখানে বাস করে সেইখানে মানুষের আত্মাকে লইয়া যাওয়ার কাজে, এবং সে স্থানটি খুব আরামের নয়, সেকথাও তিনি বলিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস পৃথিবী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং সেজন্য তিনি আমাদের সেই মহা ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। এই সব মনোহর আলোচনা সহসা বাধাপ্রাপ্ত হইল। বাইরে হাওয়ার বেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, আবহাওয়া অস্বস্তিকর, উত্তাল তরঙ্গ জাহাজের গায়ে আঘাত হানিতেছে, জাহাজ বেশি রকম দুলিতেছে এবং সমস্ত ডেকখানাই শীকরসিক্ত হইতেছে। মিশনারি ও তাঁহার শ্রোতাগণ— সবারই পেটের ভিতর মোচড় দিয়া উঠিল। অধিকাংশ যাত্রী এইবার সামুদ্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হইল, আমি কিন্তু রক্ষা পাইয়া গেলাম, অতএব অন্যেরা এই পীড়ার দরুণ কি রকম বোধ করিয়াছিল তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।

২৮ শে মার্চ রবিবার মলটা দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর ভালেট্টা বন্দরে প্রবেশ করিলাম; মল্টা ভূমধ্যসাগরস্থ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত স্থান। আফ্রিকা হইতে ইহার দূরত্ব ১৭৯ মাইল, ও সিসিলি হইতে ৫৮ মাইল। পরিষ্কার সকাল, আমরা মাউন্ট এটনার চূড়া দেখিতে পাইতেছিলাম, অথচ তাহার দূরত্ব ছিল ১২৮ মাইল। আমরা ভালেট্টার গভর্মেন্ট হাউস ও অন্যান্য দর্শনীয় বস্তু দেখিতে বাহির হইলাম। প্রথমোক্তটি শ্বেত মর্মরের প্রশস্ত সিঁড়ি সম্বলিত বৃহৎ সৌধ। ইহার একটি কক্ষে আমরা কারুকার্য-খচিত মূল্যবান পর্দার বহু নমুনা দেখিতে পাইলাম। এগুলি পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত এবং দুইশত বৎসরের পুরাতন। গভর্মেন্ট হাউসের সংলগ্ন একটি অস্ত্রাগার আছে। সেন্ট জনের নাইটগণ মুসলমানদের সঙ্গে সর্বদা লড়াই করিত। সেই সময় যে অস্ত্র তাহারা ব্যবহার করিত, তাহাও সযত্নে রক্ষা করা হইয়াছে। দুইটি দলিলও অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি ঘোষণাপত্র, যাহার সাহায্যে সাত শত বৎসর পূর্বে জেরুসালেমের সেন্ট জনের 'অর্ডার অভ দি নাইটস' গঠন করা হয়। অন্যটি একটি চুক্তিপত্র। ইহার তারিখ ৪ঠা মার্চ ১৫৩০। ইহার সাহায্যে সম্রাট পঞ্চম চার্লস, রোড্স্ হইতে তুর্কীগণ কর্তৃক বিতাড়িত বীর নাইটদিগকে মলটার দ্বীপসমূহ দান করিয়াছিলেন। সেন্ট জন ক্যাথীড্রালও দেখা হইল, সেখানে মূল্যবান অনেক কারুকার্যখচিত মর্মর প্রস্তরের নমুনা এবং ব্রাসেলস-এ প্রস্তুত পরদার নমুনা সংগৃহীত আছে। এখান হইতে আমরা নাইটদের হাসপাতাল দেখিতে গেলাম। বেশ বৃহৎ অট্টালিকা এটি, ইহার একটি কক্ষ পাঁচ শত ফুটের অধিক দীর্ঘ, অথচ তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য কোনও কড়িকাঠ অথবা কেন্দ্রে স্তম্ভ নাই। একটি গীর্জায় ভূগর্ভস্থ খিলান গৃহের এক দেয়ালের খোপে মংক বা কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীদের শুষ্ক মৃতদেহ রক্ষিত আছে দেখিলাম। মোটের উপর মল্টা—অতীত ইতিহাসের দিক্ হইতেই হউক, অথবা ইংল্যাণ্ড ও ভারতের প্রধান পথের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ আউটপোস্ট রূপে ইহার বর্তমান অবস্থানের দিক্ হইতে হউক— খুবই আকর্ষক বলিতে হইবে। নাইটদের নির্মিত ইহার দুর্গসমূহ এখন বৃটিশ সরকার কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে। এগুলি সম্পূর্ণরূপে দুর্ভেদ্য দুর্গ। কয়েকজন নাইটের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ভালেট্টা নেপোলিয়নের দখলে আসিলে কাফফারেল্লি নেপোলিয়নকে বলিয়াছিলেন, "জেনারেল (নেপোলিয়ন তখন জেনারেল ছিলেন), ভিতর হইতে কেহ যদি দুর্গের দরজা খুলিয়া দেয়, তবেই আমরা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব। আর দুর্গটি যদি সম্পূর্ণ শূন্য থাকে তবে আমরা বাহির হইতে সহজে প্রবেশ করিতে পারিব না।" মলটাবাসীরা খুব শক্ত সমর্থ, সাহসী এবং ঝোঁকের মাথায় কাজ করায় অভ্যস্ত। ছোরা মারার দিকে এদের কিছু আকর্ষণ আছে। ইহারা গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক। স্ত্রীলোকদের অবয়ব সুন্দর এবং চোখ কালো। ইহাদের ভাষায় শতকরা ৭৫ ভাগ আরবী শব্দ আছে, তাহাতে মনে হয় ইহাদের পূর্বপুরুষ আরব হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু পক্ষান্তরে একটি লোকেরও আরবদের মত ডিম্বাকৃতি মুখ দেখা যায় না। মলটা এমনই একটি পাথরের ছোট্ট দ্বীপ যে, এখানে যে জমিতে চাষ হয় সেখানকার মাটি সিসিলি দ্বীপ হইতে আমদানি করিতে হইয়াছে। যাহাই

হউক পাথরের ফাঁকে ফাঁকে যেখানে যেটুকু মাটি পাওয়া গিয়াছে সেখানেই তাহার সদ্ব্যবহার করা হইয়াছে। এবং তাহার ফলে সেখানে শস্য এবং ফলের গাছ জন্মান সহজ হইয়াছে, মলটার কমলালেবু সমগ্র ইউরোপে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

সেইদিনই সন্ধ্যায় আমরা মলটা ত্যাগ করিলাম। আমাদের জাহাজের মুখ এখন জিব্রলটারের দিকে, সেইখানে আমাদের দ্বিতীয় বিরাম। আবহাওয়া শান্ত, জল যেন কাঁচের একটি আবরণ। সামুদ্রিক পীড়ার হাত হইতে আক্রান্তগণ এত দিনে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে মিশনারিটিও তাঁহার ধর্মে দীক্ষার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন।

খ্রীস্টান ধর্মের স্বপক্ষে তাঁহার যুক্তির উত্তরে আমাদের ভিতর হইতে এক বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন, খ্রীস্টান না হইলে লোকে সৎ হইতে পারে না, আপনার ধারণা ভুল। সব খ্রীস্টান সৎ নহে, সব হিন্দু অসৎ নহে। আর শুধু তাহাই নহে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির তুলনায় হিন্দুরা জাতি হিসাবে বেশি শান্তিপ্রিয়, বেশি করুণাবান্ এবং বেশি ধর্মভীরু। এখন সৎ হিন্দুর খ্রীস্টান হওয়ার অপেক্ষা অসৎ খ্রীস্টানের সৎ হওয়া বেশি দরকার। খ্রীস্টান ধর্ম 'প্রতিবেশীকে ভালবাস' এই শিক্ষা দেয়, আর হিন্দুধর্ম বলে সবাইকেই, সকল প্রাণীকেই আত্মবৎ মান্য কর। হিন্দু ধর্মে পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা দিয়াছে এই—"সৎ কাজ করা পুণ্য, অসৎ কাজ করা পাপ"। কিন্তু মোটের উপর দেখিতে গেলে দেখা যায়, খ্রীস্টানরাও খ্রীস্ট ধর্মের সকল বিধি মানে না, হিন্দুরাও তাহাদের স্বধর্ম অনুসরণ করে না। এ বিষয়ে অবশ্য অপরাধের পাল্লাটা হিন্দুদের দিকেই বেশি ভারী। হিন্দু ধর্মে এত দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে যাহাতে বাহিরের কেহ যদি হিন্দুদের সব যুক্তিহীন এবং হাস্যকর আচরণ দেখে, তাহা হইলে সে যে আহত হইবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, বিধবাদাহ এবং শিশু হত্যা ভারতীয়দের একটি চিরস্থায়ী লজ্জা বলা যাইতে পারে। এবং একথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সব নিষ্ঠুর প্রথা খ্রীস্টিয়ান ধর্মের জন্যই—অথবা খ্রীস্ট ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের উদার নীতির জন্যই রহিত হইতে পারিয়াছে। একজন ব্রাহ্মণকে আধা-দেবতা রূপে মান্য করা হয়— কিন্তু তাহা তাহার পবিত্রতা অথবা দেবত্বের জন্য নহে, সে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মিয়াছে বলিয়া। মোটের উপর কতকগুলি বিশেষ খাদ্য না খাওয়াকেই এখন ধর্মপালন রূপে গণ্য করা হইয়া থাকে। চুরি, মিথ্যাভাষণ এবং নরহত্যার চেয়েও নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ জঘন্যতর অপরাধ। এই সব পাপানুষ্ঠানে হিন্দু জাতিচ্যুত হয় না, কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে হয়। নীচ জাতীয় কোনও ব্যক্তিকে হত্যা করা অপেক্ষা গোহত্যা বড় পাপ। ভারতীয়দের অনেক সদ্গুণকেও মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া এমন আকার দেওয়া হইয়াছে যাহাতে এখন তাহা পাপরূপে গণ্য। সকল জীবের প্রতি করুণাপরায়ণ হইবার শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। অতএব তাহারা অভাবগ্রস্ত লোককে ভাড়া করিয়া আনিয়া ছারপোকা জাতীয় কীট দ্বারা তাহার রক্ত পান করায়। ইহাই যদি হিন্দু ধর্মের প্রথা হয় তাহা হইলে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাদের খ্রীস্টান অথবা মুসলমান হইয়া যাওয়া উচিত। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা শক্ত যে, প্রাচীন ভারতের প্রাজ্ঞগণ, তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ও

বিদ্যা লইয়া বর্তমানের আচরিত নীতি তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ কর্তৃক পালিত হইবে, এমন ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বন্ধু বলিতে লাগিলেন, "মহাশয়, আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দ্বারা এদেশে যাহাদের মন মুক্ত, তাহারা এইসব প্রথা নিশ্চয়ই পালন করে না। উত্তরে বলি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা সত্য নহে। আমাদের সমাজের গঠন এমন যে তাহা করা সহজ নহে। ইহার জন্য যে বৃহৎ ত্যাগ ও মনোবল দরকার তাহা আমাদের দেশের জনসাধারণের নাই। অন্তরে অন্তরে যাহা করণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা সাহসের অভাবে করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত যাবতীয় কুপ্রথারই তাহার সমর্থক হইয়া পড়ে। অনুমান করে, এই সব প্রথা পালন এবং তাহার সমর্থনই দেশপ্রেম। অতঃপর নিজেদের এবং নিজেদের অপেক্ষা অল্পশিক্ষিতদের চিন্তাধারাকে বিভ্রান্ত এবং প্রতারিত করিবার জন্য এ সবের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করে।"

আমরা এক্ষণে আফ্রিকার উপকূল ঘেঁষিয়া চলিতেছি। জাহাজে একজন অনেকদিনের অস্ত্রাগার রক্ষক ছিল, সে বাল্যকাল হইতে এ পথে বহুবার যাতায়াত করিয়াছে। সে আমাদের ট্রিপোলি, টিউনিস, মরোক্কো উপকূলের বিশেষ বিশেষ স্থলচিহ্নগুলি চিনাইয়া দিতে লাগিল। পৃথিবীর সকল অংশে ধর্মের নামে কত নিষ্ঠুর কাজই না লোকে করিয়াছে! সম্ভবত মাউন্ট আরারাট ও পিলার্স অভ হারকিউলিস পর্যন্ত যতগুলি দেশ ও সমুদ্র আছে সেই সব দেশে ধর্মের নামে লুণ্ঠন, নৃশংসতা, হত্যা ইত্যাদি যত সংঘটিত হইয়াছে এমন আর পৃথিবীর কোনও অংশে হয় নাই। ক্রুসেডের পরে (ক্রুসেড—ক্রসচিহ্নিত পতাকার আশ্রয়ে তুরস্কের কাছ হইতে খ্রীস্টানদের পবিত্র ভূমি কাড়িয়া লইবার সামরিক অভিযান) মলটার নাইটগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মহম্মদের অনুগামীদের দেখিলেই তাহাদের হত্যা করিয়া নির্মূল করিয়াছে। এটি হইল ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের ঘটনা। অপর পক্ষে পশ্চিম টিউনিসের, ট্রিপোলির এবং মরোক্কোর মূয়ারগণও তিনশত বৎসর ধরিয়া তাহাদের অপরাজেয় দস্যুজাহাজগুলির সাহায্যে তাহাদের ধর্মীয় তৎপরতা প্রমাণের জন্য হাজার হাজার খ্রীস্টানকে দাস বানাইয়াছে, তাহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে। হতভাগ্য শেখ সাদী তাঁহার গুলিস্তানে লিখিয়া গিয়াছেন— প্যালেস্টাইনের পাহাড়ে একটি নির্জন স্থানে তিনি নমাজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় খ্রীস্টানেরা তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ট্রিপোলির হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করিয়া দিল। ঐ একই পদ্ধতিতে মূয়ার জলদস্যুরা জাহাজ আটক করিয়া প্রতি বৎসর হাজার হাজার খ্রীস্টানকে ধরিয়া লইয়া উত্তর আফ্রিকার বাজারে কেনাবেচা করিয়াছে।

৩১শে মার্চ বুধবার সকালে স্পেনের পর্বতশ্রেণীর তুষারবৃত চূড়া দেখা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গোটা অন্তরীপ পার হইয়া আসিলাম এবং সমস্ত দিন ধরিয়া স্পেনের উপকূল বরাবর চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাবেলা আসিয়া পৌঁছিলাম জিব্রলটারে। জাহাজ নোঙর ফেলিল বিখ্যাত দুর্গের সম্মুখে। এখানে যখন পৌঁছিলাম তখন আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল এবং বৃষ্টি পড়িতেছিল তাই আমরা বাহির হইতে পারিলাম না। কিন্তু পরদিন সকালে আমরা ডেক হইতে, ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের চাবিকাঠি স্বরূপ এই জিব্রলটারের ক্ষমতাসীন

অবস্থানটি দেখিতে পাইলাম। ইহার দুর্গের ফটকেও একটি চাবি ঝুলিতেছে। খাড়া পাহাড়ের উপর দুর্গটি নির্মিত। এই পাহাড় ও ইহার বিপরীত আবীলা নামক আফ্রিকার পাহাড়কে প্রাচীনকালে পিলার্স অভ হারকিউলিস বলা হইত। ভূমধ্যসাগর অ্যাটলান্টিকের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ জিব্রলটার প্রণালীর দুই বিপরীত দিকে এই দুই পাহাড় স্তম্ভের মতই অবস্থান করিতেছে। জিব্রলটার প্রায় একটি দ্বীপের মত। মূল স্পেন ভূখণ্ডের সঙ্গে ইহা সংকীর্ণ বালুকাময় জমির দ্বারা যুক্ত। মনে হয় পূর্বে কোনও কালে এই অংশ জলে ঢাকা ছিল। প্রকৃতি হইতেই জিব্রলটারকে কঠিন করিয়া গড়া হইয়াছে, তদুপরি বর্তমান উন্নত সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ইহাকে দুর্ভেদ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। ১৭০৪ সনে ইংলিশ ও ডাচ নৌবহরের মিলিত আক্রমণে স্থানটি স্পেনের হস্তচ্যুত হয়। সেই সময় হইতে এটি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়া আছে, যদিও মাঝে বলপ্রয়োগে অথবা কৌশলপ্রয়োগে ইহাকে পুনর্দখল করিবার চেষ্টা হইয়াছে। একবার ব্রিটিশরা এখানে যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল, সেই সময়ে স্পেনের এক রাণী এইরূপ শপথ গ্রহণ করেন যে, যতদিন ঐ স্থানে ব্রিটিশ পতাকা উড্ডীন থাকিবে, ততদিন তিনি অন্নজল গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু তাঁহার এই শপথ পালনের যোগ্য ছিল না। দুর্গের উপর বারংবার নিষ্ফল আক্রমণ করিয়া হাজার হাজার স্পেনীয় যোদ্ধা বৃথাই জীবন হারাইল। ব্রিটিশ পতাকা তবু উড্ডীন রহিল। অবশেষে ব্রিটিশ শাসক রাণীর প্রতি করুণাবশতঃ পতাকাটি নামাইয়া লইলেন, যাহাতে তিনি অনশন ভঙ্গ করিয়া শপথ ভঙ্গের দায় হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। ১৭৭৯ হইতে ১৭৮৩ সন পর্যন্ত এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া জিব্রলটারের অবরোধ সময়ে ফরাসী ও স্পেনীয়গণ একযোগে এখানকার দুর্গ আক্রমণ করিতেছিল। যে জাহাজ হইতে তাহারা গোলাবর্ষণ করিতেছিল তাহার পার্শ্বদেশ পুরু করিয়া খড়ের গদিতে আবৃত রাখা হইয়াছিল যাহাতে প্রতিপক্ষের গোলা আসিয়া জাহাজের পার্শ্বভেদ না করিতে পারে। চারিশত অতি ভারী ওজনের কামান এই দুর্গের উপর আক্রমণ চালাইতেছিল। ইংরেজ সেনাবাহিনী বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। শাসনকর্তা বুঝিতে পারিতেছিলেন না, কেমন করিয়া এইসব গদি আঁটা জাহাজগুলিকে ধ্বংস অথবা বিতাড়িত করা যাইতে পারে। শোনা যায় এক মাতাল সৈন্য বলিয়াছিল, জ্বলন্ত গোলা কামানে পুরিয়া শত্রুকে ঘায়েল কর। শাসনকর্তা এ প্রস্তাব পছন্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ কামানগুলিতে আগুন-রাঙা গোলা পুরিয়া শত্রু জাহাজগুলিতে নিক্ষেপের ব্যবস্থা করিলেন। সেই অতি তপ্ত গোলাগুলি খড়ের গদিতে গিয়া যুদ্ধ জাহাজগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বহু জাহাজ পুড়িয়া গেল, কিন্তু সমগ্র নৌবাহিনী তখনও ধ্বংস হয় নাই। তারপর যখন এইরূপ গোলা চারি হাজারেরও অধিক নিক্ষিপ্ত হইল, তখন সব শেষ হইয়া গেল। দুর্গের দৃঢ়তা কতখানি তাহা বুঝিতে পারা যায় উভয়পক্ষের হতাহতের সংখ্যা দেখিয়া। এই গোলা বিনিময়ে শত্রুপক্ষের ২০০০ এর উপরে লোকক্ষয় হইয়াছিল, ব্রিটিশপক্ষে হত ১৬ জন এবং আহত ৬৮ জন। ক্ষয়ক্ষতির এই অসমতার আরও কারণ দুর্গের কামানসমূহ পাহাড়ের গায়ে বহু সুরঙ্গ কাটিয়া সেইসব সুরঙ্গের মধ্যে

স্থাপন করা হইয়াছিল। আমরা সেই সুরঙ্গগুলি হইতে কামানসমূহের মুখ একটুখানি করিয়া বাহির হইয়া আছে তাহা অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছিলাম। ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী জিব্রলটার প্রণালী দৈর্ঘ্যে ১২ লীগ (১ লীগ = ৩ মাইল), এবং প্রস্থে পশ্চিম দিকে ৮ লীগ ও পূর্বদিকে ৫ লীগ।

১লা এপ্রিল তারিখে আমরা জিব্রলটার প্রণালী পার হইয়া অ্যাটলান্টিক মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিলাম। আকাশ পরিষ্কার, সূর্যালোক উজ্জ্বল; তাই আমরা জলের মহাবিস্তার স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলাম। মনে পড়িল, মাত্র চারিশত বৎসর পূর্বে এই মহাসমুদ্রকে পৃথিবীর শেষ সীমা মনে করা হইত। এবং সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসী নাবিকও এই মহাসমুদ্রে অভিযান চালাইতে সাহসী হইত না। কিন্তু তাহার পর হইতে জগতে কি পরিবর্তনটাই না ঘটিয়া গেল। সভ্য মানুষ এখন পৃথিবীর সকল অংশে তাহার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। এক-ঠ্যাংওয়ালা মানুষের এবং লম্বা কানওয়ালা মানুষের জাতির লুপ্তি ঘটিযাছে। এই মানুষেরা এক কান পাতিয়া শুইত আর এক কানে গা ঢাকিত। কিন্তু এই মহাসাগরের পরে যে অজানা মহাদেশ ছিল, তাহাতে যে পরিমাণ আশ্চর্যজনক সব পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এমন আর কোথাও ঘটে নাই। চারিশত বৎসর পূর্বে যেখানে নিরেট ঘন অবণ্যের পথে পাইন গাছের পাতায় পাতায় শব্দ জাগাইয়া সান্ধ্য বায়ু প্রবাহিত হইতে বাধা পাইত, সেইখানে এখন বড় বড় শহর সৌধসমূহ স্বর্গের দিকে উচ্চ শির তুলিতেছে। শক্তিশালী রেল-এনজিন, আগের দিনের বাইসন এবং হরিণেরা যেখানে মধ্যাহ্ন ভোজনে পরিতৃপ্ত মনে অর্ধনিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় শুইয়া শুইয়া জাবর কাটিত, সেইখানে এখন রাজকীয় বিলাস-পূর্ণ দরবার গৃহতুল্য কক্ষসমূহ নিম্নভূমিতে এবং পাহাড় পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। সেখানে মাটি এবং জল হইতে এখন কোটি কোটি মানুষের আহার, বস্ত্র ও বিলাসিতার উপকরণ আহরিত হইতেছে, অথচ সেই একই স্থানে পূর্বে অল্পসংখ্যক আরণ্যক মানুষ শিকার করিয়া বা মাছ ধরিয়া কোনওরকমে বিপজ্জনক জীবন কাটাইত। যে মানুষ প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের সদ্ব্যবহার জানে, প্রাচুর্য তাহার ভোগে আছে। যাহারা তাহা জানে না, তাহাদের উচিত সেইসব মানুষকেই স্থান ছাড়িয়া দেওয়া, যাহারা তাহা জানে। অ্যামেরিকায় এবং অস্ট্রেলিয়ায় তাহাই হইয়াছে বর্মাতেও তাহাই হইবে, এবং পৃথিবীর অন্য সব স্থানেও তাহাই হইবে।

আবহাওয়া শান্ত ছিল, তথাপি পশ্চিম দিক্ হইতে বড় বড় ঢেউ আসিয়া জাহাজের পাশে আঘাত করিতে লাগিল, আর তাহার ফলে জাহাজটি বেজায় রকম দুলিতে লাগিল। প্রত্যেকটি দোলাতে জাহাজের একটা ধার কাত হইয়া পড়িতেছিল এবং ডেক ঘিরিয়া যে উচ্চ বেষ্টনী থাকে জল প্রায় তাহা স্পর্শ করিতেছিল। তখন ডেকে হাঁটিয়া বেড়ান অসম্ভব, বসিয়াও স্বস্তি ছিল না, কারণ জাহাজ যখন তাহার একটি পাশের উপর ভর করিয়া কাত হইতেছিল, তখন আমাদের সমুদ্রে পড়িয়া যাইবার ভয় ছিল। বিছানায় শুইলে সেখান হইতে গড়াইয়া যাইবার ভয়। টেবিলে প্লেট, ডিশ প্রভৃতি কাঠের একজাতীয় ফ্রেমে আটকান ছিল, অন্যথা সেগুলি নিচে পড়িয়া চূর্ণ হইত। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন শান্ত

আবহাওয়াতেই এই, ঝড় উঠিলে জাহাজের কি অবস্থা হয়? আর একজন উত্তরে বলিলেন, তেমন অবস্থায় জাহাজ তাহার অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতে থাকে। উপকূলের কাছে এমন অবস্থা হইলেও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের এই অংশে জাহাজ চলাচল, বিশেষ করিয়া ইউরোপ ও অ্যামেরিকার মধ্যবর্তী পথে সব সময়েই সহজ এবং নিরাপদ থাকিয়াছে। স্থলভাগ হইতে কিছু দূরে ট্রেড উইণ্ড বা অয়ন বায়ু সমভাবে বহিয়া থাকে। গ্রীষ্ম অঞ্চলের সমুদ্রে যেমন সাধারণত ঝড়ের আবহাওয়ার দেখা মেলে এখানে সেরকম নহে। পূর্বদিনের পাল তোলা জাহাজে ভ্রমণের তুলনা করা হইত ধীরস্রোতা নদীপথে চলার সঙ্গে। স্পেনবাসীরা খুব উচ্চকণ্ঠেই এই সমুদ্রের সদয় ব্যবহারের গুণগান করে, কারণ এই সমুদ্রই তাহাদের হঠাৎ একদিন বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে তুলিয়া দিয়াছিল, ইহারই জন্য তাহাদের শক্তি সম্পদ্ এবং খ্যাতিলাভ হইয়াছে। তাহারা ইহার নাম দিয়াছে "লেডীজ সী" — মহিলাদের সমুদ্র, কারণ এখানকার মন্দ বায়ু ইহার বুকে যে মনোহর চপল তরঙ্গ জাগায় তাহাতে সমুদ্রপারের এল ডোরাডোতে, অর্থাৎ স্পেনের অ্যামেরিকা বিজয়ীদের কাল্পনিক স্বর্ণভূমিতে, যাইবার জন্য অবলাদেরও মনে যথেষ্ট সাহস জাগে। হায়! Golfo de las damas! হায় মহিলাদের সমুদ্র! এককালে স্পেনবাসীদের মনে কি মাদকতাই না জাগাইয়াছিল। আর আজ কি অধঃপতন! ভয়ের সমুদ্র বে অভ বিস্‌কেতে যখন প্রবেশ করিলাম তখন সমুদ্র শান্ত ছিল। এই উপসাগরটি যে কিরকম অস্থির এবং উদ্দাম সে বিষয়ে অনেক বৃত্তান্ত শুনিলাম। কিন্তু আমরা বেশ আরামেই এটি পার হইয়া গেলাম। বে অভ বিস্‌কেতে আমরা একটি তিমি দেখিলাম, সে তাহার নাক দিয়া ফোয়ারা উড়াইতেছিল। ইহা ভিন্ন কয়েকটি হাঙরও আমাদের জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর আসিয়াছিল। ৫ই এপ্রিল ভোরবেলা আমরা এডিস্টোন আলোকস্তম্ভ ছাড়াইয়া গেলাম। এটি সমুদ্রের মাঝখানে নির্মিত। ইহার পরেই আমরা প্লিমাথ বন্দরে গিয়া পৌঁছিলাম। এটি ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত। এইখানে আমাদের জাহাজ কয়েক ঘন্টা কাটাইয়া মলটা ও জিব্রলটার হইতে প্রেরিত ডাক খালাস করিল। অনেক যাত্রী রেলপথে লণ্ডন যাইবার জন্য এইখানে নামিয়া গেল। আমরা জাহাজেই রহিলাম। জাহাজে প্লিমাথ হইতে লণ্ডন চব্বিশ ঘন্টার পথ। ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূল বরাবর আমরা চলিতে লাগিলাম। ভারত সমুদ্রে অথবা লোহিতসাগরে আমরা অন্য জাহাজ কমই দেখিয়াছি। ভূমধ্যসাগরে এবং অ্যাটলান্টিকে জাহাজের সংখ্যা অনেক বাড়িল, কিন্তু ইংলিশ চ্যানেলে দেখিলাম অসংখ্য জাহাজ চারিদিকে যাতায়াত করিতেছে, আমরা এখানে বাণিজ্যের বড় সড়কে উপস্থিত। ৬ই এপ্রিল সকালবেলা আমরা টেম্‌স নদীর মুখে আসিয়া পড়িলাম। গ্রেভস্ এণ্ড টিলবেরি ছাড়াইয়া গেলাম এবং দ্বিপ্রহরে লণ্ডনের নিকটস্থ অ্যালবার্ট ডকে আসিয়া পৌঁছিলাম।

২

অপরাহ্ন একটার সময় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করিলাম। সেই সময়ে বহুরকম ভাবাবেগে আমার হৃৎপিণ্ড ভীষণভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে ইংল্যাণ্ডের কথা শিশুকাল হইতে পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এবং সেই ইংরেজ জাতি, যাহার সঙ্গে বিধাতার অভিপ্রায়ে আমরা মিলিত হইয়াছি, আমি এখন সেই ইংল্যাণ্ড এবং সেই ইংরেজদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। আমি যে ইংরেজদের স্বপরিবেশে আসিয়া দেখিতে পাইব, এবং যে সব গুণের জন্য বর্তমানে তাহারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে গণ্য হইয়াছে, তাহা তাহাদের নিকটে আসিয়া বুঝিবার সুযোগ পাইলাম, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিতেছি যে, এইক্ষণে সম্ভবতঃ আমি আমার স্বদেশে জাতিচ্যুত হইয়াছি। যে পুরাতন পল্লীগ্রামে (২৪ পরগণার শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে) আমাদের বংশ চারিশত বৎসর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে, যেখানে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি (১২৫৪ সালে, ইং ১৮৪৭), যেখানে আমার শৈশব কাটিয়াছে, সে স্থানকে আমি আর আমার বলিয়া মনে করিতে পারিব না। সেই আমার জানালার দিকে চাওয়া বেঁটেখাটো পুরাতন আম গাছটি, যাহাব দিকে তাকাইলেই যেন আমাকে বলিত, "আমি তোমার পিতাকে এখানে জন্মিতে ও মরিতে দেখিয়াছি, আমি তোমার পিতামহকে দেখিয়াছি। আমি এখানে তোমার সাতপুরুষের জন্মমৃত্যু দেখিয়াছি" — সেই গাছ তাহার ছায়ায় আমাকে আর দেখিতে না পাইয়া সম্ভবতঃ দুঃখবোধ করিবে। পরিবারের জ্যেষ্ঠগণ, যাঁহাদের কোলেপিঠে মানুষ হইলাম, তাঁহারা এক্ষণে আমাকে অপবিত্র বলিয়া দূরে পরিহার করিবেন। কিন্তু আমার নিজের জন্য আমি দুঃখিত নহি, যাহাদের সঙ্গে আমার ভাগ্য একত্রে জড়িত, তাহাদের জন্যও আমার দুঃখ নাই। আমি আমার দেশবাসীর অযৌক্তিক সংস্কারের জন্য দুঃখিত। যে বিশ্বাস আন্তরিক, তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা থাকিলেও আমি নৈতিক ভীরুতা এবং অসৎ বিরোধিতাকে ঘৃণা না করিয়া পারি না; যাঁহারা হিন্দুর বিলাত যাওয়ার বিরোধী, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত সমাজে তাঁহারা খুব উচ্চস্থানীয়। এবং তাঁহারা স্বদেশে রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের সকল বিধিবিধান পদদলিত করিয়া থাকেন, অপেক্ষাকৃত অল্প অগ্রসর প্রদেশে—বম্বাইতে, পাঞ্জাবে, রাজপুতানায় এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে এই ক্ষতিকর কুসংস্কার ইতিমধ্যেই দূর হইয়াছে। বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিলে যুবকদের জাতিচ্যুত করার অনিষ্টকর প্রথা একমাত্র অধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত বঙ্গদেশেই আছে। আমরা এক শতাব্দী কাল ইংরেজের শিক্ষা লাভ করিতেছি, ইহাতেও যদি আমাদের মত ক্ষয়প্রাপ্ত জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য বিদেশ ভ্রমণ যে কত বেশি দরকার এই প্রাথমিক সত্যটি আমরা না শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে এই চরম অনুকূল অবস্থাতেও আমাদের প্রগতিপথের

এই মন্থর গতির জন্য দেশের ইংরেজ শাসকেরা দুঃখ বোধ না করিয়া পারেন না। আমি বৈষয়িক কোনও সুবিধালাভের জন্য এখানে আসি নাই। কুসংস্কারের বিপরীত যে স্রোত এখন বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই স্রোতে আমি এক বিন্দু জল যুক্ত করিব ইহাই আমার অভিপ্রায়। প্রকৃতির অমোঘ বিধান এই স্রোতের অনুকূলে। প্রতিদিন ইহার শক্তি বাড়িতেছে। এবং সে সময় অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, যখন বর্তমানের যাঁহারা স্রোতের মুখ ঘুরাইয়া দিতে চাহিতেছেন তাঁহাদের অবস্থা, অসহায় বিধবাদের যাঁহারা স্বামীর চিতায় পুড়াইয়া মারিতেন তাঁহারা এখন হিন্দুসমাজের চোখে যেমন, তেমনি ঘৃণ্য হইবে।

আমরা জাহাজ হইতে নাবিবামাত্র আমাদিগকে তত্ত্বাবধানের জন্য যে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার হেপাজতে চলিয়া গেলাম। তিনি খুবই চতুর এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি। অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মালপত্র শুল্ক অফিস পার হইয়া আসিল, এবং আমরা রেলগাড়িতে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হইলাম। লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে আসিতে আমাদের আধঘন্টা লাগিল। এখানে ব্লুমসবেরিতে অবস্থিত "মিউজীয়াম হোটেল" অভিমুখে যাইবার জন্য ঘোড়াটানা ক্যাব লইলাম। লণ্ডন পার হইবার সময় সবদিকের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। প্রত্যেকটি জিনিস ঝকঝকে তকতকে—পথ বাড়ি দোকান—সব। পথে কোথাও দুর্গন্ধ নাই, কোথাও জঞ্জাল জমে নাই। দোকানের কাঁচের জানালাগুলি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার স্বচ্ছ। কাঠ বা পিতল এবং লোহা, দোকান বা বাড়ি তৈরিতে যাহা কিছু লাগিয়াছে, সবই ঘষামাজার গুণে আয়নার মত উজ্জ্বল দেখাইতেছে। দরজার সিঁড়িগুলি পর্যন্ত নিয়মিত সাবান জলে ধোয়ার ফলে চকচক করিতেছে। দোকানের ভিতরের জিনিসগুলি সুরুচিসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত, এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্থানে রক্ষিত। লণ্ডন কি রকম, তাহা কলিকাতার এসপ্লানেড অঞ্চল দেখিলে আংশিক অনুমান করা যাইবে। সভ্য দেশের নগর কিরূপ হওয়া উচিত এসপ্লানেড দেখিলে তাহারও কিছু পরিচয় মিলিবে। সাধারণ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের নিকট হইতে আমাদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। আমাদের ধর্মের বিধানসমূহে অনেক দিক হইতেই হিন্দুদিগকে পৃথিবীর পরিচ্ছন্নতম জাতিদের অন্যতম রূপে গড়িয়া তুলিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু আমরা এ বিষয়ে বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতও সে সব বিধি সব সময়ে নহে। সে সব বিধিবিধানের উপর ধর্মের আবরণ পড়াতে তাহার বাস্তব রূপটি আমরা দেখি না, তাহা দেখিতে পাইলে আমরা সে সব নিয়মকে বেশী শ্রদ্ধা করিতে পারিতাম। খুব অল্পদিন হইল আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ধূলা, নোংরা জিনিস বা অস্বাস্থ্যকর জল হইতে বিপজ্জনক সব ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই জানা বুদ্ধির দিক হইতে জানা। হাতেকলমে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, পবিত্রতম শাস্ত্র অনুযায়ী যে জল আত্মার পক্ষে পরম কল্যাণকর, সেই জল দেহের পক্ষে অতি মারাত্মক। স্যানিটারি বা স্বাস্থ্যের জন্য যে পরিচ্ছন্নতা আবশ্যক, সে বিষয়ের নির্দেশগুলি ব্যাপকভাবে পালন করিলে বিরাট পরিমাণ দুঃখদুর্দশার হাত হইতে আমরা বাঁচিতে পারি। বিজ্ঞান যদি সত্য হয় তাহা হইলে, তাহাকে

অবহেলা করাতে যে পরিমাণ নিষ্ঠুর হত্যালীলা আমাদের মধ্যে সংঘটিত হইতেছে কে তাহার পরিমাপ করিবে? ব্যাপকভাবে প্রতিনিয়তই যে ভ্রাতা-ভগিনী-পুত্র-কন্যা-বন্ধু ও প্রতিবেশীদের হত্যা করা হইতেছে! যাহাদের মৃত্যু আমাদের বেদনার কারণ তাহাদিগের অনেককে কি আমরা রক্ষা করিতে পারিতাম না? ইহার উত্তরে যাহা বলা হইবে তাহা যেন আমরা বিশ্বাস করিতে পারি। তাহা হইলে আমরা আমাদের ঔদাসীন্য ঝাড়িয়া ফেলিয়া ব্যাধির বিলম্বিত নিরাময়ের চেষ্টা না করিয়া ব্যাধির প্রতিষেধ ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। যাহাতে ব্যাধি না হয় তাহা করিতে পারিতাম। আকবর কিংবা পিটার দি গ্রেটের মত জবরদস্ত শাসক থাকিলে আমাদের যা জানা উচিত, তা জানিতে ও শিখিতে বাধ্য করিতে পারিতাম।

আমরা হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানেও সেই একই পরিচ্ছন্নতা। বসিবার ঘরের দেওয়ালগুলি ছবির দ্বারা সাজান, ম্যান্টলপীস সুদৃশ্য চিনা-মাটির পাত্র ও গেলাসে সাজান, আগুনের পাশে অ্যামেরিকা ও আফ্রিকা হইতে ক্রীত ঘাসফুলের শীষের সাজ, মেঝেতে মোটা কার্পেট কারুকার্য খচিত সোফা ও চেয়ার সমস্ত ঘরে অনেক রহিয়াছে, এবং প্রকাণ্ড ভারী টেবিল ঘরের মাঝখানে রক্ষিত, তাহার উপরে ছবির অ্যালবাম ও লিখিবার সরঞ্জাম সমূহ রহিয়াছে। শুইবার ঘরে, কফিঘরে, ডাইনিং ঘরে একই জাতীয় রুচির প্রকাশ। মনে রাখা প্রয়োজন যে এটি খুব উচ্চশ্রেণীর হোটেল নহে। যে সব বণিক বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পল্লীবাসী শহরে অল্প দিন বাস করিতে আসে শুধু তাহারাই এইখানে থাকে। ল্যাণ্ডলেডি ও তাঁহাব পরিচারিকাগণ আমরা উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের তত্ত্বাবধানে লাগিয়া গেল, হোটেলে যাহারা ছিল তাহাদের প্রতি মনোযোগ দিতেছি দেখিয়া তাহারাও গর্ব অনুভব করিতে লাগিল, এবং প্রত্যেকেই আমাদের সম্মুখে তাহাদের গুণপণা প্রকাশ করিতে লাগিল. যাহার যাহা কিছু গুণ আছে সে সবের সঙ্গে আমরা পরিচিত হইলাম। ইহাদের মধ্যকার একজন নাম স্বাক্ষর দেখিয়া কোনো ব্যক্তির চরিত্র বলিয়া দিতে পারে। সে তাহার বিদ্যা দেখাইবার জন্য আমাদের নাম সই করিবার উদ্দেশ্যে একখণ্ড কাগজ আমাদের সম্মুখে রাখিল। জাহাজে থাকিবার কালে শুভাধ্যায়ী অনেক ইংরেজ বন্ধু আমাদের লণ্ডনের প্রতারকদের সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছিলেন। অতএব যখন আমাদের স্বাক্ষর চাওয়া হইল তখন বেশ কিছু ভয় পাইলাম। ভাবিলাম ইহার পিছনে জালিয়াতির উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব। আমার বম্বাইয়ের বন্ধু মিস্টার গুপ্তকে বলিলাম, আপনি আগে সই করুন। মিস্টার গুপ্ত মিস্টার ইউ সি মুখার্জিকে কনুয়ের ঠেলা মারিলেন, মুখার্জি আমাকে ঠেলা মারিলেন। আমাদের ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া অটোগ্রাফ-প্রার্থী একখানি পকেট বুক বাহির করিয়া দেখাইলেন তাহাতে শত শত ব্যক্তির স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আমাদের সন্দেহ আরও বাড়িয়াই গেল। সিঁদেল চোরও সততা প্রমাণের জন্য তাহার সিঁদকাঠি দেখাইতে পারে। যাহাই হউক শেষ পর্যন্ত মরীয়া হইয়া আমাদের নাম স্বাক্ষর করিলাম। সুখের বিষয় অদ্যাবধি আমাদের কোনো অনিষ্ট হয় নাই। পরে অভিজ্ঞতা যাহা হইয়াছে

তাহা হইতে এইখানে বলা উচিত মনে করি যে, আমি আমাদের সন্দেহের কথা কিছু বাড়াইয়া বলিয়াছি।

পরদিন আমরা প্রদর্শনীতে গেলাম। ডক্টর ওয়াট আমাদের পূর্বেই ভারত হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার নিলেন। তিনি সন্ধ্যাবেলা আমাদের তাঁহার বাড়িতে লইয়া গেলেন এবং অক্সফোর্ড স্ট্রীটের থেকে দূরে অবস্থিত ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ ও হোয়াইট হল প্যালেস দেখাইলেন। পথটি দৈর্ঘ্যে কুড়ি মাইল, পথের একাংশের নাম অক্সফোর্ড স্ট্রীট, লণ্ডনের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত অবধি পথটি অনেকগুলি নামে বিভক্ত। জীবনে যতগুলি সেতু দেখিয়াছি তাহার মধ্যে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজটি আমার কাছে সর্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। আমরা ৭ই এপ্রিল (১৮৮৬) তারিখের হিমেল সন্ধ্যায় সেই অপরূপ সুন্দর সেতুটির উপর দাঁড়াইয়া যখন নিম্নে প্রবাহিত টেমস্ নদীর রূপালী জল দেখিতেছিলাম, তখন সেই দৃশ্যের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিসত্তা যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সেতুটি দৈর্ঘ্যে ১১৬০ ফুট প্রস্থে ৮৫ ফুট, এবং দুইধারে পায়ে চলার পথ ১৫ ফুট করিয়া প্রশস্ত। লণ্ডনে বাস কালে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে এই সেতু হইতে লাফাইয়া পড়িয়া কেহ কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে এমন খবর পড়িয়াছি। আমরা হোয়াইট হল প্রাসাদের দৃশ্য ক্ষণকালের জন্য মাত্র দেখিয়াছি, এবং প্রথম চার্লস-এর যে স্থানে শিরচ্ছেদন করা হইয়াছিল তাহার নিকটস্থ জানালাটাও দেখিয়াছি।

আমরা প্রতিদিনই প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইতে লাগিলাম। সন্ধ্যাবেলা আমরা লণ্ডন শহর দেখিতে বাহির হইতাম। একদিন প্রিন্স অভ ওয়েল্স্ আসিলেন প্রদর্শনী দেখিতে। সার ফিলিপ কানলিফ ওয়েন আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। প্রিন্সকে বেশ সদাশয় মনে হইল, তিনি আমাদের সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমরা সার জর্জ বার্ডউডের সঙ্গেও পরিচিত হইলাম। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভারতবন্ধু। আমাদের সাহিত্য আমাদের ধর্ম এবং আমাদের প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত। মনে হয় আমাদের দেশের কারুশিল্পের সঙ্গে তিনিই বিদেশীদের মধ্যে সর্বাধিক তথ্যজ্ঞানসম্পন্ন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ 'দি ইনডাস্ট্রিয়াল আর্টস অভ ইণ্ডিয়া'-র প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা ভারতীয়দের প্রতি এবং তাহাদের কর্মনৈপুণ্যের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে ভরা। ইউরোপের লোকদের নিকট ভারতীয় শ্রমশিল্পজাত দ্রব্যাদি জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে এই বই বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছে। আমরা ইংল্যাণ্ডে সার জর্জ বার্ডউডের তত্ত্বাবধানে ছিলাম, এবং তিনি সর্বদা আমাদের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। ইংরেজদের সমাজের শ্রেষ্ঠ দিকটি তিনিই আমাদিগকে দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয় তিনি বর্তমানে ভারতীয় শিল্প বিষয়ে বিস্তৃত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় নিযুক্ত আছেন। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থে অনেক তথ্য জানা যাইবে বলিয়া মনে করি।

ভূগর্ভস্থ রেলপথেই আমরা এ সময়ে অধিকাংশ সময়ে যাতায়াত করিতেছিলাম। লণ্ডনের এটি একটি বিস্ময়। মেট্রোপলিটন রেলওয়ে ও ডিস্ট্রিক্ট রেলওয়ে—এই দুটি প্রতিষ্ঠান ইহার মালিক। এই রেলওয়ে ইনার সার্কল ও আউটার সার্কল-এ বিভক্ত। প্রথমোক্তটি ঘনবসতিপূর্ণ মধ্য লণ্ডনে অবস্থিত— খিলন করা ভূর্গভস্থ সুরঙ্গের ভিতর দিয়া লাইন স্থাপিত। স্টেশনগুলি বাহিরে নির্মিত, যদিও উপরের জমি হইতে নিচের স্তরে, চওড়া সিঁড়ির সঙ্গে উপর নিচে যুক্ত। দুটি সার্কল-এ ৪৮টি স্টেশন আছে। সকাল সাড়ে সাতটা হইতে বেলা সাড়ে বারো অথবা একটা পর্যন্ত প্রতি তিন মিনিট অন্তর ট্রেন। প্রত্যেকটি যাত্রী বোঝাই। কয়েকটি স্টেশন বেশ বড়, এই সব স্টেশনে তিন অথবা চারটি প্ল্যাটফর্ম আছে, এখান হইতে ট্রেনগুলি বিভিন্ন দিকে যায়। কোনও স্টেশনে বিভিন্ন দিক হইতে আসা দুই-তিনটি পর্যন্ত ট্রেন এক সঙ্গে দেখা যায়। এঞ্জিনের শব্দে যাত্রীদের চলাফেরার তৎপরতা ইত্যাদি মিলিয়া খুবই একটা কর্মব্যস্ততার মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে। তাহা না দেখিলে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। ভারতবর্ষের মত এখানে যাত্রীরা চিৎকার করে না। রেল স্টেশনে অথবা সাধারণের মিলন স্থানে, এমনকি বাড়িতেও সবাই চাপা স্বরে কথা বলে। আমাদের উচ্চ স্বরে কথা বলা অভ্যাস, তাহাতে এখানে প্রতিবেশীদের দৃষ্টি আমাদের দিকে ফিরিয়াছিল, যদিও মুখে কিছু বলে নাই। বুঝিতে পারিলাম উহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করাই ভাল। বোর্ডে লেখা "এইখানে প্রথম শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন", "এইখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন", "এইখানে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য অপেক্ষা করুন" এই সমস্ত নির্দেশ প্ল্যাটফর্মের এক এক অংশে ঝোলান আছে। যাত্রীরা প্রয়োজন মত সেই সেই বিভাগে অপেক্ষা করে, এবং ট্রেন আসিলে সম্মুখেই তাহাদের নির্দিষ্ট শ্রেণীর গাড়ি দেখিতে পায়।

স্টেশনগুলি বিজ্ঞাপনে ভরা। এত, যে, দুটি বিজ্ঞাপনের মাঝখানে এক ইঞ্চি স্থানও ফাঁকা আছে কি না সন্দেহ। এই বিজ্ঞাপনে প্রথমে বিভ্রান্ত হইয়াছিলাম। একটি স্টেশনের নাম মনে হয় "পিয়ার্স সোপ" অথবা "কলম্যানস মাস্টার্ড"। গাড়িগুলির ভিতরেও বিজ্ঞাপনে ভরা। মানুষ জীবনে যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বোধ করে সেসমূহের মধ্যে যেগুলি শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা শস্তা সেই সব জিনিসের বিজ্ঞাপন এগুলি। এবং অদ্ভুত সব ছবি আঁকিয়া গুণাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে। যে অমৃত পানীয় দ্বারা হতভাগ্য মানবজাতি তাহাদের পার্থিব দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পারে, তাহা অবশেষে চেরি ব্র্যাণ্ডির ভিতর পাওয়া গিয়াছে। এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে অপূর্ব ছবি আছে তাহাতে দেখা যায় এক হটেনটট (দক্ষিণ আফ্রিকার এক জাতীয় আদিবাসী) দম্পতি ঐ অমৃত পান করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। মুখেচোখে একেবারে স্বর্গীয় দীপ্তি। শাদায় কালোয় যে জাতিভেদ এ বিষয়ে কত না অভিযোগ শোনা যায়। কৃষ্ণকায়দের আর ভয় নাই, শ্বেতকায়রা তাহাদের আর বর্ণ বৈষম্যের জন্য খাইয়া ফেলিবে না, কারণ একবার মাত্র পিয়ার্স সোপ মাখামাত্র কৃষ্ণতম ব্যক্তিরও মুখ শ্বেতকায়দের মত হইবে। বিজ্ঞাপন শিল্পে মিস্টার পিয়ার্স ওস্তাদ ব্যক্তি। পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুকারকগণ ইহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

যেখানেই যাই পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপন হইতে মুক্তি নাই। এমন কি 'পেনি' মুদ্রাগুলিতেও পিয়ার্স সোপ নামক যাদু-মন্ত্রটির ছাপ দেখা যাইবে। ক্রমাগত 'পিয়ার্স সোপ'-এর বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে কত লোক পাগল হইয়া গিয়াছে, কে জানে? মিস্টার পিয়ার্সের সাবান ব্যাপক বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যাপকভাবে বিক্রি হওয়া উচিত। রেল স্টেশনে, রেলগাড়িতে, এবং যে সব প্রাচীরে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলে সেখানে পিয়ার্স সোপ, পথে বড় বড় বোর্ডে পিয়ার্স সোপ, স্যাণ্ডুইচ বালকেরা (পিঠের দুই ধারে বিজ্ঞাপন বহনকারী) পথে পথে ঘুরিতেছে পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপন লইয়া, ওম্‌নিবাসে পিয়ার্স সোপ, স্টীমারে পিয়ার্স সোপ, সব স্থানে পিয়ার্স সোপ! বিজ্ঞাপনদাতাদের মতে এই বিজ্ঞাপনের খরচ বহু কোটি ক্রেতার মধ্যে ভাগ হইয়া যায় বলিয়া প্রতি ক্রেতার ভাগে সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র পড়ে। কিন্তু সেই ভগ্নাংশ যে কত, তা আমাদের জানিবার উপায় নাই। বহু লোক এই বিজ্ঞাপনের কাজে নিযুক্ত আছে। ছাপাখানার লোক, এনগ্রেভার, স্যাণ্ডুইচ বালকেরা এবং অন্যান্যরা ছাড়াও যে সব এজেন্ট এই কাজের ভার নেয়, তারাও এতে যথেষ্ট উপার্জন করে। ইহারই জন্য নূতন নূতন পেন্টের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে, নূতন টাইপ, নূতন বোর্ড এবং নূতন যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

রেল স্টেশনের কি নাম তাহা জানিতে হইলে আলোর দিকে তাকাইতে হইবে, সেখানে কাঁচের উপর তাহা লেখা রহিয়াছে। এই পথে এতগুলি ট্রেন যাতায়াত করা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যবস্থা, সম্পাদনা এমন মনোযোগের সহিত করা হয় যে দুর্ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। আমরা ঐখানে উপস্থিত থাকাকালে ভূগর্ভস্থ রেলপথে এক জার্মান ভদ্রলোকের মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ট্রেন চলিবার সময় তাঁহার মাথা জানালা দিয়া বাহির করিয়া অন্য কামরার যাত্রীদের দেখার বদ্ অভ্যাস ছিল। একবার কিসে মাথায় ধাক্কা লাগিয়া কিছু আহত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি সতর্ক হন নাই। শেষবার যখন তিনি জানালার বাহিরে মাথা গলাইয়াছেন সে সময়ে খিলানের একটি প্রলম্বিত পাথরে গুঁতা লাগিয়া মাথাটি প্রায় চূর্ণ হইয়া গেল। এই দুর্ঘটনার তিন দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুরঙ্গ-পথের রেলওয়ে ছাড়াও বহু সাবার্বান ও প্রাদেশিক রেলওয়ে লণ্ডনের চারিদিকেই বর্তমান রহিয়াছে। লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশন হইতে গ্রেট ঈস্টার্ণ রেলওয়ে ক্যামব্রিজ ও অন্যান্য স্থানে গিয়াছে। কিংস ক্রস হইতে স্কটল্যাণ্ডের দিকে গিয়াছে গ্রেট নর্দার্ন রেলওয়ে। প্যাডিংটন হইতে পশ্চিম দিকে গিয়াছে গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে। ইউস্টন রোড হইতে ম্যানচেস্টার-লিভারপুল-স্কটল্যাণ্ডে গিয়াছে লণ্ডন অ্যাণ্ড নর্দার্ন রেলওয়ে। ইউস্টন রোড হইতে স্কটল্যাণ্ডের দিকে গিয়াছে মিডল্যাণ্ড রেলওয়ে। লণ্ডন চ্যাটহ্যাম অ্যাণ্ড ডোভার রেলওয়ে ইংল্যাণ্ডের সহিত অস্টেণ্ড ও ক্যালের পথে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সকে যুক্ত করিয়াছে। লণ্ডন ব্রাইটন অ্যাণ্ড সাউথ কোস্ট রেলওয়ে পোর্টসমাথ-এর দিকে গিয়া নরম্যাণ্ডির পথে লণ্ডনের সঙ্গে প্যারিসকে যুক্ত করিয়াছে। সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে ফোকস্টোন ও ডোভার গিয়াছে, সেখান হইতে বুলয়েন, ক্যালে ও অস্টেণ্ড প্রভৃতি স্থানগামী ডাকবাহী স্টীমারের সঙ্গে যোগ রাখিয়াছে।

শহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি বহু ওমনিবাস্ চলাচল করে। ওমনিবাস্গুলি আকারে বড়, ভিতরের আসনগুলি গদি আঁটা, উপরতলায় বেঞ্চ। ট্রামগাড়ির মত ইহারা নিয়মিত সময় ধরিয়া পর পর যাতায়াত করে, এবং ঘোড়ায় টানে। এই বাস রেলের উপর চলে না। দুটি সুরঙ্গ-পথের রেলওয়ে কম্পানি বৎসরে ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ যাত্রী বহন করে। ৭ কোটি ৮০ লক্ষ যাত্রী। ইহা ভিন্ন টেম্স নদীতে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর লণ্ডনের কর্মব্যস্ত অংশের একধার হইতে অন্যধার পর্যন্ত স্টীমবোট ছাড়ে। চেলসী হইতে লণ্ডন ব্রীজ এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা কর্মচঞ্চল জনসমাগমে পূর্ণ। এই বোটগুলি মাঝখানে বিশেষভাবে নির্মিত কয়েকটি স্থানে থামে। এগুলি স্টেশনের কাজ করে। লণ্ডনের পথের ক্যাবগুলি কি তাহা বুঝাইবার জন্য আমি যদি আমাদের দেশের ছ্যাকড়া গাড়ির সঙ্গে এগুলির তুলনা করি তাহা হইলে ক্যাবের অপমান করা হইবে। এবং তাহাতে যে ধারণার সৃষ্টি হইবে তাহাও একান্তই ভ্রমাত্মক। এক কথায়, ক্যাব খুব উচ্চশ্রেণীর চারচাকার গাড়ি, শক্তিশালী সুপুষ্ট উজ্জ্বল ঝকঝকে দেহধারী ঘোড়ায় এগুলিকে টানে। ইহার সঙ্গে কলিকাতার কঙ্কালসার ঘোড়ায় টানা জীর্ণ, নোংরা, দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ির তুলনা করা চলে না। ভারতবর্ষে বলদ যে কাজ করে এখানে সেই কাজ দীর্ঘাঙ্গ দৃঢ় পেশীযুক্ত ঘোড়ায় করিতেছে দেখিলে ভারতীয়ের চোখ জুড়ায়। ইহারা ক্ষেত্রের যাবতীয় কৃষিকাজে লাগে, ট্রাক টানে (যাহা আমাদের গোরুর গাড়ি করে) এবং খালে নৌকা টানে। রুটি অথবা মাংস যাহারা গাড়িতে কবিয়া বিলি করে তাহাদের গাড়িটানা ঘোড়া খুব সুদর্শন না হইলে তাহা তাহাদের পক্ষে সম্মানজনক বোধ হয় না। দুচাকার গাড়িকে হ্যানসম বলে। লণ্ডনে ১৩০০০ এর বেশি হ্যানসম আছে। ভিড়ের পথে একের পর এক এমন বিরামহীনভাবে চলিতে থাকে যে তখন রাস্তা পার হওয়া বিপজ্জনক বোধ হয়। সেজন্য অনেক ক্রসিং-এর স্থানে খানিকটা স্থান পথের মাঝখানে রেলিং দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে, যাহাতে পথচারীরা অর্ধেক পথ পার হইয়া এইখানে কিছুক্ষণ দম লইতে পারে। এখান হইতে পরে সুবিধামত পথের অপরার্ধ পার হয়। এত রকমের এবং এত বেশী সংখ্যক যানবাহন এবং তা সব সময়েই যাত্রীপূর্ণ, তাহাতে মনে হইতে পারে পথগুলি বোধ হয় পথচারীশূন্য। আদৌ তাহা নহে। পথে এত লোক পায়ে হাঁটিয়া চলে যে, এবং তারা তাদের অভ্যস্ত রীতিতে ভারতীয়দের তুলনায় এমন দ্রুত চলে যে, দুজন লোকও পাশাপাশি এক সঙ্গে হাঁটিয়া যাইবার জায়গা খুব বেশি পায় না, অথচ তাহারা পাশাপাশি চলে, একজন আর একজনের পিছনে সারিবদ্ধ অবস্থায় চলে না। পথ চলিতে পরস্পর গুঁতোগুঁতি হয় না। অথবা আমরা যেমন করি, দুজন বিপরীত দিক হইতে আসিয়া মুখোমুখি হইলে কে কোন্ দিক ছাড়িয়া দিব তাহা ভাবিতে কিছু সময় নষ্ট হয়, এখানে তেমন ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ এখানে পথচারীরা পথের ডান ধার দিয়া চলে এবং যানবাহন বাঁয়ের ধার দিয়া চলে। পথের দুই ধারেই পথচারীরা গাড়ির বিপরীত মুখে চলে, তাই তাহাদের কখনও পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আগতকে পাশ কাটাইতে হয় না।

কর্মে চঞ্চল ব্যস্তত্রস্ত বহু মানুষের ভিড় যে কি বস্তু তাহা দেখিতে হইলে লণ্ডন শহরে সকাল নয়টা হইতে দশটার মধ্যে গিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। আমাদের দেশে মেলা হয়, সেখানেও হাজার হাজার লাখ লাখ ভিড় হইয়া থাকে, কিন্তু ভারতের এই সব ভিড় কেমন যেন প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয়। কারাগারের বন্দীরা বাধ্যতামূলক কাজ করিবার সময় যেমন নিষ্প্রাণ চোখে তাকায়, অথবা ভারতের যে সব অংশে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রথা প্রচলিত সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের মুখের চেহারা যেমন, ভারতীয়দের সাধারণ মুখের ভাবেরই সেগুলি কিছু পরিবর্ধিত সংস্করণ। ভারতীয়দের ভাগ্যে-সমর্পিত মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইবে এ মুখের মালিক বহু চিন্তার পর স্থির করিয়াছে তাহার জন্মিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, সে এ সংসারে আসিয়াছে নীরবে অন্যায় সহ্য করিবার জন্য, ইহা যেন তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঘটিয়া গিয়াছে। ক্ষুদে রাণা অথবা ইউরোপীয় টুরিস্টদের ঝামপান বহন করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে নিযুক্ত মোটবাহীরা হিমালয়ের খাড়া পথে উঠিবার সময় যেমন কাতর ভাবে পরিশ্রম করে সেও তেমনি সমস্ত জীবন বন্দীর মত কাজ করিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে উচ্চস্তরের ভারতীয় বুদ্ধিজীবী প্রকৃতির শক্তির কাছে পরাভূত হইয়া নিজের গড়া এক কল্পজগতের আশ্রয়ে বাস করে এবং সেই জন্যই তাহার মন অসুস্থ হয়। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই মানসিক অসুস্থতা ক্রমশই বিষাক্ততর হইতে থাকে, এবং কোনও ব্যক্তি যদি প্রথমজীবনে দেশের নেতৃস্থানীয় হইবার মত উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া থাকে তবে তাহার এই মানসিক অসুস্থতা ব্যাপকভাবে দেশের কল্যাণের পক্ষে অনিষ্টকর হইয়া উঠে ' বয়স বৃদ্ধিতে তাহার সম্মান বাড়ে এবং ছোটরা তাহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মনে করে, তা সে কথা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিষয়ে যত অসম্ভব অথবা অনিষ্টকরই হউক না কেন। আসলে সমস্ত জাতিটাই একটা মানসিক ধর্মভ্রষ্টতায় ভুগিতেছে, আমার স্বদেশবাসীরা ইহাকেই বলিয়া থাকেন চরম ধর্মানুবর্তিতা। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহাদের দৃষ্টি প্রাণহীন। এইখানে ৬৩২ একর পরিমাণ ক্ষুদ্র স্থানটি, যাহা 'সিটি' নামে অভিহিত, সেইখানে সকালে আসিয়া ইহাদের গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব জীবনের প্রবল বেগে প্রবাহিত স্রোতের দৃশ্যটি না দেখিলে কোনও হিন্দুর পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা সম্ভব নহে। এই স্থানটুকুতে প্রতিদিন আটলক্ষ নরনারী এবং সপ্ততি সহস্র শকট ছুটিয়া চলে। এটি পৃথিবীর হৃৎপিণ্ড, ইহা হইতে পৃথিবীর দিকে দিকে ধমনীসমূহ বিস্তৃত হইয়া বাণিজ্য-শোণিত শত ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। ইহারই প্রেরণায় গ্রীণল্যাণ্ডের উপকূলে এস্কিমোরা হিমশৈলের ভিতর সীল শিকার করিতেছে, তিমি শিকারীরা মেরু সমুদ্রে জীবন বিপন্ন করিতেছে, চীনারা পাহাড়ের ঢালু দেহ হইতে চায়ের পাতা ছিঁড়িতেছে, আফ্রিকাবাসীরা সীমাহীন মরুবুকে উটপাখীর দলকে তাড়া করিয়া ফিরিতেছে। এখানে ভাগ্য তাহার নিজ প্রাপ্য পায়, গুণ তাহার পুরস্কার পায়, কেহ ঐশ্বর্যলাভ করে, বা নিঃস্ব হয়, কিন্তু তাহারা সংখ্যায় কত কে তাহার হিসাব করিবে?

এই জনস্রোতে ধনী ব্যাঙ্কারকে দেখা যাইবে, যিনি অতি কঠিন সংগ্রামের পথে চলিয়া আজ সাফল্যের পথে প্রশান্তমুখ। তিনি সৎ পথে, পরিশ্রমের পথে, মিতব্যয়িতার পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার একটা বাঁধা পথ ছিল, একটি কর্মপদ্ধতি ছিল, এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা কি করিয়া গ্রহণ করিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন এবং কোনও সুযোগই তিনি ছাড়েন নাই। তিনি যে উচ্চ সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা দৈবাৎ হয় নাই। হইয়াছে তাঁহার অদম্য ইচ্ছার জন্য, ইচ্ছার শক্তির জন্য। তিনি এখন প্রশস্ত উদ্যানযুক্ত প্রাসাদতুল্য বাড়ির মালিক। এ বাড়ি শহরতলীতে অবস্থিত। পাহাড়ী অঞ্চলে তাঁহার সুরক্ষিত মৃগদাব আছে। তাঁহার সন্তানদের শিক্ষার নিমিত্ত ইংরেজ গভারনেস রাখা হইয়াছে, মেয়েদের পরিচর্যার জন্য সুইস পরিচারিকা নিযুক্ত হইয়াছে। তাঁর পরিবার রাজভোগ আহার করিয়া থাকেন, খাইবার টেবিলে ভোজ্য উপকরণগুলি দেখিলেই তাহা জানা যায়। একদিনের ভোজনের নমুনা দিই। প্রাতরাশের জন্য মাংস (হ্যাম) ও ডিম, সোল-মাছ, মটন-চপ, ভীল কাটলেট, অক্স-টাং, নানা জাতীয় রুটি, সব্জী, চা ও কফি। ব্যবসায়ী লোক বলিয়া প্রাতরাশ অন্য ধনী গৃহস্থের তুলনায় কিছু পূর্বেই (সকাল ৮-৩০) শেষ হইয়া যায়, এবং কিছু দ্রুতত্বের সঙ্গে। উক্ত ব্যাঙ্কার সিটির একটি রেস্টোরান্টে লাঞ্চ খাওয়া শেষ করেন। পরিবারের অন্যান্যরা অপরাহ্ন দেড়টার সময় বাড়িতে যে লাঞ্চ খান, তাহার তালিকা এইরূপ—ইম্পীরিয়াল সূপ, স্যামন মাছের মেয়োনেজ (ডিমের কুসুম, জলপাই তেল ও ভিনিগার অথবা লেবুর রস দিয়া প্রস্তুত একপ্রকার সস্‌, অন্য খাদ্যের সঙ্গে মিশাইয়া খাইবার চাটনি বিশেষ), স্যামন মাছের আচার, গলদা চিংড়ির স্যালাড, ইয়র্ক হ্যাম, ট্রাফলসহ কবুতর মাংসের পাই (ময়দার খোলসে ট্রাফল নামক ছত্রাক সহ পূর রূপে ব্যবহৃত ভাজা), মেষশাবকের ফোরকোর্টার (সম্মুখ মাংস), বীফ-এর সিরলয়েন (মধ্য পার্শ্বদেশের মাংস), ভিকটোরিয়া জেলি, স্ট্রবেরি ক্রীম, ফ্রেঞ্চ পেস্ট্রি, ভেনিস ব্রেড, রাউট কেক (পূর্বকালে উৎসবে ব্যবহৃত গুরুপাক কেক), ভোজনের শেষ পর্বে আনারস ও ফিলবার্ট-নাট। এতৎসহ হক, ক্লারেট, শেরি ও শ্যামপেন প্রভৃতি সব পানীয়। বৈকালের চা সাদাসিধা, অর্থাৎ চায়ের সঙ্গে শুধু রুটি, কেক, কিছু ঠাণ্ডা মাংস ও জিভের মাংস। অতঃপর ৭টায় ডিনার। ডিনারে পরিবারের সবাই একসঙ্গে বসেন। ডিনারের খাদ্যতালিকা—কচ্ছপ মাংসের সূপ, টালবট মাছ ও গলদা চিংড়ির চাটনি, সোল মাছের ভাজা খণ্ড, ভেনিসনের (হরিণের) পিছন দিকের মাংস, মেষের পিছন দিকের মাংস, বীফের রোস্ট সিরলয়েন, রোস্ট ডাক্‌, সিদ্ধ মুর্গীছানা, আনারসের ক্রীম, ফলের মাসেডোয়ান (নানা কাটাফলের মিশ্রণ), কেক, চীজ, বিস্কুট, আঙ্গুর, ফুটি, ফিলবার্ট (বাদাম জাতীয়) ওয়ালনাট; শ্যামপেন, পেরী হক, ক্লারেট এবং পোর্টওয়াইন পানীয়। মহিলাগণ বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, ছুঁচের কাজ করিয়া অথবা ইংরেজী, জার্মান অথবা ফরাসী নভেল পড়িয়া সময় কাটান। মেয়েদের শিক্ষায় জার্মান ও ফরাসী ভাষা অপরিহার্য। তিনি তাঁহার প্রথম দুইটি কন্যাকে শিক্ষার জন্য ফ্রান্সে পাঠাইয়াছেন, ছোট জন হাইডেলবার্গে আছে, কারণ জার্মানীতে

শিক্ষাগ্রহণ বর্তমানের একটি ফ্যাশান। একটি কন্যা ভাষাবিদ্ রূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ফরাসী ও জার্মান ছাড়াও সে স্প্যানিশ ও ইটালিয়ান ভাষা ভাল ভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, উপরন্তু গ্রীক ও ল্যাটিনেও তাহার কিছু দখললাভ হইয়াছে। পরিবারের আরও দুইজন মহিলা উচ্চ বিজ্ঞানে শিক্ষিতা। এই শ্রেণীর মহিলারা সাধারণতঃ একটুখানি কঠোর প্রকৃতির হইয়া থাকেন, ইহাদিগকে বলা হয় "ব্লু স্টকিং"।

ডিনারের পরে ব্যাঙ্কারের বৈঠকখানায় সময় কাটে সর্বাপেক্ষা সুখের। এক সন্ধ্যার বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। ডিনার শেষ হইবামাত্র সকলে এই কক্ষে আসিয়া মিলিত হইলেন। ঘরের একধারে অগ্ন্যাধার—সেখানে সমস্ত ঘরকে উষ্ণ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, প্রত্যেকেই তাহাতে আরাম বোধ করিতেছেন, বাহিরের অন্ধকার সেই পরিবেশকে আরও উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, কারণ সেই অন্ধকারে সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া সবেগে বায়ু বহিতেছে এবং প্রবল তুষারপাত হইতেছে। যেখানে একটুখানি আড়াল, সেইখানেই তুষার আশ্রয় লইতেছে। দেরিতে ফেরা পিতাকে একটি মেয়ে দরজা খুলিয়া দিতেছে। গৃহকর্ত্রী পরিবারের সমাবেশ-স্থলের শীর্ষে বসিয়াছেন, চেয়ারে বসিয়া তিনি সূচীকার্য চালাইতেছেন, ছোটরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে, কেহ মেঝের উপরে, কেহ সোফার উপরে, কেহ বেঁটে চেয়ারে; কুকুরটি ঘুমাইয়া আছে, ছোটরা তাহার গায়ে হাত বুলাইতেছে, বিরক্তও করিতেছে। ইউরোপ হইতে সদ্য আসা ছোট মেয়েটিকে পিয়ানো বাজাইতে অনুরোধ করাতে সে পিয়ানোতে গিয়া বসিয়া গান গাহিতেছে, একজন নিমন্ত্রিত অতিথি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া স্বরলিপির পাতা উল্টাইতেছে। গৃহকর্তা চেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। গান গাওয়া শেষ হইলে মেয়েটি সবার প্রশংসা লাভ করিল। নয় বৎসরের মেয়েটিকে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে বলা হইল। সে খুব সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিল। কবিতার বিষয়টি বাহিরের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ মিলিয়া গিয়াছিল। কাহিনীটি এই— একটি লাইফ-বোটের চালকের স্ত্রী খুব অসুস্থ ছিল। যে রাত্রির ঘটনা সে রাত্রিটি বড়ই দুর্যোগপূর্ণ ছিল। স্বামীটি তাহার দুইখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহার পাশে বসিয়া ছিল। মৃত্যু আসন্ন। স্ত্রীটিও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। নীরন্ধ্র অন্ধকার রাত্রি, বাহিরে অতি প্রবল ঝড়। এই ঝড়ের শব্দ ভেদ করিয়া দূর হইতে বিপন্ন এক জাহাজের তোপধ্বনি শোনা গেল, বিপদের ইঙ্গিত এটি। ঝড়ের গর্জন, পাহাড়ী উপকূলে ঢেউ ভাঙ্গার গর্জন। আরও একটি তোপধ্বনি। বোটম্যানকে এবারে যাত্রী রক্ষার জন্য যাইতে হইবে। ঘরে মুমূর্ষু স্ত্রী, বাহিরে কর্তব্যের আহ্বান। বোটম্যানের দ্বিধা, কিন্তু স্ত্রী বলিল, "জ্যাক, তোমাকে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতেই হইবে, তুমি আমাকে লইয়া থাকিও না, ওঠ। আমাদের পুত্র অ্যালফ্রেড পাঁচ বৎসর বিদেশে আছে, কে জানে হয়ত সেও এমন ভয়াবহ ঝড়ের মধ্যে কোথাও সমুদ্রে রহিয়াছে, সেও হয়ত ঐ বিপন্ন জাহাজের লোকদের মতই অন্য কোথাও কোনও জাহাজে একইভাবে বিপন্ন হইয়াছে। তুমি যাও, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত আমাকে আর জীবিত দেখিতে পাইবে না, কিন্তু জ্যাক তোমার কর্তব্যপালনের জন্য তুমি ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করিবে, অ্যালফ্রেডও আশীর্বাদ পাইবে।

মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা যখন হইবার নহে, তখন আমি মৃত্যুর মুহূর্তে উপস্থিত হইলে আনন্দের সহিত আমার আত্মাকে তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিব, যিনি আমাদের কল্যাণের জন্যই যাহাকিছু করিয়া থাকেন। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।" জ্যাক ও তাহার সহকর্মীরা দুঃসাহসিকতার সঙ্গে বিপন্ন জাহাজ লক্ষ্য করিয়া লাইফ-বোটটি সেই বিক্ষুব্ধ ঝটিকাব মধ্যে ভাসাইয়া দিল। কিন্তু জাহাজটি ততক্ষণে সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, একটিমাত্র ছেলে প্রাণপণে তাহার মাস্তুলটিব দড়ি জড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিয়া আছে। মাস্তুলটি ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। বহু কষ্টে উহারা তাহাকে রক্ষা করিতে পারিল, তাহাতে নিজেদের জীবনও ভীষণভাবে বিপন্ন হইযাছিল। জ্যাক আবিষ্কার করিল, সেই ছেলেটি তাহারই পুত্র অ্যালফ্রেড। বহুকাল সে নিখোঁজ ছিল, এতদিনে পাওয়া গেল তাহাকে। উহারা ঘরে ফিরিয়া দেখে জ্যাকের স্ত্রী তখনও জীবিত। তাহার অসুখ ক্রমে ভাল লইয়া গেল। উহারা পরে সুখে দিন কাটাইতে লাগিল। ছোট্ট মেয়েটি এই কবিতাটি এমন জীবন্তভাবে আবৃত্তি করিল, এবং শেষ অংশটির পুনরাবৃত্তি করিল যে উপস্থিত সকলেই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল। এইভাবে সম্মানিত ইংরেজরা দিন যাপন করিয়া থাকেন। যদি কেউ অতিথিরূপে এই জাতীয় নির্দোষ আনন্দভোগেব শবিক হইয়া থাকেন, তবে তিনি ইংরেজগৃহের এই উষ্ণ পরিবেশটি স্মরণ কবিবামাত্র, ইংরেজদেব আনন্দ উপভোগের এই উচ্চ এবং পরিমার্জিত রুচিব কথাও স্মরণ না করিয়া পাবিবেন না। এই দুঃখপীড়িত সংসারে মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর আর কি আনন্দভোগের কল্পনা হইতে পারে?

জনতা হইতে আর একটি যুবকের কথা পাশাপাশি উপস্থিত করিতেছি। এই যুবকটি এক দোকানের কর্মচারী। সে তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, দেখিতে মোটামুটি মন্দ নয়, এমন একটি স্ত্রীলোকদের পোষাক প্রস্তুতকারিণী মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। সুতরাং পিতা তাহাকে ত্যাজ্য কারিয়াছেন। এই দম্পতি তাহাদের এক বৎসরের একটি শিশুসন্তান সহ সপ্তাহে ত্রিশ শিলিং ব্যয়ে পৃথকভাবে বাস করে। এই ত্রিশ শিলিং হইতে তাহাদের দুটি ছোট কামরার জন্য ভাড়া দিতে হয় সপ্তাহে ৮ শিলিং। ঘরের জন্য যে বিছানা আসবাবপত্র দরকার তাহা তাহারা ধারে কিনিয়াছে, মূল্য কিস্তিবন্দীভাবে শোধ করিতে হয়। এইরূপ 'হায়ার পার্চেজ' পদ্ধতি লণ্ডনে এখন খুব প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতায় ঠেলাগাড়ি বা গোরুর গাড়ির চালকদের প্রায় এইরকম পদ্ধতিতে প্রতিদিন ঋণদাতার ঋণ শোধ করিতে হয়, উচ্চ সুদ সহ। পার্থক্য এই যে, এখানে কিস্তির টাকা সপ্তাহান্তে দিতে হয়। প্রতি সপ্তাহে ১০ শিলিং দিয়া ৫০ পাউণ্ডের আসবাব কিনিতে পাওয়া যায়। যে যুবকটির কথা বলিতেছি তাহাকে তাহার ক্রয় করা জিনিসগুলির জন্য সপ্তাহে ৫ শিলিং করিয়া দিতে হয়। সে কিনিয়াছে ৩ পাউণ্ড দামের কার্পেট, ১ পাউণ্ডের আয়না ও স্ট্যাণ্ড সহ হাতমুখ ধুইবার পাত্র, ২ পাউণ্ড দামের সোফা, ছয়খানা চেয়ার কিনিয়াছে ১ পাউণ্ড ২ শিলিঙের, মেহগিনি ড্রয়ার ৫ পাউণ্ডের, তিনখানা টেবিল ৭ পাউণ্ডের, পেরাম্বুলেটর ১ পাউণ্ড ১০ শিলিঙের,

বইয়ের তাক ১ পাউণ্ডের, মোট খরচ হইয়াছে ২৫ পাউণ্ড ১২ শিলিং। সপ্তাহে পরিবারের খাইবার খরচ প্রায় ১৫ শিলিং ৬ পেনি। ভাগ করিলে দাঁড়ায়—মাংস ৬ শিলিং, রুটি ২ শিলিং ৪ পেনি, সব্জী ১ শিলিং ৯ পেনি, মাখন ১ শিলিং, চা, চিনি, দুধ ২ শিলিং, পরিজের জন্য ওটমীল ১ শিলিং ৭ পেনি, বিয়ার ১ শিলিং ২ পেনি। মোট ১৫ শিঃ ১০ পেঃ। বাকি থাকে ১ শিলিং ২ পেনি, তাহা কয়লা, সাবান, কাপড়, ধোলাই খরচ ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট নহে। কিন্তু তার স্ত্রী কিছু শেলাইয়ের কাজ করিয়া যাহা পায়, তাহাতে ঘাটতি পূরণ হইয়াও সামান্য কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। তাহা দ্বারা ইহারা ক্রমে অবস্থার কিছু উন্নতি করিয়া লইতেছে। সে নিজ হাতে রান্না করে এবং কাপড় ধোয়া ব্যতীত আর সমস্ত গৃহস্থালীর কাজ করে। সাড়ে সাতটায় প্রাতরাশ খায়, খাদ্যসামগ্রী পরিজ রুটি মাখন ও চা। অপরাহ্ন ২ টার সময় তাহারা ডিনার খায়। রবিবারে গরম মাংস খায়, সোমবারে সেই মাংসই ঠাণ্ডা খায়, এবং মঙ্গলবারে তাহার স্টু খায়। বুধবারে নতুন আর এক খণ্ড জয়েন্ট (মাংস) আসে। সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত তাহা দ্বারা চালাইয়া লয়। বাড়ি হইতে যাহাদের অনেক দূরে কাজ করিতে হয়, তাহারা, যাহার যেমন সাধ্য তেমনি ভোজনালয়ে, বাহিরেই ডিনার লয়। এই রকম ডিনারের খরচ ৬ পেনি অথবা বেশি। ৬ পেনিতে এক প্লেট মাংস ও সব্জী দেওয়া হয়। কেহ কেহ ডিনার ৪ পেনিতেও সারিয়া লয়। তাহারা খায় পর্ক (শূকর মাংস) চপ ও পেঁয়াজ ভাজা। শুধু এ রকম খাদ্য, পরিবেশনকারী ভোজনালয় অনেক আছে। ইংল্যাণ্ডে সব জিনিসেরই দাম চড়া, তাই এখানে কোনও গরীব লোক কত কমে তাহার পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে তাহা বলা কঠিন। এমন লোক আছে পরিবারের পাঁচ ছয়টি সন্তান সহ যে সপ্তাহে ১ পাউণ্ড খরচে চলিতে পারে। ভারতবর্ষের হিসাবে ইহা অনেক বেশি শুনাইবে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাহা নহে। ভারতবর্ষে একটি লোক দিন ১ পেনি (৪ পয়সা পরিমাণ) দ্বারা চালাইতে পারে, বহু জিনিস সে বাদ দিয়া চলিতে পারে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে তাহা চলে না, এখানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে অনেকগুলি জিনিস অপরিহার্য। এই যুক্ত রাজ্যের অনেক স্থানে গরীব মানুষ কদাচিৎ মাংস কিনিয়া খাইবার সামর্থ্য রাখে। তাহাদের প্রধান খাদ্য আলু, রুটি ও ওটমীল। একজন ভারতীয় ছাত্র ইংল্যাণ্ডে ৩০ শিলিঙে খাওয়া ও থাকার খরচ চালাইতে পারে, কিন্তু কাপড়চোপড় ধোয়া, রেলভ্রমণ এবং অন্যান্য বিষয়ে আরও ৩০ শিলিং খরচ বাদ দিয়া চলিতে পারে না। এ সব খরচ আগে অনুমান করা না থাকিলেও, তাহাকে করিতেই হইবে। মধ্যবয়সী কোনও ভদ্রলোক এখানে ভ্রমণ উদ্দেশ্যে আসিলে তাঁহার সপ্তাহে ৫ পাউণ্ডের কমে চলিবে না।

৩

এইবার একজন খেলনার দোকানের কর্মী মেয়ের কথা বলি। তাহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। সে তাহার বন্ধুকে বলিতেছিল, শুধু ভালবাসা হইলেই সে বাঁচিতে পারে, তাহার বেশী আর তাহার কিছু দরকার নাই। বড়ই বেদনাদায়ক তাহার অবস্থা। তিন বৎসর পূর্বে এক শনিবার রাত্রে সাধারণ স্নানাগারে ছয় পেনি খরচ করিয়া একটি নাচঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। সেইখানে তখন বল্‌-নাচ চলিতেছিল। লণ্ডনে এরকম বল্‌-নাচের সাপ্তাহিক বা অর্ধসাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ঘটিয়া থাকে। সাধারণ স্নানাগারের মত এই নাচের আয়োজন কোনও কোনও ব্যক্তি কিছু লাভের উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে। যে সব তরুণ-তরুণীর মন একটুখানি কোমল ও স্নেহাতুর তাহারাই এই জাতীয় নাচঘরের পৃষ্ঠপোষক। তাহারা এখানে ভালবাসার উপযুক্ত পাত্র বা পাত্রী খুঁজিতে আসে। আমি যে মেয়েটির কথা বলিতেছি সে এখানে এক রেলওয়ের প্লেটপাতা মিস্ত্রির সঙ্গে নাচিতেছিল। সময়টা তাহাদের খুবই আনন্দের ভিতর দিয়া কাটিয়া গেল। পরদিন ঐ যুবকটি মেয়েটির কর্মস্থলে, সেই খেলনার দোকানের সম্মুখে, আসিয়া দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল। সে জানিত ৭টার আগে দোকান বন্ধ হইবে না, তবু সে অনেক আগে আসিয়াছিল। অবশেষে দুইজনের দেখা হইল, এবং মেয়েটিকে সে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে চাহিল। মেয়ে তাহার বাড়ির ঠিকানা পরিষ্কারভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিল, তথাপি 'অন্যমনস্ক' যুবক পথ হারাইয়া ফেলিল, কিন্তু ভুল পথে চলায় মেয়েটি যে কেন আপত্তি করিল না তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই। কত পথ যে তাহারা ঘুরিল এবং অবশেষে হাইড পার্কে পৌঁছিয়া সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিল এবং পরে এক গেলাস করিয়া পোর্টওয়াইন পান করিয়া আরও একটুখানি শান্তিলাভ করিল। প্রথমে মেয়েটি উহাতে আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু যুবকটির পীড়াপীড়িতে অবশেষে রাজি হইল। ইহার পর যুবকটি প্রতিদিন ঐ খেলনার দোকানে নিয়মিত আসিয়া মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল—সোজা পথে নহে অবশ্যই, যতদূর সম্ভব ঘোরা পথে, যে সব পথ তাহার বাড়িতে যাইতে পার হইয়া যাইবার কোনও দরকারই নাই এমন সব পথে। একদিন মেয়েটিকে সে থিয়েটারে লইয়া গেল, এবং সেজন্য ৬ শিলিং ৪ পেনি খরচ করিল। অর্থাৎ দুইখানা টিকিট ৪ শিলিং, বরফ ১ শিলিং, দুই গেলাস পোর্টওয়াইন ৮ পেনি, ওমনিবাস্‌ ৮ পেনি। অবশেষে ঘনিষ্ঠতা একটি ক্রান্তি মুহূর্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন এবং রাত্রি মেয়ের মিষ্টি চেহারাটি যুবকের মন ভরিয়া রাখিল এবং মেয়েটিরও সেই অবস্থা। ঘড়ি সেদিন ৭টা বাজিতে এত বিলম্ব করিতেছে কেন, কখন সে বাহির হইয়া যুবকের সহিত মিলিত হইবে। এক রবিবার দুইজনে হাইড পার্কের একখানি বেঞ্চিতে পাশাপাশি নীরবে বসিয়া সারপেনটাইনের জলে বন্য হাঁসদের খেলা দেখিতেছিল। যুবকটিই

সে নীরবতা প্রথম ভঙ্গ করিল। সে তাহার প্রেম নিবেদন করিল মেয়েটিকে, এবং বলিল সে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে। মেয়েটি প্রথমে লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, তাহার পর তাহার দুটি চক্ষু ভিজিয়া উঠিল, অবশেষে যুবকটির প্রশস্ত বক্ষে মাথাটি রাখিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা"। তবে ইহাও বলিল যে, সে তাহার পিতামাতার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করিতে পারিবে না। যুবক সহজেই মেয়ের পিতামাতার সম্মতি আদায় করিল এবং উহারা পরস্পর বিবাহের জন্য 'এন্‌গেজ্‌ড্‌' হইল, শপথে আবদ্ধ হইল। সুদীর্ঘ তিনটি বৎসর তাহারা পরস্পর শপথবদ্ধ অবস্থায় রহিল, তাহার কারণ তাহারা বিবাহের পক্ষে কম বয়স্ক ছিল, উপরন্তু ঐ যুবকের উপার্জন এমন ছিল না যাহাতে সে একটি পরিবার পালন করিতে পারে। অভিভাবকেরা এই সব কথাই বলিলেন, অতএব তাহারা অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইল। অল্পদিন পরে ঐ যুবক অন্য একটি রেলওয়েতে বেশি বেতনের কাজ পাইয়া এইবার বিবাহের সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করিতে লাগিল। কিন্তু হায় পুরুষের অস্থিরমতিত্ব! সাত দিনের ছুটি লইয়া যুবকটি মারগেটে চলিয়া গেল—বলিয়া গেল লণ্ডন শহরের ধোঁয়া দেহ থেকে নিষ্কাশিত করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ স্বাস্থ্য ফেরান। একটি প্রমোদ ভ্রমণে বোটের উপর একটি মেয়ের সঙ্গে তাহার পরিচয় হয়, তাহার মুখ আরও সুন্দর, এবং তাহাকে দেখিবামাত্র সে তাহার প্রেমে পড়িয়া যায়। মেয়েটিও তাহার মনোযোগ প্রত্যাখ্যান করে না। তাহাদের সম্পর্ক তখনও কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিতে পারে নাই, কারণ প্রেমিক যুবকের মনে তখন বিশ্বাসভঙ্গের ভয়টা বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কথা হয় তাহারা লণ্ডনে পুনরায় মিলিত হইবে। সে ফিরিয়া আসামাত্র তাহার উদাসীন ব্যবহার আগের মেয়েটির লক্ষ্য এড়ায় না। ক্রমেই যুবকটি মেয়েটির নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল, শেষে একদিন অবস্থা চরমে উঠিল যখন যুবকটি তাহার নতুন প্রণয়িনীকে লইয়া তাহার সম্মুখে দেখা দিল। মেয়েটির হৃদয় ভাঙিয়া গেল এ দৃশ্যে, কিন্তু তাহার নারীজনোচিত অহঙ্কার চরমতম ঘৃণার দ্বারা তাহার প্রণয়ীর নীচ ব্যবহারকে অভ্যর্থনা জানাইল। কিন্তু স্ত্রীলোকের হৃদয় হইতে ভালবাসার ছাপ একদিনে মুছিয়া যায় না, ভালবাসা আন্তরিক হইলে তাহার কোমল হৃদয়ে তাহা একটি গভীর ক্ষত রাখিয়া যায়। একটি মাত্র বন্ধুর কাছেই সে তাহার গভীর বেদনার কথা চোখের জলের সঙ্গে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল, আর যদি কিছু নাও থাকে তবু শুধু ভালবাসার উপর নির্ভর করিয়া সে বাঁচিতে পারে।

এরকম ঘটনা অবশ্য সাধারণতঃ যাহা ঘটে তাহার ব্যতিক্রম। এরকম মিলন এবং এরকম অগ্রসর হওয়া সাধারণতঃ পরিণয়েই আসিয়া শেষ হয়। ভালবাসা লাভের জন্য প্রণয়ীর দিক হইতে যে প্রণয় নিবেদনের পালা চলিতে থাকে, সেই সময়টার সঙ্গে যে ভালবাসার স্বপ্নময় অনুভূতি, প্রণয়িনীকে দেখিবার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা, মিলনের সুখানুভূতি, বিচ্ছেদের বেদনা, আশা ও সন্দেহের দোল, এবং অন্যান্য অনেক অপার্থিব আনন্দকর ছোটখাটো বিষয় বিজড়িত, তাহা যখন ভাঙিয়া পড়ে, সেই দিন অতীত হইলে সেই সব সুখস্মৃতি আবার মনে জাগিতে থাকে। প্রাচ্য দেশের যুবকের মনে ভালবাসার সাময়িক মোহ

অবশ্যই জাগে, কিন্তু ভালবাসার রোমান্স বা ভালবাসার সঙ্গে দীর্ঘকাল মনে যে রহস্যময়, স্বপ্নময়, অপার্থিব রভসরসের লীলা চলিতে থাকে, তাহার অভিজ্ঞতা কমই লাভ করিতে পারে। দেশের প্রথা তাহাকে জীবনের একটি মধুর উদ্দীপনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

কিন্তু যাঁহার এই রীতির বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হইবার প্রবল যুক্তি রহিয়াছে, তিনি ভারতীয় উপন্যাস লেখক। প্রেমকে পরিহার করিয়া উপন্যাস রচনা ও হ্যামলেটকে বাদ দিয়া হ্যামলেট নাটক অভিনয়, অথবা রামকে বাদ দিয়া রামায়ণ রচনা, একই কথা। সেই জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে প্রাচীন কালের আশ্রয়ে ফিরিয়া যাইতে হয়, যেকালে যুবতীরা স্বেচ্ছায় যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন। অথবা তাঁহাকে মুসলমান আক্রমণকারীদের যুগের পটে কাল্পনিক কাহিনী রচনা করিতে হয়, অথবা আরও পরের প্রাথমিক ব্রিটিশ যুগে, যখন বাংলা পল্লী ডাকাতদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইত, সেই সময়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। চার্লস ডিকেনস এ জন্য অপহৃত হইবার আশঙ্কা হইতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইউরোপের ঐতিহাসিক রোমান্স লেখকরা তাঁহার হাতে খুব ভাল ব্যবহার পান নাই।

স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিলে দেখা যায় প্রাচ্যগণ এই রোমান্সের অভাবে পীড়িত হয় নাই। অন্ততঃপক্ষে পারিবারিক আনন্দের ক্ষেত্রে তাহারা ইংরেজরা তাহাদের প্রতি যে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে। পিতামাতা পিতৃব্য খুড়ী পিসি ভাই ভগ্নী শ্যালক জামাতা ভ্রাতুষ্পুত্র পৌত্রপৌত্রী এবং যাবতীয় নিকট বা দূর আত্মীয় সহ যে পরিবার, তাহা ইংরেজের স্বামী স্ত্রী সন্তান ও শাশুড়ি মিলিয়া যে পরিবার তাহা হইতে অধিকতর শান্তিপূর্ণ। ভারতীয় স্বামী স্ত্রী অন্য লোক স্ত্রী হইলে কেমন হইত বা স্বামী হইলে কেমন হইত তাহা তুলনা করিয়া দেখিবার অবকাশ পায় না, এবং সেই জন্য তাহারা নিজ নিজ ভাগ্য লইয়া খুশি থাকে। শৈশব হইতেই তাহারা একত্র বাড়িয়া উঠে, এবং তাহারা পরস্পরকে পছন্দ করিয়া লয়, এবং অল্প বয়সেই তাহাদের যে সন্তান জন্মে তাহারই প্রতি তাহাদের স্নেহ আবদ্ধ হইয়া পড়ে। আরও একটি কথা, ঝগড়াবিবাদ করিতে ত কিছু তেজের দরকার হয়।

কিন্তু ইহাতে সুখ থাকুক বা না থাকুক, ভারত যদি পৃথিবীর সভ্য দেশগুলির মধ্যে আপনার স্থান করিয়া লইতে চাহে, তাহা হইলে তাহার বর্তমানের এ অবস্থা চলিতে পারে না। শিক্ষা ও স্বাধীনতা পাইলে মেয়েদের নূতন কল্পনা, নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিলে তাহা তাহারা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য একটুখানি ধৈর্যহীন হইতে পারে, এবং সেজন্য পারিবারিক শান্তিও কিছু বিঘ্নিত হইতে পারে, কিন্তু এসব সামান্য ত্রুটিকে বেশী রকম বাড়াইয়া দেখিয়া ইহার অপরিমিত সুফলকে অগ্রাহ্য করা প্রভুত্ববিলাসী পুরুষদের দ্বারা চিরকালই হইয়া আসিয়াছে। শিশু বিবাহ অবশ্যই বন্ধ করিতে হইবে, এবং স্ত্রীলোককে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, এবং শুধু ভারতে নহে পৃথিবীর সমস্ত দেশে। যাহাই হউক চীনারা তাহাদের patrise potestas বা সন্তানের উপর পিতৃ-অধিকার লইয়া গর্ব করুক, ব্রিটিশ ভারতে কোনো আকারেই থাকা চলিবে না। ভারতীয় পিতামাতাদিগকে একথা মানাইয়া লইতে হইবে যে তাহাদের একজন অসহায় জীবকে বিক্রয় অথবা সম্প্রদান করার কোনও

অধিকারই নাই—দানের পাত্র যত উপযুক্তই হউক না কেন। গত একপক্ষ কালের মধ্যে আমার পরিচিত জনৈক ব্রাহ্মণ ৩০০ টাকা মূল্য দিয়া চারি বৎসরের একটি কন্যাকে তাহার মায়ের নিকট হইতে কিনিয়া লইয়াছে। এ জাতীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং সে সব কথা শুনিলে হিন্দুসমাজের অতিবড় স্তাবকও আতঙ্কিত হইবেন। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের নামে হাজার হাজার শিশুকে ক্রয় অথবা বিক্রয় করা হইয়া থাকে। ধর্মই যদি এই দুষ্কার্যের মূলে রহিয়া থাকে তাহা হইলে যাঁহারা ন্যায়ের পক্ষে তাঁহারা এ ধর্মকে সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা যেমন সদ্যোবিধবা বৃদ্ধামাতাকে চিতায় পুড়াইতে পারেন না, দেবতার কাছে নরবলি দিতে পারেন না, তেমনি ছোট মেয়েকে কিনিতে অথবা বিক্রি করিতে পারেন না।

কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি এই যে, তাহারা শিক্ষা পাইলেই ভ্রষ্টা হইবে। আমি বলি এ রকম ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অনেক ইউরোপীয় প্রথা আমি সমর্থন করি না বটে, এবং তাহাদের রীতিনীতি এদেশে আসুক তাহাও চাহি না, কিন্তু এ কথা আমি অসঙ্কোচে বলিতেছি, ইউরোপের মেয়েরা তাহাদের সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত স্বাধীনতা এবং সকল বিষয়ে পরনির্ভরতা ত্যাগ সত্ত্বেও, ভারতবর্ষে যে পরিমাণ দুর্নীতি আছে, তাহা বেশী নহে। কলকাতার ঝিদিগের আচরণের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ, আর লণ্ডনের বারাঙ্গনাদের আচরণের উপর নির্ভর করিয়া ও-দেশের নীতি বিষয়ে মত প্রকাশ, একই জাতের। নৈতিক বিচারে নিষ্কলঙ্ক থাকা ও সম্মানরক্ষা করা ভারতীয় নারীর কাছে যতটা মূল্যবান, ইরেজ নারীর পক্ষেও ততটা মূল্যবান। নারীর কর্তব্যপরায়ণতা সম্পর্কে প্রবল নিষ্ঠার উপরে ইংরেজ পুরুষের স্বতঃই একটা নির্ভরতা আছে। যদি না থাকে, তবে ইংরেজ নারী তাহা তাহার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবার শক্তি রাখিয়া থাকে। ভারতীয় নারী যে নমনীয়তা, অহঙ্কারহীনতা, সুরুচি, স্নেহপ্রবণতা, ধর্মপরায়ণতা, আত্মসম্মানবোধ, সদ্‌গুণপ্রিয়তা প্রভৃতির স্বভাবতঃই অধিকারী তাহাতে তাহাকে ঘরে তালাবন্ধ না রাখিলে তাহাকে বিশ্বাস নাই, সে সমস্ত গুণই হারাইয়া বসিবে এরূপ মনে করা আমাদের পক্ষে অকৃতজ্ঞতার পরিচায়ক। মোট কথা, যে নারীকে বিশ্বাস করা যাইবে না, তাহাকে পালন করিয়াই বা লাভ কি? ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানীরা স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক খুব সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। বিবাহ-বন্ধন পবিত্র বন্ধন। সম্ভোগের নহে, মানুষের জীবনের কর্তব্যের দাবীতে এই বন্ধন। ইহা ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্যের বন্ধন, আত্মার সঙ্গে আত্মার বন্ধন। নরনারীর সম্পর্কের বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ভাব পৃথিবীর অন্য কোথাও কেহ এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। তথাপি প্রাচীন যুগের সেই ব্রাহ্মণ ঋষিদের অরণ্যগৃহে যে আলো মৃদুভাবে জ্বলিয়াছিল, বর্হিজগতের গভীর অন্ধকারে তাহার দীপ্তিকম্পন মুহূর্তের জন্যও প্রকাশিত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। বাহিরে সমস্তই অন্ধকার, এবং তখন হইতে যতগুলি সভ্যতার স্তর আসিয়াছে তাহাতে বিচিত্র জাতির বিভিন্ন চিন্তাধারা প্রবলভাবে সমাজকে প্রভাবিত করিয়াছে। অরণ্যের সেই প্রজ্বলিত আলো আজ নির্বাপিত। অতএব

আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি যে, যে সম্মানজনক সম্ভ্রম ব্যবহার ইউরোপের নারীগণ পাইয়া থাকেন, আমাদের দেশে তাহার সাক্ষাৎ মেলা ভার। এখানে কোনও যুবতী বর্তমান প্রথাকে অমান্য করিয়া দেখুক, তার প্রতি শিভালরি কেহ দেখাইবে না, বর্বরোচিত ব্যবহার করিবে। তাহার এই অভিনব ব্যবহার, এবং সে যে এরূপ ব্যবহার করিতেছে ইহা অসম্মানজনক বিবেচিত হইয়াছে এতকাল, তাই তাহার এরূপ সাহস দেখিলে তাহাকে সবাই অন্যায়ভাবে সন্দেহ করিবে, মনে করিবে সে ভ্রষ্টা। এবং সেজন্য তাহাকে যতভাবে পারে উত্যক্ত করিবে। পুরুষ তাহার আদিমকালের পুরুষদের নিকট হইতে স্ত্রীলোক সম্পর্কে যে ধারণা উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছে, যাহা এখনও নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিতেছে, তাহা একমাত্র দূর হইতে পারে যদি সে স্বভাব-সরল মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলাফেরার সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইতে পারে। মেয়েরা এখন স্বাধীনভাবে পথে বাহির হইলে তাহাদিগকে চারিদিকের অতি নোংরা পরিবেশকে ঘৃণা করিয়া, অগ্রাহ্য করিয়া চলিতে হইবে। কারণ জাতীয় চরিত্র অতি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই ত্রুটিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সময়ের পূর্বেই, এমন অবস্থায় যাহারা দুঃসাহসী হইয়া, যেখানে গভীর অন্ধকার ছিল সেখানে সহসা আলোর প্লাবন বহাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে, তাহাকে একটা বেদনাদায়ক অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়া কিছুকাল চলিতেই হইবে। তাহাদিগের জয় হউক। স্ত্রীলোকদের এই অস্বাভাবিক অবস্থা আমাদের দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করিয়াছে সে বিষয়ে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। ইংরেজ মায়ের মত আমাদের মা হোক, তাহার মত সে আমাদের সন্তান পালন করুক, তরুণীরা দুর্দান্ত যুবকদের মহৎ কাজে প্রেরণা দিক, স্ত্রীগণ স্বামীদের নিরাপদে চালনা করিয়া জীবনের আবর্ত উত্তীর্ণ করিয়া দিক, সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন মহিলারা আমাদের গোল্লায়-যাওয়া সমাজকে পরিমার্জিত, পুনরুজ্জীবিত এবং বলিষ্ঠ করিয়া দিক—তাহা হইলে মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিতে সক্ষম হইবে।

আমাদের লণ্ডন পৌঁছিবার পরের দিন দেখিলাম, 'ডেলি নিউজ' খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছে যে, মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন এইবার আয়ার্ল্যাণ্ডে উন্নত ধরনের শাসন প্রবর্তনের জন্য পার্লামেণ্টে একটি বিল উপস্থিত করিতেছেন, এবং ইহার দ্বারা ঐ হতভাগ্য দেশের সকল অশান্তি ও বিবাদ চিরতরে মিটিয়া যাইবে। ইহাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিবে, এবং ইংল্যাণ্ডের সহিত আয়ার্ল্যাণ্ডকে চির সখ্যসূত্রে বাঁধিবে। আমরা মাসখানেক বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাতে প্রথম পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এ সংবাদের গর্ভে কোন্ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত লুকাইয়া আছে তাহা উপলব্ধি করিতে পরিলাম না। ইংরেজসমাজে ইহার জন্য ঝঞ্ঝার আবির্ভাব ঘটিবে বাহিরে তাহার কোনও লক্ষণই দেখিলাম না, দূরাগত কোনও শব্দও কানে আসিল না। কিন্তু আমাদের ভুল হইয়াছিল। বাহিরের শান্ত ভাবের তলায় তলায় লণ্ডনের মন টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। ঐ বৃদ্ধ গ্ল্যাডস্টোন আরও কি অনিষ্ট করিয়া বসে তাহা ভাবিয়া উদ্বেগের

আর সীমা ছিল না। গ্ল্যাডস্টোনের পরিকল্পিত প্রস্তাবসমূহের খবর ইতিমধ্যেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিপক্ষ দল চিৎকার করিতেছিল, গেল গেল, আয়ার্ল্যাণ্ড হাতছাড়া হইল। আমাদের আসিবার চারদিন পূর্বে গিল্ড হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সভায় আয়ার্ল্যাণ্ডকে 'হোম রুল' প্রদানের বিরোধিতা করিয়া প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। কেমন করিয়া এই বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করা হইয়াছিল, সেইদিন সকাল হইতে পার্লামেণ্ট হাউসে মেম্বার ও দর্শকদের কি প্রকার ভিড় হইয়াছিল, বিলের কি রকম অভ্যর্থনা লাভ ঘটিয়াছিল, কিভাবে উহা অগ্রাহ্য হইয়াছিল, পার্লামেন্টের অধিবেশন কিভাবে ভাঙিল, সে সব ইতিহাসের কাহিনী, এই বিবৃতির পক্ষে তাহা অবান্তর। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন বিলটিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সমর্থন করিতে গিয়া ভুল করিয়াছিলেন, সেই বিষয়টিই আমার মনে সে সময়ে বিশেষ ছাপ আঁকিয়াছিল। তাঁহার বিরোধীরা বিদ্রূপের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "এরূপ নিরেট নির্বুদ্ধিতার কথা ইঁহার পূর্বে কি কোনও রাষ্ট্রনীতিবিদ্ উচ্চারণ করিয়াছেন? ন্যায়! সুবিচার! যেন একমাত্র ভাবাবেগ দিয়া পৃথিবী শাসিত হইতেছে। বিদেশী বেদখলকারীদের হাত হইতে যে সব দেশপ্রেমিক দেশকে মুক্ত করিতে চাহিতেছে তাহাদের হত্যাকাণ্ডের সমর্থনে অথবা নিরপরাধ শহরের উপর গোলাবর্ষণের সমর্থনে ওকালতি করিবার জন্য এ জাতীয় মহৎ নীতিকথা তুলিয়া রাখা উচিত ছিল।" এরকম ব্যাপক একটি নীতির ব্যাপারে—যেখানে স্বার্থপরতাকে প্রায় সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হইবে—সেখানে মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন আপন দেশের লোকের ন্যায় বিচার বিষয়ে একটু অতিবিশ্বাসী হইয়াছিলেন। ন্যায়ের পক্ষে অতি জোরালো যুক্তি থাকিলেও তাঁহার স্বদেশবাসীকে বুঝিতে তাঁহার ভুল হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এরূপ একটি জরুরি যুগান্তকারী বিষয়ে ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়প্রিয়তার উপরে যে গ্ল্যাডস্টোনের মত একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিলেন তাহাতে ইংরেজ জাতির গৌরবই সূচিত করে।

পূর্বদেশসমূহে এমন জিনিস অজ্ঞাত। আমাদের দেশে যখন সুখ-শান্তির যুগ ছিল, যখন অনেক বিষয়ে আমরা নৈতিক মানের উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলাম, এবং যে স্তরে ইউরোপীয়গণ এখনও উঠিতে পারে নাই, সেই যুগেও আমরা কখনও এরূপ আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার কথা চিন্তা করি নাই। চার হাজার বৎসর পূর্বে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে জেনিভা কন্‌ভেন্‌শনের ফলাফলকে শিশু বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু আমাদের দেশের নৃপতিগণ পররাজ্য হরণ করাকে কখনও পাপ বলিয়া গণ্য করিতেন না। অথবা পরাজিত জাতির জনগণের অবনত স্বাস্থ্য, শিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য বা নৈতিক মান উন্নত করিবার জন্য নির্দেশাদি পাঠাইয়া অথবা নূতন কোনও বিধান রচনা করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের সমান স্তরে উন্নীত করিবার প্রয়োজনবোধ করেন নাই। যুদ্ধ করিয়া দিগ্বিজয় করাতে ধর্মের অনুমোদন ছিল, এবং এখানেই সব শেষ। বিজয়ীর আর কোনও কর্তব্য নাই। একমাত্র ইংরেজ জাতির বিধানসমূহ হইতেই আমরা নীতির দিক হইতে

আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি সমালোচনা করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু আমরা সব বিষয়েই চরমে গিয়া উপস্থিত হই। নিজেরা দুর্বল এবং ক্ষমতাহীন, তাই আমরা বিবেচনাহীনভাবে শক্তিশালী জাতির ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করি। মানুষের চরিত্র স্বভাবতঃই অসম্পূর্ণ, সেজন্য তাহাকে আমরা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা আশা করি ইংরেজ সর্বদা ন্যায়সংগত কাজ করিতে বাধ্য। আমরা আমাদের স্বর্গবাসী দেবতাদের নিকট হইতে যতটুকু প্রত্যাশা করি, ইহা তাহা অপেক্ষা বেশি। সমুদ্র মন্থনের কথা স্মরণ করুন। সেখানে দেবতা ও অসুরদের মিলিত শ্রমে যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহা হইতে অসুরদিগকে প্রতারণা পূর্বক দেবতারা বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বর্তমানের যে-কোনও আইনজীবী বলিবেন, আইনতঃ এবং ধর্মতঃ তাহার অংশ অসুরদিগের প্রাপ্য। অথবা স্মরণ করুন দ্রৌপদীর রূপমুগ্ধ দেবতারা তাঁহার উপর কি শঠতার খেলাই না খেলিয়াছিলেন, যদিও তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। আমি যদি ইংরেজ হইতাম, তাহা হইলে ঈজিপট ও অন্যান্য স্থানে ইংরেজদের কার্যাবলীর সমালোচনা করিয়া তাহাদের শিরে যে তিরস্কার বর্ষিত হইতেছে, তাহাতে আমি গর্ববোধ করিতাম। আমি ইহাকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন বলিয়া মনে করিতাম। প্রাচ্যদেশবাসীরা ইংরেজ চরিত্রকে মনে মনে তাহাদের নিজেদের দেবতাদের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানে। অন্যায় কোনও কাজকেই আমি সমর্থন করি না, পৃথিবীটা যেমন, তেমনিভাবেই তাহাকে মানিয়া লই, এবং নিজেদের স্বার্থে এমন অবস্থায় পড়িলে কতখানি ন্যায়ের পথ হইতে আমরা সরিয়া যাইতাম, সেকথা ভাবিতে চেষ্টা করি। জাতীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমালোচনা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু তাহা বুদ্ধিমানের সমালোচনা হওয়া চাই।

আমার মতে, আমাদের দেশে যাকে বলা হয় পবিত্রভাবে অন্যায় করা, এমন কি সেদিক দিয়া বিচার করিলেও ইংরেজ জাতিকে প্রশংসা করিতে হয়, কারণ ইহাতে প্রমাণ হয়, দেশে অনেক সুচিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে এরূপ কাজ করিতে হইলে ধাপ্পা দিবার এবং প্রতারিত করিবার প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে এই দল সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং প্রতি বৎসরই ইহার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা না হইলে দাসত্বপ্রথা দূর হইত না, ক্যাথলিকদের অক্ষমতা দূর হইত না, আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ তাহার জন্য ব্যবস্থিত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না, অথবা অ্যালাবামার সমস্যাও বিনাযুদ্ধে মিটিত না। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন এই দলকেই আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু হয় তিনি ইহার ক্ষমতাকে বাড়াইয়া দেখিয়াছিলেন, অথবা তিনি বেশি দাবি করিয়া বসিয়াছিলেন। কারণ আয়ার্ল্যাণ্ড সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এই চরম আত্মত্যাগ ইংল্যাণ্ডের নিকট হইতে আশা করা চলে না, যদিও মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের বিলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু ভুল বোঝার ফলেই এই বিরোধিতা। ইংল্যাণ্ডের এত কাছে একটি বিচ্ছিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের অর্থ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস। কিন্তু মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন তাঁর বিলে এই বিচ্ছিন্নতা কখনও চাহেন নাই।

মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন যে নীতিকে সমর্থন করিতেছিলেন তাহার প্রধান শক্তি ব্রিটিশ স্বার্থের ভিত্তিতেই রচিত হইয়াছিল। এবং সে নীতির মধ্যে যেটুকু ন্যায়নিষ্ঠার কথা ছিল তাহা ছিল নিতান্তই দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবেচনা। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন প্রথমটির উপরে বেশি জোর না দিয়া দ্বিতীয়টির উপর অতি বেশি জোর দিয়াছিলেন, সেই জন্যই তা ব্যর্থ হইল। বাহিরের কোনো দর্শক যদি সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন, গ্ল্যাডস্টোন খুব সহজেই বিরোধীদের উত্তেজনা প্রশমিত করিতে পারিতেন, এবং সম্মানের সঙ্গে, আরও প্রবল ভাবে, এবং সাফল্যের অধিকতর সম্ভাবনার সঙ্গে, তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে যে তাঁহার আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পর্ক ছিন্ন করার উদ্দেশ্য নাই, আয়ার্ল্যাণ্ডকে শান্ত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য এবং দুই দেশের মধ্যে সহৃদয়তার বন্ধনই পরিকল্পিত, তাহা দেখাইয়া দিতে পারিতেন। যে কোনও উপায়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য এবং সাধারণভাবে সকল মানুষের মঙ্গলের জন্য ঐ লক্ষ্যে পৌঁছান দরকার মনে করি, কারণ এই বিরাট শক্তি—যে শক্তি পৃথিবীর চারিদিকে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছে, তাহা ধ্বংস হইলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হইবে, এবং রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসে যে বিপৎপাত ঘটিয়াছিল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি বিপৎপাত ঘটিবে, এমন কি সভ্যতাকেই ইহা কয়েক শতাব্দী পিছাইয়া দিবে। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন ও তাঁহার পার্টি পরে তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দেশ জুড়িয়া "আয়ার্ল্যাণ্ড গেল গেল" কোলাহলে "কাগজে বর্ণিত ইউনিয়ন"-এর কথা কোথায় ডুবিয়া গেল। আয়ার্ল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ইউনিয়ন আছে কি?—কখনও ছিল কি? না, ছিল না। আয়ার্ল্যাণ্ডকে সব সময়ে পরাজিত এবং অধিকৃত দেশরূপে গণ্য করা হইয়াছে। তাহার নিজস্ব একটি পার্লামেন্ট ছিল কিন্তু তাহার কোনো স্বতন্ত্র ক্ষমতা ছিল না। মাত্র সতের বৎসরের (১৭৮৩—১৮০০) জন্য ছিল। সে সময়ে '২৩-জর্জ ৩, অধ্যায় ২৮' দ্বারা আইন ও বিচার বিভাগীয় পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহের ফলে সে সময়টা ছিল অব্যবস্থিত, অতএব এই লব্ধ ক্ষমতার পরীক্ষা চালাইয়া যাওয়া সম্ভব হইল না। দেশে বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল, কখনও তাহা প্রকাশ্যে, কখনও গোপনভাবে। সাতশত বৎসর পূর্বে চতুর্থ পোপ অ্যাড্রিয়ান ঐ দেশের জমি অ্যাংলো-নরম্যানদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবার অধিকার দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই আয়ার্ল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের যখনই ঘরে বা বাইরে কোনও সঙ্কট দেখা দিয়াছে তাহার সুযোগ লইতে ছাড়ে নাই। ইংল্যাণ্ড যতকাল প্রথম শ্রেণীর সামরিক শক্তিরূপে গণ্য ছিল, ততদিন আয়ার্ল্যাণ্ডের আভ্যন্তরীণ অশান্তি অগ্রাহ্য করা চলিত, কিন্তু যুদ্ধশক্তিতে ইউরোপের দেশগুলি ইংল্যাণ্ডকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে, সে এখন আর আয়ার্ল্যাণ্ডকে বর্তমান অবস্থায় থাকিতে দিতে পারে না। আয়ার্ল্যাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করিতেই হইবে। ইহার জন্য মাত্র দুইটি পথ উন্মুক্ত আছে। তাহার একটি হইতেছে মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বন্ধুত্বের পথে অগ্রসর হওয়া। আর অন্যটি হইতেছে জার্মানরা

পরাজিত আলসাস প্রদেশের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিতেছে সেইরূপ করা। অর্থাৎ আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদিগকে আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেশটি ইংরেজের দ্বারা ভরিয়া তোলা। কিন্তু এরূপ একটি চরমপন্থা গ্রহণ করিবার পূর্বে আইরিশদিগকে রাষ্ট্রে শান্তিপ্রিয় অধিবাসীরূপে টিকিয়া থাকিবার সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি তাহারা এ সুযোগের অপব্যবহার করে তাহা হইলে সমস্ত জগৎ তাহাদিগকে ধিক্কার দিবে এবং তখন ইংল্যাণ্ড তাহার আত্মরক্ষার জন্য যদি অশান্ত লোকদের সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে তাহা হইলে সে সকলের সমর্থন পাইবে। প্রথমতঃ ইংল্যাণ্ড যথেষ্ট প্রবল সুতরাং ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার সে করিতে পারে। আর যদি দেখা যায় তাহা ব্যর্থ হইল, তখন সে তাহাদের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করিতে পারে। তৃতীয় পথ, আধা-অনিচ্ছাজাত বলপ্রয়োগ, এবং ভূমিসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে অসম্পূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন, কিন্তু ইহা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর এবং অকারণ সময় নষ্ট। শেষ পর্যন্ত ইহাতে কোনও ফল লাভ হয় না। আয়ার্ল্যাণ্ডের সম্পর্কে যে বিতর্ক চলিতেছে তাহা ভারতবাসীরা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছে। কারণ, তাহারা জানে এমন দিন আসিতেছে—এবং সে দিন যত দূরেই থাক—ইংল্যাণ্ডকে আরও বৃহৎ হোম রুল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে;—এবং সেটি ভারতের জন্য হোম রুল। ইংল্যাণ্ডের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়া কোনও ভারতীয়েরই কাম্য নহে, ভারতীয়ের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ব্রিটিশ কলোনির সুবিধাগুলি ভোগ করা। তাহারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের জাতীয়করণ চাহে।

একজন ভারতীয়ের চোখে ইংল্যাণ্ডের মাটিতে বসিয়া এখানকার এই রাজনৈতিক তৎপরতা, কর্মব্যস্ততা ও উত্তেজনা দর্শন করা একটি অভিনব ঘটনা। পূর্ব দেশসমূহে কমন্‌ওয়েলথ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে রাজব্যক্তিত্বই একমাত্র নীতিনির্দেশরূপে গণ্য। দেশের মালিক রাজা, তিনি তাঁহার খুশিমত দেশটিকে বিক্রয় করিতে পারেন, কাউকে বিলাইয়া দিতে পারেন, দেশের ভাগ্য লইয়া জুয়া খেলিতে পারেন। ভারতের যখন সুদিন ছিল, এরকম ঘটনা তখন ঘটিয়াছে, এবং তখন লোকেরা পৌরুষ দেখাইয়া তাহারা প্রতিবাদ জানায় নাই, তাহার পরিবর্তে তাহারা ঘরে বসিয়া নিজের মাথার চুল ছিঁড়িয়াছে এবং স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়াছে। ইংল্যাণ্ডের লোকের আচরণ অন্য জাতীয়। সেখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি রাষ্ট্রশক্তির এক একটি অঙ্গ এবং অংশ। তাহারা নিজেদের মূল্য জানে, দায়িত্ব বোঝে, এবং তাহারা বিশ্বাসভাজন। আয়ার্ল্যাণ্ডের হোম রুলের বিষয়ে যখন বিতর্ক চরমে উঠিয়াছিল তখন জনসাধারণ যে সম্মানজনক ব্যবহার করিয়াছিল তাহা অবশ্যই ভারতীয়দের পক্ষে আনন্দদায়ক। থিয়েটারে, রেলগাড়িতে, ওমনিবাসে এবং অন্যান্য সমস্ত স্থানে আলোচনার বিষয় গ্ল্যাডস্টোন, হোম রুল, ইউনিয়ন ও সেপারেশন। সেপারেশন সর্বনাশ, আয়ার্ল্যাণ্ড পৃথক হইয়া যাইবে? ফ্যাশানেবল জেনটলম্যানগণ তাঁহাদের ক্লাবে, বণিকেরা তাঁহাদের অফিসঘরে, যন্ত্রশিল্পীরা তাঁহাদের কারখানা ঘরে, ক্যাবচালকেরা ক্যাবে বসিয়া, রেস্টোরান্টে পরিবেশক পরিবেশিকাগণ ও রেস্টোরান্টের গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকেরা

পানালয়ে বসিয়া, রেলওয়ে পোর্টারগণ, খবরের কাগজের বিক্রেতাগণ প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি লইয়া সব সময় আলোচনা করিতেছে। লণ্ডনে একটি লোককেও দেখিলাম না যে গ্ল্যাডস্টোনকে সমর্থন করে। তাঁহার অনুগামীগণ, মফস্বলবাসীগণ, বিশেষ করিয়া স্কটল্যাণ্ডবাসীরা। মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের সম্পর্কে এ পর্যন্ত যাহা শোনা গেল তাহার অর্ধেকও যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে মনে হইবে তাঁহার অপেক্ষা বড় প্রতারক পৃথিবীতে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে তাঁহার যাহারা সমর্থক তাহারা গ্ল্যাডস্টোনকে প্রায় দেবতা মনে করে। একদিন আমি এক খণ্ড পেলমেল গেজেট কিনিয়াছিলাম সাউথ কেনসিংটন রেলওয়ে স্টেশনে। সেখানে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল, সে আমার হাতে কাগজ দেখিয়াই মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনকে অকথ্য ভাষায় গাল পাড়িতে লাগিল। সে যাহা সব বলিয়াছিল, তাহার ভিতরের একটি কথা—মিস্টার গ্ল্যাডস্টোন "বুড়ী ধোপানী"। ইহা শুনিয়া একজন বলিল, "তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে তাঁহার হাত দুটি নিষ্কলঙ্ক আছে।" দলগত সূক্ষ্ম রাজনীতিতে এখনও আমরা অভ্যস্ত নহি, সেজন্য মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের বিল উপলক্ষে দেশের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা গেল, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অবশ্য এই উত্তাপ যাইবে, আয়ার্ল্যাণ্ড হোম রুল পাইবে, এবং দুই দেশের সংযুক্তি কাগজেই আবদ্ধ থাকিবে না, হৃদয়েরও মিলন ঘটিবে, এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা এই উন্মাদনার যুগ স্মরণ করিয়া তখন হাসিবে। ১৭৮০ সনে গ্রাট্রান বলিয়াছিলেন—(গ্রাট্রান আইরিশ আইনজীবী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ) "আমি আর কিছুই চাহি না, আমি আমার স্বদেশীদের সঙ্গে শুধু স্বাধীনতার হাওয়া নিশ্বাসে টানিতে চাহি। তোমাদের শৃঙ্খল ভাঙা ও তোমাদের গৌরব চিন্তা করার বাহিরে আমার কোনও উচ্চাকাঙ্খা নাই। যতদিন পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ডের দীনতা কুটিরবাসীর ছিন্নবস্ত্রে ব্রিটিশ শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্ করিতে থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত আমি সন্তুষ্ট থাকিব না। সে বিবস্ত্র থাকিতে পারে, কিন্তু সে শৃঙ্খলিত থাকিবে না। আমি দেখিতেছি সময় আসিয়া গিয়াছে, প্রাণ জাগিয়া উঠিয়াছে, ঘোষণার বীজ বপন করা হইয়াছে; এবং যদিও উচ্চস্তরের ব্যক্তিগণ মত পরিবর্তন করেন, উদ্দেশ্য টিকিয়া থাকিবে, এবং সাধারণ্যে ভাষণদানকারী বক্তার (গ্রাট্রান নিজে আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন) মৃত্যু হইলেও তিনি যে অনির্বাণ অগ্নিশিখা বহন করিতেছিলেন তাহা বাহককে অতিক্রম করিয়া জ্বলিতে থাকিবে, এবং স্বাধীনতার নিশ্বাস পুণ্যাত্মাদের বাণীর মতই তাঁহাদের মৃত্যুর সঙ্গে থামিবে না।" মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনও এখন এই জাতীয় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন।

আমাদের লণ্ডন পৌঁছিবার পরেই আমরা নিহিলিস্টদের একটি সভা লণ্ডনে হইতেছে এই মর্মে একটি সংবাদ পড়িয়াছিলাম। (ইহারা নাস্তিবাদী)। একজন ভারতীয়ের পক্ষে একজন জীবন্ত নিহিলিস্টকে দেখা কৌতূহলোদ্দীপক। সভা যেখানে হইতেছিল সেখানে আমি গিয়াছিলাম। কিন্তু আমি পৌঁছিবার পূর্বেই সভার কাজ শেষ হইয়া গিয়াছিল। নিহিলবাদ কি বস্তু সে বিষয়ে আমার মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই। তাহারা কি চাহে তাহাও জানি না। অতএব তাহারা বিপথগামী একদল উগ্রপন্থী, অথবা মানবকল্যাণকামী

কোনও দল, যাহারা অন্যায়ভাবে তাহাদের সময়ের বহু পূর্বেই আর্বির্ভূত হইয়াছে তাহা বলিতে পারিলাম না। যাহাই হউক, এরূপ দৃঢ়নিষ্ঠ উদাসীন মানবযূথ পৃথিবীতে সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। লোকে আত্মবিসর্জন দেয় বিশেষ একটা উদ্দেশ্য লইয়া। কেহ স্বর্গ কামনায় অবর্ণনীয় দুঃখ বরণ করিয়া মারা যায়। তাহার মৃত্যুর প্রেরণা যোগায় স্বর্গ। তাহার ধারণা মৃত্যুর পর তাহার আত্মা স্বর্গে উড়িয়া যাইবে। গাজি মুসলমানরা স্বর্গে সুন্দরী হুরি, অমৃতের স্ফটিক ঝর্ণা ও অন্যান্য নানা সুখ লাভের উদ্দেশ্যে মৃত্যু বরণ করে। হিন্দু নারী নিজেকে পুড়াইয়া মারে পরজীবনে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া। দেশপ্রেমী এবং যোদ্ধা মৃত্যু বরণ করে দেশের জন্য, ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়া এবং যে কারণের জন্য মৃত্যু বরণ করিতেছে তাহা ন্যায়সঙ্গত এই ধারণা হইয়া। কিন্তু নিহিলিস্টের মনে কোন্ আশা? পুরুষ অথবা নারী সকলেই আত্মা অথবা ঈশ্বর এবং ভবিষ্যৎ জগৎ বিষয়ে বিশ্বাসহীন। নিহিলিস্ট পুরুষ অথবা নারী (নারীর সংখ্যাই বেশি) আত্মোৎসর্গ করে একটি অলীক ধারণার বশবর্তী হইয়া। খুবই দুঃখের বিষয় যে, ইহাদের আত্মোৎসর্গ নিরপরাধের রক্তে কলঙ্কিত। একটি ধারণার জন্য লড়াই করা অথবা প্রাণ দেওয়া ভারতীয় মনের পক্ষে কল্পনাতীত। কিন্তু এ ব্যাপার ইউরোপে প্রায় সর্বজনীন, সেখানে কোনও একটি নীতির জন্য মানুষ প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করিতে সর্বদা প্রস্তুত। একটি বালকের সম্পর্কে একটি ঘটনার কথা বলি। সে যেভাবে আহত হইয়াছিল, তাহা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। সে কিভাবে চোখের পাশে ক্ষতচিহ্ন আঁকিল জিজ্ঞাসা করাতে বলিল, অন্য একটি ছেলের সঙ্গে তাহার লড়াই হইয়াছে। সে বলিয়াছিল "তোর বোনের চোখ টেরা।" তাই তাহাকে আমি আক্রমণ করিয়াছিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সত্যই কি তোমার বোনের চোখ টেরা? সে বলিল, না, না, আমার কোনও বোনই নাই। তাহা হইলে লড়াই করিতে গেলে কেন? সে বলিল, আমি নীতির জন্য লড়াই করিয়াছি। বোন থাকুক বা না থাকুক সে কেন বলিবে যে তোর বোনের চোখ টেরা?—লড়াই করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি বটে!

৪

১৮৮৬ সনের ৪ঠা মে তারিখে ব্রিটিশ কলোনি সমূহের ও ভারতের প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল। সেদিন সকালবেলাটি ছিল ভারী চমৎকার—'রানীর আবহাওয়া' বলে ইংল্যাণ্ডের লোকেরা। সেইদিন আমাদের প্রিয় সম্রাজ্ঞীকে দর্শন করিলাম। ব্রিটিশ প্রজামাত্রেই সম্রাজ্ঞী দর্শনকে মহা গৌরবজনক মনে করিয়া থাকে। সম্রাজ্ঞীমাতার আমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত সন্তানই ত বটে। উপস্থিত নানাদেশের সবাই তাঁহার সহিত একে এতে পরিচিত হইয়া সরিয়া যাইতেছেন, তাঁহার মুখে সন্তোষের চিহ্ন, আমাদের প্রতি বিশেষভাবে তাঁহার সন্তোষপূর্ণ দৃষ্টি। আমাদের কারুশিল্পীগণ তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার সময় যে দৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা সবারই অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। আমাদের দেশের নানা প্রদেশের কারুশিল্পীরা ছিলেন—পেশাওয়ারের, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার, তুষারাবৃত ভুটানের এবং কুমারিকা অন্তরীপের।

বেলা সাড়ে এগারোটার সময় যুবরাজ (তিনি প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌-ও), প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর অভ ওয়েল্‌স্‌ (ভিক্টোরিয়ার স্বামী) এবং রাজকুমারী লুইস, ভিক্টোরিয়া এবং মড সহ লাইফ গার্ডের রক্ষণাধীন প্রদর্শনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজপরিবারের অন্য যাঁহারা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যথাক্রমে—ক্রাউন প্রিন্সেস অভ জার্মানী, ডাচেস অভ এডিনবরো, ডিউক ও ডাচেস অভ কনট, শ্লেজবিগ হোলস্টাইনের প্রিন্স ও প্রিন্সেস ক্রিয়ান, লরনের প্রিন্সেস লুইস ও মার্শোনেস, লরনের মারকুইস, বার্টেনবের্গের প্রিন্সেস বিয়াট্রিস ও প্রিন্স হেনরি, ডিউক অভ ক্যামব্রিজ, প্রিন্সেস মেরি অ্যাডেলেড, ডিউক অভ টেক, প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া টেক, হানোভারের প্রিন্সেস ফ্রেডেরিকা, ব্যারন ফন পাবেল রামিংগেন, ওল্ডেনকুর্গের লাইনিংগেনের প্রিন্স ও প্রিন্সেস, সাক্স-ভাইমারের প্রিন্সেস এডওয়ার্ড, হোহেনলোহে-লাংগেনবুর্গের প্রিন্স ও প্রিন্সেস ভিক্টর এবং কাউন্টেস থেয়োডোরে গ্লাইখেন। প্রায় ১২টার সময় রাজকীয় ট্রাম্পেটবাদকেরা ট্রাম্পেট ধ্বনি করিয়া রাজ্ঞীর আগমনবার্তা ঘোষণা করিল। সম্রাজ্ঞী সাধারণ কালো রঙের পোষাক পরিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও রাজচিহ্ন ছিল না। তাঁর চলনভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে জানিবার উপায় ছিল না যে সম্মুখে বিরাট ভারত সম্রাজ্ঞী উপস্থিত। তিনি প্রথমে সবার প্রতি সৌজন্য প্রকাশ করিলেন, পরে আত্মীয়দের চুম্বন করিলেন। অতঃপর প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌ কর্তৃক ভারতের উপনিবেশগুলির প্রতিনিধিদের সহিত একবারে পরিচিত হইলেন। এই অনুষ্ঠানের পর আমাদিগকে প্রদর্শনীর অন্য একটি অংশে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে ভারতীয়গণ সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে একটি ভাষণ উপহার দিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে বিরাট একটি রাজকীয় প্রোসেশন গঠিত হইল।

এই প্রোসেশন প্রদর্শনীর প্রধান প্রবেশ-পথ হইতে ঢাকা বারান্দা পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই পথে ভারতীয় নানা জাতীয় সৈন্যদের মৃন্ময় মডেল মূর্তি সারিবদ্ধ অবস্থায় সাজান ছিল। খোদাই করা দারুশিল্প-গঠিত ছাতের নিম্নপথে যাইবার সময় দেখা গেল সেখানে 'যতোধর্মস্ততোজয়ঃ' ইংরেজীতে খোদাই করা রহিয়াছে—'Where Virtue is, there is Victory'। ইহার পর ভারতীয় অঙ্গনে প্রবেশ করা গেল। ওস্তাদ কারু শিল্পীদের দ্বারা চমৎকার সাজান অঙ্গনটি। অবশেষে প্রোসেশন "ভারতীয় প্রাসাদে" গিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইখানে প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ আমাদিগকে একে একে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। যে সব ভারতীয় শিল্পী আমাদের বিপরীত দিকে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদিগকে "রাম-রাম" বলিয়া অভিবাদন করিতে শেখান হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান ছিল, তাহারা "রাম-রাম" বলিল বটে, কিন্তু অভ্যাস না থাকাতে "রাম-রাম" এর সঙ্গে "আল-আহমদ-উল-ইল্লা" জুড়িয়া উচ্চারণ করিল। তাহারা ক্রমাগত বলিতে লাগিল "রাম-রাম, আল-আহমদ-উল-ইল্লা—রাম-রাম, আল-আহমদ-উল-ইল্লা।" এই পর্ব শেষ হইলে অভিভাষণ পাঠ করা হইল, তাহার পর প্রোসেশন চলিতে লাগিল। ইহার পর আমাদের কর্তব্য কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। আমরা অতঃপর অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার অঙ্গন পার হইয়া গেলাম, এবং অ্যালবার্ট হলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা ঠেলিয়া ঠুলিয়া অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় সার কান্‌লিফ-ওয়েন উদ্বেগের সঙ্গে আমাদের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "আপনারা এ কি করিতেছেন?" তখন আমাদের খেয়াল হইল আমরা ভুল করিয়াছি। এখানে অভিভাষণ পাঠ শেষ হইলে আমরা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে রাজপরিবারকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমরা তাঁহাকে বিভ্রান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা কি করিয়া যাইব?" তিনি বলিলেন "না, যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকুন।" আমরা আমাদের ভুলের জন্য খুবই দুঃখ প্রকাশ করিলাম, কিন্তু তখন যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এবং ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিলেও তখন তাহা আর পারিতাম না, কারণ পিছনের ভিড় তখন দুর্ভেদ্য। অতএব যেখানে ছিলাম, সেখানেই রহিয়া গেলাম। প্রদর্শনীর উদ্বোধন-অনুষ্ঠান যেখানে সম্পন্ন হইল সেই রয়্যাল অ্যালবার্ট হলটি বিরাট আকারের এবং চক্রাকার। উপরে কাঁচের গম্বুজ, এবং হলে দশ হাজার লোক ধরে। ১৮৬৮-৭১ সনে এই হলটি এক কম্পানি কর্তৃক নির্মিত হয়, নির্মাণে দুলক্ষ পাউন্ড ব্যয় হইয়াছিল। হলের প্রত্যেকটি ইঞ্চি দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, এবং আমি সাধারণ দর্শকের স্থানে যেখানে দাঁড়াইবার জায়গা পাইয়াছিলাম, সে জায়গাটি অনুষ্ঠানের বিপরীত দিক। যেখান হইতে সম্মুখে অর্ধচক্রাকার শুধু দর্শকদের মাথা দেখিতে পাইতেছিলাম। রাজাসন ছিল উচ্চ ভূমিতে ডেইসের উপরে, তাহার সম্মুখে সম্রাজ্ঞী বসিলেন, তাঁহার দক্ষিণ দিকে রহিলেন প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্, এবং পরিবারের অন্যান্যরা দুই দিকেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর যাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহারাও প্রোসেশন অ্যালবার্ট হলে পৌঁছিলে ইংরেজীতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হইল।

গাহিলেন রয়্যাল অ্যালবার্ট হল কোর‍্যাল সোসাইটি। সম্রাজ্ঞী ডেইসে পৌঁছিলে দ্বিতীয় গানটি সংস্কৃতে গাওয়া হইল। সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন অধ্যাপক ম্যাকস-ম্যুলার। অনুবাদটি এইরূপ—

রাজ্ঞীং প্রসাদিনীং লোক-প্রণাদিনীং পাহীশ্বর।
The Queen, the gracious, world renowned,
Save, O Lord!
লক্ষ্মী-প্রভাসিনীং শত্রুপহাসিনীং,
তাং দীর্ঘশাসিনীম্; পাহীশ্বর!
In vrictory brilliant, at enemies
smiling, her long ruling
Save, O lord!
এহি অস্মদীশ্বর, শত্রূন্ প্রতিশ্চির,
উচ্ছিন্দ্ধি তান্।
Approach, O our Lord, enemies
scatter annihilating them!
তচ্ছদ্ম নাশ্য মায়াশ্চ পাশয়
পাহস্মদাশ্রয় সর্বান্ গণান্।
Their fraud confound,
tricks restrain. Protect,
O, thou our Refuge, all people!
তদ্‌রত্ন-ভূষিতাং, রাজ্যে চিরোশিতাং পাহীশ্বর!
With thy choice gifts adorned,
in the kingdom long-dwelling. Save,
O, Lord!
রাজ্য-প্রপালিনীং সদ্ধর্মশালিনীং
তাং স্তোত্রমালিনীং পাহীশ্বর!
Her, the rea'm-protecting, by good laws
abiding, her with praise wreathed,
Save, O lord!

এই দ্বিতীয় সঙ্গীত আমরা সংস্কৃতে গাহিবার পর তৃতীয় সঙ্গীত ইংরেজীতে গাওয়া হইল। প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ ইহার পর সম্রাজ্ঞীর উদ্দেশে একটি ভাষণ পাঠ করিলেন এবং প্রদর্শনীর একটি ক্যাটালগ তাঁহাকে উপহার দিলেন। সম্রাজ্ঞী ভাষণের উত্তরে কিছু বলিলেন এবং লর্ড চেম্বারলেনকে 'প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইল' এই ঘোষণা করিতে আদেশ দিলেন।

তাহা শেষ হইলে সর্বসাধারণের কাছে তাহা সম্রাজ্ঞীর ট্রাম্পেট বাদকগণ বাজনার সাহায্যে জানাইয়া দিল। এই সঙ্গে হাইড পার্কে তোপধ্বনির দ্বারা সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদন জানান হইল।

এই প্রদর্শনীর মধ্যে ভারতীয় বিভাগটিই অন্য সব অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। ঢাকা বারান্দার পথে প্রধান প্রবেশমুখে দর্শকেরা ভারতীয় সমারিক জাতিগুলির মডেল দেখিবেন। প্রাচ্যদেশে ইহারাই ইংল্যাণ্ডের শক্তি অক্ষয় রাখিয়াছে। অতঃপর যেখানে বহুমূল্য হীরা, জহরত ও সোনা ও রূপার প্লেটের এবং কারুকার্যখচিত দস্তা ও তামার পাত্রগুলি, সেই বিভাগ দেখিবেন। আরও দেখিবেন সূক্ষ্ম কাজের দারুশিল্প, ধাতুর উপর মিনার কাজ, পাথর ও কাঠের মধ্যে নক্সা যুক্ত কাজ, চুনি পান্না ও সোনার রং যুক্ত ল্যাকার বার্নিশের কাজ, নিপুণ হাতের বোনা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য বহুপ্রকার শিল্পদ্রব্য, স্মরণাতীতকাল হইতে যাহা পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে। ভারতীয় শিল্প-ঐশ্বর্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহারা তাঁহাদের দক্ষিণ দিকে চাহিয়া দেখিবেন বিরাট ভিড় জমিয়াছে ভারতের অরণ্য জীবনের একটুখানি বেশি উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা ছবির দিকে। অল্প পরিসরের মধ্যেই একটি খাড়া উঁচুনিচু পাহাড়ের অংশ আঁকা হইয়াছে, তাহা উঁচু গাছ ও ঝোপঝাড়ে চারিদিক বেষ্টিত। বাঁশ ও খেজুর গাছও চারিদিকে কাটা ডালের গোড়া সমেত তাহাদের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এবং হিমালয়ের পাদদেশে যে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে তাহা এবং অন্যান্য স্থানীয় বহু জিনিস তাহাতে আঁকা আছে। ভারতের সুখকর এই শিকারক্ষেত্রটি শিকারযোগ্য প্রাণীতে ভরা। যাঁহারা ভারতে থাকিয়া এতকালে তরাই-এর জঙ্গলীজ্বর ও অন্যান্য বহু বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া এই সব স্থানে শিকার করিয়াছেন তাঁহাদের মনে সেদিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠাতে তাঁহারা এ ছবি দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। ছবির একদিকে বিরাট-দেহ হাতী শুঁড় উচ্চে তুলিয়া, মুখ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, যেন যে রয়্যাল টাইগারটি তাহার মাথায় থাবা বিঁধাইয়া দিয়াছে তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে না পারিয়া বেদনায় কাঁদিতেছে। বাঘের থাবার স্থান হইতে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়া নিচের হলুদ ঘাসকে ছোপ ছোপ রাঙাইয়া তুলিয়াছে। হাতীর ভয়ার্ত চিৎকার এবং বাঘের ক্রুদ্ধ চাপা গর্জনে ভীত হইয়া একদল হরিণ নিশ্চিন্ত তৃণভোজন ফেলিয়া বিপরীত দিকে ছুটিয়া চলিতেছে। উহাদের ভিতরের একটি সাহসী অ্যান্টলার মাথা হরিণ দূরে গিয়া ঘাড় ফিরাইয়া কৌতূহলবশতঃ চাহিয়া দেখিতেছে ব্যাপারটা কি। একটি গাছের মাথায় একদল ভীত বানর পাতার আড়ালে লুকাইয়াছে, তাহাদের বাচ্চারা গর্জন শুনিয়া মায়েদের বুকে সংলগ্ন হইয়া আছে। ময়ূরের দল সবুজ ঘাসের আড়ালে আশ্রয় লইয়াছে, কিন্তু অভিজ্ঞ শকুন ভবিষ্যৎ ভোজের আশায় খুশি হইয়া আকাশে উড়িতেছে। দৃশ্যের আর এক ভাগে বেঙ্গল টাইগার ঘাসের আড়ালে নিশ্চিন্তে চরা পশুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ওৎ পাতিয়া আছে। জঙ্গলের দৃশ্যে কিছু বাড়াবাড়ি থাকিলেও মোটের উপর উহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। চিত্রকরকে অল্প জায়গায় সব দেখাইতে হইয়াছে, সেজন্য কিছু আতিশয্য হইয়াছে সন্দেহ নাই।

দর্শকদের বাম দিকে ভারতীয় অর্থনীতি বিভাগের অঙ্গন। এইখানে নানা আদিবাসীদের মডেল ভারতীয় উৎপন্ন শিল্পাদির মাঝে মাঝে স্থাপন করা হইয়াছে। বেঁটেখাটো আন্দামানবাসী স্ত্রীলোককে দেখা যাইতেছে, কড়ি ও গাছের পাতায় দেহ সজ্জিত, তাহার ঘন কৃষ্ণ বক্ষে একটি নরকপাল দুলিতেছে। এটি কোনও নিকট আত্মীয়ের হইবে। তাহার স্বামী তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার চুল আধুনিক ফ্যাশানে কোঁকড়ান। যাহার চেহারা হইতে এই মডেলটি প্রস্তুত সে অবশ্যই তাহাদের সমাজের একজন বিলাসী লোক। আন্দামানীরা নেগ্রিটো বংশোদ্ভূত, ইহারা নিকটস্থ নিকোবর দ্বীপের লোকদের মত নহে, তাহাদের মধ্যে মালয় উপাদানের আধিক্য বেশি। বেশ কিছু মঙ্গোল শোণিতও তাহাদের মধ্যে মিশিয়াছে। দর্শকেবা এখান হইতে অগ্রসর হইয়া গেলে দেখিতে পাইবেন ক্রমেই মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য অধিকতর প্রকট। যখন দর্শকগণ আরও একটু সরিয়া যাইবেন, সেখানে ইরাবতী ব-দ্বীপের বর্মী এবং পাহাড় অঞ্চলের কারেনদের দেখিতে পাইবেন। নৃতাত্ত্বিক মডেলগুলি অনুসরণ করিয়া ভারতীয় উত্তর-পূর্ব সীমান্তের লোকদের দেখিবেন, তাহারা সবাই মঙ্গোলীয় জাতির মানুষ। সেখানে কটারঙের সিনফো দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় ভাঁজে ভাঁজে পাকান বেতের টুপি, হাতে তাহার চিরসঙ্গী 'দাও'। এরই সাহায্যে সে লড়াই করে, পরাজিত শত্রুর মুণ্ডটি কাটিয়া ফেলে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, পাহাড়ে শষ্যক্ষেতে ব্যবহার করে, এবং ঘরের যাবতীয় কাজ করে। তাহার পরে গর্বিতভঙ্গিতে দণ্ডায়মান নাগা, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে, রং করা মানুষের চুল ও ছাগলোম তাহার বুকে ঝুলিতেছে, এক হাতে কারুকার্য করা দীর্ঘ বর্শা, অন্য হাতে বাঘের চামড়ার ঢাল, যৌবনকালে প্রথম শিকারের পারিতোষিক। মানুষের চুল ও ছাগলোমের মালা হইতে জানা যাইতেছে এই পুবস্কার সে তাহার জাতির নিকট হইতে তাহাদের শত্রুদের মুণ্ডু-শিকারের বীরত্বের জন্য লাভ করিয়াছে। এটি বিশেষ সম্মানের চিহ্ন, বীর ভিন্ন ইহা অন্য কেহ লাভ করিতে পারে না। মোটের উপর নাগারা বর্বর। এই জন্যই তাহাদের সম্মানচিহ্ন এমন স্থূল ও আদিযুগের উপযোগী। সভ্যতা প্রাপ্ত হইলে রিবন এবং তারকা শোভা পাইত। তাহার এই খ্যাতি তাহার মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ। যে 'বীর' নির্মমভাবে নরনারীশিশুদের হত্যা করিয়াছে, দুর্বল প্রতিবেশীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, এবং তাহার চলার পথে শুধু মৃত্যু এবং ধ্বংস অনুসরণ করিয়াছে তাহার গাথা কোনও কবি গাহিবে না। নিজের লোকদের পাইকেরি হিসাবে জবাই করার কথাও কোনও নাগা ঐতিহাসিক সপ্রসংশ ভাষায় লিখিবে না। কোনও নীতিবাদীও বংশধরদের কাছে তাহার কথা স্থায়ী গৌরবের কাজ বলিয়া উল্লেখ করিবে না। কাজেই তাহার এ গৌরব তাহাতেই শেষ। অবশ্য যে স্থায়ী গৌরবের আশায় হত্যা করে না, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক জাতির মতই সে শুধু হত্যার আনন্দে নরহত্যা করে। হিন্দুরা অবশ্য এই রীতি হইতে মুক্ত আছে। পৃথিবীর সব দেশেরই আদিবাসীদের সর্বাপেক্ষা বড় আনন্দ, নদীর অথবা পাহাড়ের অপর পারের লোকদের হত্যা করা। ইউরোপের সভ্য মানুষেরা প্রতিবেশীদের গলা কাটার ইচ্ছা দমন করিয়া রাখে বলিয়া তাহারা নিরপরাধ শেয়াল বা হরিণ হত্যা করে, শিকারের

জন্য বিশেষভাবে পালিত পায়রাও হত্যা করে। এ সবই "নির্মল" আনন্দ। ধনীরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যায় হত্যা করিবার জন্য। নরওয়ের পাইন অরণ্যে তাহাদিগকে হরিণ হত্যা করিতে দেখা যাইবে, সুইস আলপস পর্বতে শ্যামহরিণদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখা যাইবে, মৃগনাভি হরিণ হত্যার কাজে লিপ্ত দেখা যাইবে তুষারমৌলি হিমালয়ে, সুন্দরবনে বেঙ্গল টাইগার হত্যায় দেখা যাইবে, সিংহলের ঘন অরণ্যে হাতী শিকার করিতে দেখা যাইবে। তাহারা অস্ট্রেলিয়ার অরণ্যে যায় লাফাইয়া-চলা ক্যাঙারু হত্যার জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকায় যায় জিরাফ হত্যার জন্য, সেখানকার পাহাড়ে যায় বন্য ছাগ শিকারেব জন্য। খ্রীস্টান ধর্ম তাহাকে এই শিক্ষা দেয় যে, প্রাণীর প্রাণরক্ষার জন্মগত ঐকান্তিক ইচ্ছার দিকে কান দিও না, অতএব সে সুযোগ পাইলেই প্রাণী হত্যা করে, কাজে লাগুক বা না লাগুক। সমস্ত জাতির মধ্যে হিন্দুদিগকে তাহার ধর্ম 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' শিক্ষা দেয়। ইউরোপীয়দিগের মতই নাগা জাতি হত্যাকে উপভোগ করিবার অভ্যাসটা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। কিছুকাল পূর্বে চতুর্দশ বর্ষীয় এক নাগা বালক এই গৌরবচিহ্ন বুকে ধারণ করিয়াছিল। প্রতিবেশী গ্রামের লোকদের সহিত ইহাদের বিবাদ ছিল। একদিন বালকটি গোপনে শত্রুদের পল্লীতে গিয়া দাও হাতে জঙ্গলে লুকাইয়া রহিল। সেখানে একটা পাহাড়ী ঝরণা ছিল। একটি স্ত্রীলোক সেইখানে জল লইতে আসিবামাত্র সে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া উল্লাসের সহিত সেটিকে তাহাদের গ্রামে লইয়া গেল। গ্রামের সবাই তাহার এই বীরত্বের জন্য তাহার গলায় গৌরবচিহ্ন পরাইয়া দিল।

নাগার পাশে আসামের মিরি পাহাড়ের দৃশ্য এই উপজাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি অনেক বিষয়ে নিচু বাংলার হিন্দুদের সঙ্গে মেলে। ব্রাহ্মণদের মত তাহারা ব্যাপকভাবে বহুবিবাহ করে। স্ত্রীকে কিনিয়া আনিতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত টাকা দিয়া নহে, জিনিসের বিনিময়ে। একটি মেয়ের গড় মূল্য তিনটি মহিষ, ত্রিশটি শূকর ও অনেকগুলি মুরগী। পুরুষ সমাজজীবনে যতগুলি সুবিধা ভোগ করে, মেয়েদিগকে ততগুলি সুবিধা দেওয়া হয় না। ঠিক হিন্দুদের বিধবাদের মত। এই অত্যাচার খাদ্য বিষয়েও চলে। নারীদের প্রতি এই বৈষম্যমূলক ব্যবহারের ব্যাখ্যা একটা দেওয়া হয়। হিন্দুরা যেমন দিয়া থাকে। একটা উচ্চাঙ্গের নীতির কথা বলা হয়। প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে চলিতে ভয় হয়, তাই তাহাদের ভীরুতাকে সমর্থন করিয়া বলা হয়, প্রথা মানিয়া চলাই সুবিধাজনক। উহারা বাঘের মাংস খায়। মেয়েদিগকে তাহা দেয় না। পুরুষেরা বাঘের মাংসে শক্তিলাভ করে, উহাতে মনের জোর বাড়ে। কিন্তু বাংলার মেয়েদের অপেক্ষা তাহাদের মেয়েরা অনেক বেশি ভাগ্যবতী। তাহারা রুচিসঙ্গতভাবে পোষাক পরিতে পারে, ধর্মীয় অনুশাসনের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে অর্ধ উলঙ্গ থাকিতে বাধ্য করা হয় না।

আসামের আবর জাতি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মত পোষাক পরে, গাছের বাকলের একখানি মাত্র কৌপীন সম্বল তাহাদের। তাহারই উপরে বসে এবং রাত্রে তাহাই গায়ে দেয়। খাম্পটি মডেলে শান জাতির প্রতিনিধি। আসামের আর যাহাদের মডেল আছে

তাহারা—মিকির, ডাফলা, খাসিয়া, জয়ন্তীয়া। হিমালয়ের দৈর্ঘ্য বরাবর গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যে সব উপজাতির বাস, তাহারাও আছে, যথা গারো, মেচ, লিম্‌বো, লেপচা, গোর্খা এবং গাঢ়োয়ালী। ইহারা পূর্ব-বর্ণিতদের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক দিক হইতে সম্বন্ধ-যুক্ত, ইহাদের নাক চ্যাপটা, গালের হাড় উঁচু, এবং মুখে দাড়ি অত্যন্ত কম। ইহারা যে তাতার বংশ হইতে আগত ইহাতে তাহা প্রমাণ হয়। গাঙ্গেয় উপত্যকার অল্পবিস্তর যাহারা আর্য বংশসম্ভূত, তাহারা উত্তরের মঙ্গোলীয় ও দক্ষিণের দ্রাবিড়দের মধ্যবর্তী স্থানে বাস করিয়া দুই দিককে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সাঁওতাল, পাহাড়ী, ওরাওঁ, কোল এবং গণ্ড কোলারিয় উপজাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। অন্যদিকে তেলুগু, তামিল, ইরুলা, বাদগার এবং সম্ভবত টোডা এবং কুর্গ দ্রাবিড় জাতির প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। পশ্চিম ভারতের তুরানিয়ান বংশোদ্ভূত ঠাকুর কাটকারি এবং শনকলিদের মডেল রহিয়াছে। মধ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়াছে ভীল এবং মীনার মডেল, ইহারা তথাকার আদিবাসীদের প্রতিনিধি। পাঠান, জাঠ এবং রাজপুতদের মডেল বিশুদ্ধ আর্যদের প্রতিনিধিত্ব করিতেছে।

অগণিত দর্শক আসিতেছেন প্রতিদিন। ইহা হইতে একটি জিনিস স্পষ্ট বুঝিতে পারি। ইউরোপীয় উন্নতির মূলে যে রহস্যময় কারণটি রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা গেল। সে তাহাদের অতৃপ্তি। ক্রমাগত নূতন নূতন জ্ঞানলাভের জন্য অনুসন্ধিৎসা এবং যাহা কিছু আরও ভাল, তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি। যখনই তাহা তাহারা আবিষ্কার করিবে এবং বুঝিবে, তখনই তাহা তাহারা গ্রহণ করিবে। কোনও জাতির শক্তি ও সম্পদ নির্ভর করে তাহার আচরিত পন্থা পরিবর্তনের ক্ষমতার উপরে। আবার যখন কোনও জাতির অবনতি ঘটিতে থাকে, তখন তাহার কারণ স্বরূপ ইহা বুঝিতে পারা যায় যে সে তাহার উন্নতির চরমে পৌঁছিয়া তাহার পরে নূতন অন্য কিছু গ্রহণ করিতে ভয় পাইতেছে, পাছে তাহা উন্নতির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। উন্নতির সেই উচ্চ শিখর হইতে তখন তাহার ধর্মীয়, নৈতিক এবং সামাজিক রীতি প্রকৃতি শিলীভূত হইয়া যায়, গতিশক্তি হারাইয়া ফেলে, এবং জীবনীশক্তি এমন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে যে তখন আর সে নূতন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। সমাজের এরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে তখন মৃত বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। তখন অন্ধ দেশপ্রেমিকরা এবং যাহারা সমাজের প্রাচীন মৃতদেহটাকে মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিবশতঃ আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা প্রগতির ঘড়ির কাঁটাটাকে কয়েক বছর পিছাইয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করে। বরং পিরামিডের স্রষ্টারা, যাহারা কবরস্থ আছে, তাহারা বাহির হইয়া রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রচলন করিবে কিন্তু আমাদের দেশে লোকেরা বৈদিক যুগে ফিরিয়া গিয়া শুধু ভারতীয় গৌরব পুনরুদ্ধারে ব্যস্ত হইবে। যাহা অতীত তা মরিয়া গিয়াছে, চলিয়া গিয়াছে এবং অতীত হওয়া মানে মৃত হওয়া। অতীত বর্তমানকে গড়িয়াছে, এবং ভবিষ্যৎকে গড়িবে। বিশ্বব্যাপী প্রাণের ইহাই ধর্ম যে, সে প্রতি মুহূর্তে ভবিষ্যতের সৌধ গড়িবার জন্য একখণ্ড করিয়া প্রস্তর স্থাপন করিতেছে। প্রতি মানুষের জীবন এবং সমস্ত সৃষ্টি, জীবন্ত অথবা জড়, তাহাদের নিজ নিজ সীমার মধ্যে এই সৃষ্টির কাজে

প্রকৃতিকে সাহায্য করিতেছে। যে অতীতকে আঁকড়াইয়া প্রকৃতির অগ্রগতিকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে ধিক্। তাহার ধ্বংস অনিবার্য। এই অমোঘবিধানজাত অগ্রসর হইয়া চলার পথে যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে ভাগ্যের হাত তাহারা এড়াইতে পারিবে না, এবং সেই ভাগ্য—ধ্বংস। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক জাতিরই এই দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে, শুধু উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তির জন্য হিন্দু এখনও টিকিয়া আছে, নাহলে তাহারও ঐ অবস্থা হইত। জীবনের বাস্তব দিক ও বুদ্ধিকে কার্যক্ষেত্রে চালাইবার কাজে ইউরোপের বর্তমানই হইবে আমাদের ভবিষ্যৎ, সম্ভবত কয়েক শতাব্দীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু এই চলমান জগতে আমাদের বিলম্বিত যাত্রায় আমরা যতটা পথ পিছাইয়া পড়িয়াছি, তাহা যদি পদক্ষেপে অতিক্রম করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া আরও পিছাইয়া যাইতে চাহি, তাহা হইলে আমাদের জীবনপথের যাত্রা একেবারে থামিয়া যাইবে, কারণ ভবিষ্যৎ কালটা অতীত কাল হইতে বর্তমানের অনেক বেশি কাছে। কিন্তু হায়! বর্তমানে আমাদের জাতির ইহাই ইচ্ছা। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ ঔদার্যবশতঃ যাহা কিছু হিন্দুর তাহারই প্রশংসা করিয়াছেন, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় এইরূপ হইয়াছে। অতি স্পর্শচেতন এবং গর্বিত জাতি—যে জাতি বহু শতাব্দীর বিদেশী শাসনে দৈহিক এবং মানসিক দুর্বলতা এবং দুর্নীতিগ্রস্ততায় ভুগিতেছে, সে জাতিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করিয়া দিবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা কার্যকর উপায় আর হইতে পারে না। সেজন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের পার্থক্য এত বেশি চোখে পড়ে। প্রথমোক্ত জাতি সর্বদা নূতনত্বের সন্ধানে নিযুক্ত এবং প্রতিনিয়ত তাহারা যাহা কিছু করিতেছে তাহার উন্নতি যাহাতে ক্রমে আরও বেশি হয়, তাহার জন্য নূতন নূতন উপায় চিন্তা করিতেছে। ভারতীয়গণ তাহা করে না। জলশক্তি-চালিত হাতুড়ির সাহায্যে কোনও নূতন জ্ঞান তাহার কণ্ঠনালিতে ঘা মারিয়া ঢুকাইয়া দিলেও তাহা সে গ্রহণ করিবে না। ভারতীয়েরা সব সময় আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো যাহাতে চোখে না লাগে সে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তবু অপ্রতিরোধ্য পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শক্তি যদি তাহার দৃঢ় মনোভাবকে কিছু শিথিল করিয়া থাকে, চরিত্রকে আরও কিছু পরিমাণ স্থিতিস্থাপক করিয়া থাকে অথবা পৃথিবী তাহার ধারণাকে কিছু বিস্তৃত করিয়া দিয়া থাকে তবে ভারতীয়দের দোষ দেওয়া যায় না। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক এক্কা-চালক তাহার গাড়ীর চাকায় স্প্রিং লাগাইতে ভয় পায়, এই অঞ্চলের কৃষকও আলুর চাষ করিবে না। কারণ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে সমাজে সে জাতিচ্যুত হইবে। প্রকৃতই কিছুকাল আগে আমি এক্কা-চালক ও কৃষককে ঐ প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তাহারা কেহই নূতনত্বে রাজি নহে। এ রকম 'উৎসাহজনক' অবস্থায় সর্বত্র ভারতীয় স্টিফেনসন ও এডিসনেরা দলে দলে জন্মগ্রহণ করিবে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য!

অতএব আমাদের জাতীয় অথর্ব অবস্থা হইতে দৃষ্টি ইউরোপীয়দের অগ্রগতির গভীর উৎসাহের দিকে ফিরাইলে মনে একটা আনন্দ জাগে। আমরা তাই প্রতিদিনের হাজার হাজার দর্শকের ভারতীয় কাঁচা মাল, উৎপন্ন দ্রব্যাদির প্রতি কৌতূহল এবং এ সম্পর্কে নানা তথ্য জানিবার অদম্য আগ্রহ আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়াছি। বণিক, উৎপাদনশিল্পী, এবং বিজ্ঞানীরা

আমাদের প্রদর্শনীতে আসিয়া ভিড় করিয়াছেন। তাঁহারা সাম্রাজ্যের সুদূর ডমিনিয়ন হইতে তাঁহাদেব সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা নূতন নূতন ঐশ্বর্যের এবং মানুষের নূতন সুখ-সুবিধার আকর দেখিতে আসিতেন। এমন কি সুদূর পল্লী হইতে আগত লোকেরা গাছের পাতা, গাছের বাকল প্রভৃতি প্রদর্শিত ছোটখাটো তুচ্ছ জিনিসের কি ব্যবহার তাহা শিখিয়া লইবার জন্য উৎসুক হইত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আনীত দ্রব্যগুলি সম্পর্কে বড়রাও তাঁহাদের সন্তানদের আগ্রহ জাগাইয়া ঐ সবের ব্যবহারিক মূল্য বিষয়ে বুঝাইয়া দিতেন। যুবকেরা তাহাদের প্রণয়িনীদিগেরও এই সব প্রদর্শিত দ্রব্যে কৌতূহল জাগাইতেন। তাঁহারা যেসব মন্তব্য করিতেন তাহা আমাদের বন্ধু রেভারেণ্ড মিস্টার লং ও আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া শুনিতাম।

ভারতবন্ধু মিস্টার লং নিয়মিতভাবে প্রতি বৃহস্পতিবার সকালে আমার কাছে আসিতেন, এবং তাঁহার ভারত ত্যাগের পর হইতে ভারত কতখানি উন্নতি করিয়াছে তাহা কৌতূহলের সহিত শুনিতেন। এ বিষয়ে তাঁহাব কোনও ক্লান্তি ছিল না, এবং প্রতিদিন তাঁহার নূতন নূতন জিজ্ঞাসা ছিল। সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া নূতন যাহা ভাবিতেন, তাহা আমার সঙ্গে আলোচনা করিতেন। "বাংলা খবরের কাগজগুলি আমি যেমন দেখিয়াছি, তেমনি কি এখনও পরস্পরের কুৎসা গায়, না প্রকৃতই রাজনীতি লইয়া আলোচনা করে?" আমার দেওয়া "সঞ্জীবনী" কাগজখানি পড়িয়া তিনি এই প্রশ্নটি করিলেন। যখন বলিলাম রাজনীতি লইয়া আলোচনা হয়, তখন তিনি খুব খুশি হইয়া উঠিলেন। আমি তখন অন্য একখানি বাংলা কাগজ তাঁহার হাতে দিলাম। পরের সপ্তাহে যখন দেখা হইল তখন তাঁহাকে বড়ই বিমর্ষ দেখাইল। বোঝা গেল তিনি ঐ বাংলা কাগজখানি পড়িয়াছেন, এবং সে কাগজে হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রার বিপক্ষে মন্তব্য লিখিত ছিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন না, বিদেশ ভ্রমণে যে উপকার হয় সে বিষয়ে কেহ লেশমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করে কি করিয়া। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "ভারতের রেলপথ কি তাহা প্রমাণ করিতেছে না?" অন্য সময়ে তিনি প্রশ্ন করিলেন "ব্রিটিশকে জাতি হিসেবে উহারা নিন্দা করে কেন? তাহাদের জানা উচিত যে, আমাদের মধ্যে তাহাদের যথার্থ বন্ধু রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের মঙ্গল কামনা করে এবং অভিভাবকের দরদ লইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া আছে। তাহাদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। লর্ড নর্থব্রুক, জন ব্রাইট, সার জর্জ বার্ডউড, মিস ম্যানিং, মিস ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল এবং আরও অনেককে আপনি জানেন। তাঁহারা কি আপনাদের প্রকৃত বন্ধু নহেন? আপনারা বৃহৎ জাতিতে পরিণত হউন এ ইচ্ছা যে আমার কত আন্তরিক, তাহা কি করিয়া বুঝাইব?" আমি বলিলাম, ভালমন্দ দুই-ই মোটামুটিভাবে আমাদের কাগজগুলি, ভারতে ইংরেজদের চালিত কাগজ হইতে শিখিয়াছে। তিনি আমার নিকট হইতে বাংলা কাগজগুলি, গ্রামের স্কুলগুলি, জাতিভেদ প্রথা, নীলের চাষ এবং আরও অনেক বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য জানিতে চাহিলেন। তিনি বাংলা বই সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন, তিনি সংবাদপত্রও পান না। তাই আমি যখন ঐ কাগজগুলি দিলাম,

তখন তিনি অপরিসীম আনন্দলাভ করিলেন। প্রদর্শনীর ভারতীয় বিভাগ ইংল্যাণ্ডের নেটিভদের মধ্যে যে কৌতূহল জাগাইয়াছে, যে প্রশংসা তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিতেছে তাহার জন্য লং সাহেবকে এক এক সময়ে শিশুসুলভ আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখিয়াছি। এই সব সময়ে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং যেন বলিতে চাহিতেছেন, ''আমার প্রিয় ভারতবর্ষ এই সব প্রস্তুত করিয়াছে!''এক সময় আমি ইউজিন রিমেলকে ভারতবর্ষের সুগন্ধ দ্রব্যের নানা আকরের কথা ব্যাখ্যা করিতেছিলাম তাহা শুনিয়া লং সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ভারতে বহু লোক এখন সেখানকার নানা কাঁচামাল যাহাতে আরও উৎপন্ন হয়, সে বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছে কিনা। আমি বলিলাম, এ দিকটিতে যে কিছু লাভের প্রত্যাশা আছে, সে বিষয়ে কিছু কিছু লোকের মনে আশা জাগিতেছে। তাহারা বুঝিতে পারিতেছে আগামী কিছুকাল জাতীয় উন্নতি ইহারই উপর নির্ভরশীল থাকিবে। তিনি আরও শুনিয়া খুশি হইলেন যে, ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কলিকাতায় বৈজ্ঞানিক চর্চার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতেছেন। ''আপনি বলিতেছেন ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চাঁদা দিতেছে?''—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, ইহা সত্য। অবশ্য লর্ড লিটনের সময়ে পেট্রিয়টিক ফাণ্ডের জন্য যত সহজে এবং যে পরিমাণ অর্থদান করিয়াছিল, এ ব্যাপারে তাহা করে নাই।

আমাকে হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ জানিয়া, রেভারেণ্ড লং আমার সঙ্গে যত বিষয়ে আলাপ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কখনও ধর্মের তর্ক তোলেন নাই। তিনি স্বয়ং মিশনারি হইয়াও (''পাদরি লং'') তিনি যে তাহা করেন নাই এজন্য তাঁহাকে আমি প্রশংসা করি। এখন যখন এই বিবরণ লিখিতেছি, তিনি আর জীবিত নাই। তাঁহার উদার সহানুভূতিপূর্ণ মুখখানা আমার সর্বদা মনে পড়িতেছে। দক্ষিণ কেনসিংটন স্টেশনে তাঁহার সহিত শেষ বিদায়ের ক্ষণটিও বেদনার সঙ্গে মনে জাগরূক রহিয়াছে। এ পৃথিবীতে আর তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবে না। তাঁহার আত্মাটাই ছিল যেন স্বর্গ, যাহা কিছু সুন্দর এবং গৌরবময় তাহারই আবাস ছিল সেইখানে। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম তাঁহাকে সকলের প্রতি প্রেমময় করিয়া তুলিয়াছিল, এবং আমার বিশ্বাস যে মহানন্দময় অবস্থা সকল দেশের সকল ধর্মের সৎলোক মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার আত্মাও সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন মানুষ যে জাতির মধ্যে জন্মিয়াছেন, সেই জাতিকে ভাল না বাসিয়া উপায় নাই। তাঁহার জীবনের মহৎ কাজগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ইহাই আমাদের সবিনয় দান।

ভারতে উৎপন্ন যে সব সামগ্রী তাহারা ক্রয় করিতে পারে তাহাতে তাহাদের যথোপযুক্ত মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। যাহারা আঠার ব্যবসা করে তাহারা ভারতীয় আঠা খুব করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, কারণ সুদানের যুদ্ধের দরুন আফ্রিকা হইতে আঠা আমদানি বন্ধ ছিল। কিন্তু আরবদেশ অথবা আফ্রিকার মত শুষ্ক দেশের আঠার মত আমাদের আঠা তত উৎকৃষ্ট নহে। আমাদের গাম অ্যাকাসিয়া, Acacia arabia Willd (বাবলা) হইতে প্রস্তুত Acacia vera-র মত শাদা ও পরিষ্কার নহে। অ্যাকাসিয়া ভেরা এডেন হইতে

ভারতে আসে, উহা খুব প্রচুরও নহে। কিন্তু ভারতের নিকৃষ্ট আঠাও শত শত মন জঙ্গলে অথবা পল্লী-প্রদেশে অযথা নষ্ট হয়। কেহ কষ্ট করিয়া উহা সংগ্রহ করিলে ইউরোপের বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করা সম্ভব হইত। বোম্বাই হইতে প্রেরিত Acacia leucophloea Willd-এর আঠা অথবা উত্তর ভারতের Acacia catechu-র আঠা গাম অ্যাকাসিয়ার বিকল্প রূপে ব্যবহার্য বলিয়া ইংল্যাণ্ডে মনে করা হইতেছে। Odina Odier Linn (জিওল) গাছ নিম্নবঙ্গে বেড়া দিবার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার আঠাও যথাসময়ে সংগ্রহ করিতে পারিলে একই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারিত। আমাদের দেশের নিপুণ হাতে স্মরণাতীত কাল হইতে যে উদ্ভিজ্জ নীল রঞ্জক তৈরী হইয়া আসিতেছে তাহা ইউরোপে অজ্ঞাত। তাই তাহাদের অতি কড়া রকমের উজ্জ্বল নীল রঞ্জক-জাত প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাহারা আমাদের দেশের অতি চমৎকার কোমল নীল রঞ্জক পদার্থের দিকে বেশি আকৃষ্ট হইল। Morinda citrifolia, Linn., Oldenlaudia umbrellata, Linn. এবং Rubia-র বিভিন্ন প্রজাতিগুলি প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। রঞ্জন কাজের জন্য এবং ট্যানিং-এর জন্য ইংল্যাণ্ড বৎসরে গাছের বাকল ও নির্যাস কয়েক থেকে কোটি টাকার আমদানি করিয়া থাকে। এই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যবসায়ে ভারতের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। ভারতের এমন অরণ্যসম্পদ এবং এমন বিশাল হিমালয়, যাহা একই সঙ্গে মেরুর শীতলতা ও গ্রীষ্মমণ্ডলের তাপ ধারণ করিতেছে, তাহা সত্ত্বেও কি সে কষায় গুণসম্বলিত বাকল ও পাতাহীন হইতে পারে? কখনও নহে। কিন্তু ভারতে কে এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিবে, অনুসন্ধান চালাইবে, তথ্য সংগ্রহ করিবে, পরীক্ষা চালাইবে এবং ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদিগকে অভ্যস্ত পথ হইতে সরাইবে আনিবে? বহু শতাব্দী পূর্বে আদেশ জারি হইয়াছিল, হিন্দু যেখানে জন্মিবে সেইখানেই তাহাকে অনড় হইয়া থাকিতে হইবে। কাজেই তাহাকে সব-বিষয়ে বিদেশীদের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। বিদেশীরা ব্যবসায়ের নূতন পথ প্রস্তুত করিবে, দেশের নূতন সম্পদের আকর আবিষ্কার করিবে, জমিতে অধিক লাভজনক ফসল ফলাইবে, পুরাতন পদ্ধতির বদলে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিবে, এবং অন্যান্য অনেক কিছু করিবে, যাহা জাতীয়তার অহঙ্কার একটু কম থাকিলে আমাদের নিজেদেরই আগে করা উচিত ছিল। অফিসে ভারতীয় কেরানি অথবা ইংরেজ পরিচালিত রেলবিভাগে ভারতীয় গার্ড কেন বেশি নেওয়া হয় নাই বলিয়া চিৎকার করিলেই হিন্দুরা মনে করে তাহাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করা হইল। আমি অনেকবার অতি কড়া ভাষায় এ বিষয়ে আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু তাহা স্বদেশবাসীর প্রতি সহানুভূতির অভাববশতঃ নহে। ইহার কারণ, আমাদের অগ্রগতির পথে আমরা যে নিজেরাই কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করিয়া বসিয়া আছি, সেই লজ্জায়। আমি কঠোর কথা উচ্চারণ করিয়াছি আমাদের ভীরুতার লজ্জায়, আমাদের অতুলনীয় বুদ্ধিবৃত্তির স্বেচ্ছাকৃত অপব্যবহারের লজ্জায়। ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিসীম, ইহার যথার্থ ব্যবহার হইলে হাজার হাজার লোকের অন্নসংস্থান হইবে, জীবনের মান উন্নত করা সম্ভব হইবে, এবং

সম্পদ যদি শক্তির পরিচয় হয়, তাহা হইলে এদেশের লোক পৃথিবীর লোকের কাছে সম্মানপ্রাপ্ত হইবে। ইংল্যাণ্ডের বহু টাকা বিদেশে খাটিতেছে। সেই টাকা ভারতের উন্নতির কাজে নিয়োগ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নহে। ভারতের প্রতি ইংল্যাণ্ডের বিশেষ একটা টান আছে, বিদেশের প্রতি সেরূপ তাহার নাই, এবং আমার মনে হয় চেষ্টা করিলে তাহাদের দ্বারা আমাদের দেশের উন্নতিসাধন সম্ভব। তাহার আরও কারণ তাহাতে উভয় পক্ষই উপকৃত হইবে। এদেশে তাহাদের যে টাকা খাটিবে তাহা ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের শিল্পকাজের সহায়ক হইবে। ভারতের অর্ধেক মানুষ প্রায় বিবস্ত্র থাকে, কারণ তাহাদের কাপড় কিনিবার সাধ্য নাই। অর্থলাভের উপায় বৃদ্ধি হইলেই সে অর্থের অনেকখানি ল্যাঙ্কাশিয়র, বারমিংহাম, শেফিল্ড এবং অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে বস্ত্র এবং অন্যান্য দরকারী বস্তু উৎপাদনে ব্যয়িত হইবে। লণ্ডনের বাজারে ঘুরিয়া দেখিয়াছি সেখানে পৃথিবীর বহু স্থানের প্রস্তুত দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের জন্য সাজান আছে। ইহাতে আমার এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, ভারতে বর্তমানে যেটুকু বৈদেশিক বাণিজ্য আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক গুণে সে তাহা বাড়াইতে পারে, সে সুযোগ তাহার আছে। কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় করিয়া মাঝে মাঝে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার যেটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহার অভিজ্ঞতা আমার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সেজন্য আমি বিশেষ কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই, অতএব আমি ঠিক কোন্ জিনিসটির বাজার এখানে হইলে লাভজনক হইবে তাহা বলিতে পারিতেছি না। ইহার জন্য আরও অনুসন্ধান আরও পরীক্ষা দরকার। তাহা ভিন্ন কাজে প্রবৃত্ত না হইয়া সত্য নির্ণয় করা দুরূহ। এখন অবিরাম অনুসন্ধান চালান উচিত এবং পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কিছু জিনিস পাঠাইয়া বাজার যাচাই করা উচিত। তাহা হইলে সত্য নির্ণয় এবং প্রাথমিক অনেক বাধা দূর হইতে পারে। এই উপায়েই অস্ট্রেলিয়ার লোকেরা ইংল্যাণ্ডে লাভজনক মাংসের বাজার পাইয়াছে, এবং নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাটকা ফল উৎপাদন করিয়া রপ্তানি করিতেছে। উদ্‌বৃত্ত মাংস তাহারা আগে নষ্ট করিয়া ফেলিত। গভর্মেণ্ট এ-কাজে উৎসাহ দেখান নাই, সে জন্য আমি গভর্মেণ্টের দোষ দিই না, আমি বরং আমার দেশবাসীকে বলি তাঁহারা কেহ যদি এ-পথে পরীক্ষা চালাইতে চান, তাহা হইলে আমি যতদূর সম্ভব তথ্য সরবরাহ করিতে পারি, কিন্তু তাঁহাদের কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে হইবে।

আমার বন্ধু মিস্টার টমাস ক্রিস্টি (নিবাস, ২৫ লাইম স্ট্রীট, লণ্ডন) পৃথিবীকে এক গভীর ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। সিডেনহ্যামে তাঁহার বড়ই শান্তিপূর্ণ একটি ভেষজ উদ্যান আছে। তাঁহার এই ভেষজ উদ্যান দেখিয়া মনে জাগিল আমাদের দেশের এক অতীত যুগের কথা। সেই যুগে আমাদের মহা পূর্বপুরুষ ভরদ্বাজ জীবিত ছিলেন। মহাবিজ্ঞ সেন্টর কাইরন ঈসক্যুলাপিয়াসকে যেমন শিক্ষা দান করিতেন, তাহার বহু পূর্বে ভরদ্বাজ তৎশিষ্য চরককে তেমনি মনুষ্য-দেহে ঔষধরূপে ব্যবহার্য উদ্ভিদের সূক্ষ্ম গুণের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার তত্ত্ব বুঝাইতেন। ইতিহাসপূর্ব কালে চরক-সুশ্রুত, এবং পরবর্তী কালের ডিওসকোরিডিস উদ্ভিজ্জাত

ঔষধের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, মিস্টার ক্রিস্টি ও তাঁহার সহকর্মীগণসহ বর্তমানে তাহাই করিতেছেন। উদ্ভিদ জগৎকে এখন যেমন বৈজ্ঞানিক উপায়ে বহু শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে এবং বর্তমান কালের রসায়নশাস্ত্র বিশ্লেষণের যে সুবিধা করিয়া দিয়াছে, তাহার সাহায্যে এখন পৃথিবীর যাবতীয় স্থানে অনুসন্ধান চালাইয়া ব্যাধি নিরাময়, বেদনার উপশম এবং আয়ু বৃদ্ধির উপযোগী ঔষধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হইতেছে। যে উদ্যম ও মনোভাব আরবচিকিৎসক অহরম দেখাইয়াছিলেন, যাহার ফলে রুবাব, কাসিয়া, সেন্না, ক্যাম্ফর এবং অন্যান্য প্রাচ্য ঔষধ ইউরোপে গৃহীত হইয়াছিল, এবং যাহার ফলে পরে কুইনিন, মরফিয়া এবং স্ট্রিকনিন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, মিস্টার ক্রিস্টিও ঠিক তেমনি উদ্যম ও মনোভাব লইয়া গবেষণা করিতেছেন এবং ইহার ফলে অনেক শক্তিশালী ঔষধ নূতন করিয়া ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার তালিকাভুক্ত হইতে পারিয়াছে। ইতিপূর্বে কয়েকটি কঠিন অসুখের কোনও ঔষধ ছিল না, মিস্টার ক্রিস্টির গবেষণায় সেই সব ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিস্টার ক্রিস্টি কোনও একটি ভারতীয় ফলের গাছের active principle বা সক্রিয় সত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা ডায়াবিটিসের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই গাছের ফল গাদা গাদা মাটিতে পড়িয়া থাকে, এবং বর্ষার জল পাইয়া স্থানটি অঙ্কুরে ছাইয়া যায়, দুর্গন্ধ বিস্তার করে, অবশেষে সেগুলি ছাগের মুখে গিয়া স্থানটি পরিষ্কার হয়। আরও একটি ভারতীয় আগাছা হইতে কঠিন এক ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। আরও ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে, যদি এই জাতীয় প্রয়াস শত শত বৎসরের ভারতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া একত্র কাজ করিতে পারে। ইউরোপের আধুনিক জ্ঞান ও প্রাচ্য দেশের প্রাচীন জ্ঞান এই ক্ষেত্রে একত্র মিলিলে ব্যাধির সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নূতন শক্তির উদ্ভব হইতে পারে। এ বিষয়ে ডাক্তার কানাইলাল দে, ডাক্তার নবীনচন্দ্র পাল, ডাক্তার মুদিন শরিফ, ডাক্তার (অধুনা মৃত) সখারাম দত্ত ও ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্তের সহযোগিতা অনেক কাজে লাগিতে পারিত। মিস্টার ক্রিস্টির কাজে ভারতের বিশেষ স্বার্থ আছে। কারণ এখন যে ভেষজ সম্পদ ভারতের কোনও কাজে লাগিতেছে না, নষ্ট হইতেছে, এমন কি জঞ্জালরূপে মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, সেই জঞ্জাল মিস্টার ক্রিস্টির সহযোগিতায় সোনায় রূপান্তরিত হইতে পারে।

মিস্টার ক্রিস্টিকে আমি ইংরেজ চরিত্রের একটি প্রধান প্রতীকরূপে আবিষ্কার করিয়াছি। আমার মতে তিনি একজন আদর্শ ইংরেজ। দেহে শক্তিশালী, মনে উদার, উন্মুক্ত এবং দৃঢ়। ভণ্ডামি এবং নির্বুদ্ধিতা-জাত কোনও কাজের প্রতি তাঁহার ঘোর বিতৃষ্ণা। তাঁহার সমস্ত সত্তাটাই যেন কর্মোদ্যমে গড়া, হিন্দু-চরিত্রের বিপরীত।—হিন্দুর সত্তাটি কর্মহীনতায় গঠিত। মিস্টার ক্রিস্টির মানসিক ও দৈহিক শক্তি পূর্ণ বিকশিত, আবহাওয়া ও উৎসাহ-দমনকারী ঋতুর প্রভাবে সব বিষয়ে সমতা ও দৈহিক শক্তির বিনষ্টি ঘটিবার ঠিক পূর্বে আর্যদের যেমন ছিল। বর্তমান যুগের মানুষদের মধ্যে জন বুলকে বলিষ্ঠ মানবীয় গুণসমূহের প্রতিনিধিরূপে ধরা যাইতে পারে। বর্তমানের মানবজাতির এক ভাগ শৈশবের উদ্দাম

প্রকৃতি আজিও ত্যাগ করে নাই, অন্য ভাগে অথর্ব মুমূর্ষু হিন্দু জাতি। অতএব জন বুল তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া বাহিরের শক্তিকে দমন করিতে পারে। আর হিন্দু আদর্শবাদের ধাপ পার হইয়া আসিয়া, এবং নব্যপ্লেটোনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার গুরু সাজিয়া অবশেষে বহিঃপ্রাকৃতিক শক্তির অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করিল, এবং বিশুদ্ধ বুদ্ধির চর্চা কল্পনা পথের আনন্দ-সমাহিত অবস্থা লাভকেই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া লইল। কিন্তু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ এই তত্ত্বে যত কবিত্ব অথবা সূক্ষ্মতাই থাকুক, বাস্তব জগতের কঠিনতার সঙ্গে ইহাকে খাপ খাওয়াইয়া লওয়া সহজ নহে, যে জীবনে তুচ্ছ জিনিস লইয়াই বেশি ব্যস্ত থাকিতে হয়, বিশ্বের সেই স্থূল কর্মজীবনের পক্ষে এই তত্ত্ব গ্রহণ করা কঠিন।

আমার হাতে যে অল্প সময়টুকু ছিল, তাহারই মধ্যে আমি লণ্ডনের ঔষধের বাজার খুব মনোযোগের সঙ্গে যাচাই করিয়া দেখিয়াছি। বিদেশ হইতে কোন্ কোন্ ঔষধ তাহারা আমদানি করে ইহাই ছিল আমার জানিবার বিষয়। বর্তমানে ঐখানে পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা, অ্যামেরিকা ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থান হইতে যাহা আসে, দেখিলাম তাহা ভারতবর্ষ হইতেও আনা যাইতে পারে। Cassia fistula (সোঁদাল)-এর খোসাসমেত বীজ তাহার মধ্যে একটি। এই বীজ সমস্ত ভারতে গাছে গাছে শুকাইয়া নষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন Mallotus Phillippinensis (কামিলা) হইতে প্রাপ্ত হলুদ বর্ণের চূর্ণ, এবং hemidesmus Indicus (অনন্তমূল) দেখিয়াছি। প্রদর্শনীতে ওখানকার এক বণিক্‌দের সভায় এই জাতীয় ভাবতীয় নমুনাগুলি তাঁহাদের সম্মুখে স্থাপন করা হইল। তাঁরা এগুলি লইয়া যত্নপূর্বক পরীক্ষা চালাইয়া দেখিবেন, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। লণ্ডনের বাজারে এ সবের দাম যাচাই কবিয়া বোঝা গেল প্রাথমিক অসুবিধাগুলি দূর করিতে পারিলে ইহা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইতে পারে। এইভাবে অন্যান্য আরও অনেক জিনিসেরও কারবার চালাইয়া ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বাড়াইয়া তোলা যাইতে পারে। প্রথমেই ধরা যাউক ফাইবার বা তন্তুজাতীয় দ্রব্যের এবং কাগজ প্রস্তুতের উপকরণের কথা। রাজশাহীর বলিহারের রাজা কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় এক জাতীয় তন্তু পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে সবার মনোযোগ হইতে বুঝিতে পারা গেল, ভারতীয় উদ্যমে উৎকৃষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। আসল কথা ইংল্যাণ্ডে, বা ইউরোপে, বা অ্যামেরিকায় এমন কেহ নাই যিনি ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। সমস্ত সভ্য দেশেরই প্রতিনিধি পৃথিবীর সর্বত্র সকল দেশে রহিয়াছেন, যাঁহারা সেই সেই দেশের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করেন, কিন্তু ভারতের মত এত বড় দেশ এমন সভ্য শাসনে থাকিয়াও সর্বত্র প্রতিনিধিহীন।

ভারতীয় কাঁচামাল উৎপাদন প্রশ্ন লইয়া আমি অধুনা মৃত ইউজিন রিমমেল-এর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। ভারতবন্ধুদের মধ্যে তিনি ভারতের সুগন্ধ দ্রব্যের জন্য ব্যবহৃত জিনিস ও উদ্বায়ী তেল লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভার লইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "আজ আমি আপনার অফিসে আমার সুগন্ধ বিষয়ক গ্রন্থখানি (বুক্ অভ

পারফিউমস) রাখিয়া আসিয়াছি। ভারতীয় সুগন্ধী উপকরণ ও উদ্বায়ী তেলের একটি তালিকা আপনি আমাকে দিবেন এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমি তাহা আনিতে চাহিয়াছিলাম। এই তালিকা বিষয়ে আমার খুবই কৌতূহল ছিল। আপনি যদি এরূপ একখানি তালিকা প্রস্তুতের সময় করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে উহা আমাকে পাঠাইয়া দিলে আমি বিশেষ বাধিত হইব।" তালিকাটি পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, তিনি ব্যবসার ভিত্তিতে এ বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইলাম। প্রখ্যাত রসায়নবিদ্ মিস্টার ক্রস্ তন্তু লইয়া পরীক্ষার ভার লইলেন। একবার একটি তন্তু তিনি আমার হাতে দিয়া ইহার নাম বলিতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম ইহার নাম তসর। কারণ স্পর্শে খুব কোমল ঠেকিল এবং দেখিতেও চকচকে ছিল। কিন্তু আমারই ভুল, কারণ তন্তুটি ছিল পাটের। মিস্টার ক্রস্ তাঁহার আবিষ্কৃত বিশেষ রাসায়নিক পদ্ধতিতে পাটকে ঐভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। আর এক পদ্ধতিতে অন্য এক জাতীয় স্থূল তন্তু (Bauhinia Vahlu)-কে এমন বদল করিয়াছিলেন যাহাতে উহা উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ শাদা উল হইতে পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় ছিল না। ইহার সাহায্যে বেশ একটি ব্যবসাও ইতিমধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহা কলিকাতা হইতে প্রায় ১৫০ মাইল দূরে আমার এক ইংরেজ বন্ধুর চিঠির নিম্নলিখিত অংশ হইতে বুঝা যাইবে। —"মের্সাস '—' আমার নিকট Bauhinia Vahlu-এর নমুনা চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাহা তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে ঐ বস্তু তাঁহাদিগকে পাঠাইতে থাকিব, প্রতিশ্রুতি দিয়াছি। ঐ বস্তু এখানকার পাহাড়ে বিস্তর জন্মে, এবং আগুন প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সামান্য খরচ পড়িবে তাহাতে খুব কম দামেই ইহার যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে। মেসার্স '—' লিখিয়াছেন আপনি তাঁহাদিগকে আমার সঙ্গে আলাপ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। আমি সেইজন্য আপনাকে লিখিলাম, এবং সমস্ত বিষয় জানাইয়া দিলাম।" এসব নীরস বিষয়ে আমি বিস্তারিত লিখিতেছি শুধু এজন্য যে আমার দেশবাসী জানিয়া রাখুন, যদি তাঁহারা চোখ খুলিয়া রাখিয়া সভ্যতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন স্বাধীন জীবিকা, সম্পদ ও সমৃদ্ধি তাঁহাদের হাতের কাছেই রহিয়াছে, কিন্তু এজন্য তাঁহাদিগকে এতদিনের সংস্কারবদ্ধ বাঁধা পথ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে হইবে, কারণ এই সংস্কারই জাতীয় উন্নতির কণ্ঠ রোধ করিয়া তাঁহাদের অগ্রসর হইবার পথও রোধ করিয়া রাখিয়াছে। আরও একটি কথা বলা প্রয়োজন। আমার মনে হয় এই জাতীয় গবেষণায় বা পরীক্ষায় ইংল্যাণ্ডের বণিকেরা নিজেদের দেশের লোকের চেয়েও "পাগড়িপরা" ভদ্রলোকদের প্রতিই বেশী মনোযোগ দিবেন, কারণ তাঁহারা ছোট চালানের উপর আদৌ ভরসা করিতে চাহেন না, আর ওদিকে ব্যবসায়ীরাও অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে চাহেন না।

সাধারণ দর্শকদের কাছে ভারতের কারুশিল্পের অঙ্গনটিই সর্বাপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষ করিয়া যেদিকে প্রাচীন রীতিতে গড়া মণিমুক্তা-খচিত মূল্যবান

অলঙ্কারের উজ্জ্বল আধারগুলি রাখা হইয়াছিল সেই দিকে তাহারা খুবই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই সব অলঙ্কারের কারুকার্য অতি উচ্চশ্রেণীর, এবং দুর্লভ দর্শন, ইহা দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইয়াছিল। আর আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম ইহাদের দেখিয়া। মুখে স্বর্গীয় সৌন্দর্য মাখা শিশুরা পিতামাতার সঙ্গে আসিয়াছে, তাহাদের হলুদ বর্ণের চুলগুলি পিঠের ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুশ্রী তরুণীরা সদ্য ইস্কুল হইতে আসিয়াছে, তাহাদের দৃষ্টিতে কিছু সঙ্কোচ, মুখে কিছু লজ্জার আভা। কি সুন্দর যে দেখাইতেছে! যুবতীরা আসিয়াছে তাহাদের প্রণয়ীদের সঙ্গে, সমস্ত জীবন তাহাদের নিকট হইতে যে পূজা পাইবে আশা করিতেছে। আর আশা করিতেছে—তাহারই প্রথম কিস্তি এই প্রদর্শনীতে পাইবে। (কিন্তু হায়! প্রেমের প্রথম স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবার পর তাহা যে অধিকাংশ স্থলেই দাবীর চাপে পরিণত হয়। এবং তাহা এমন যে তাহার বিরুদ্ধে যে-কোনও সক্রেটিসও বিদ্রোহ করিবেন।) ইহা ভিন্ন গৃহিণীরা আসিয়াছেন, তাঁহাদের চালচলনে ভাবে ভঙ্গীতে বেশ একটা দায়িত্বের ভাব এবং আভিজাত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা খুব আগ্রহের সঙ্গে বালা, ব্রেসলেট, চেন, নেকলেস, লকেট ইত্যাদি দেখিতেছেন। এই সব উচ্চাঙ্গের অলঙ্কার আসিয়াছে ত্রিচিনপল্লী, কটক, ঢাকা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং জয়পুর হইতে। হায়—সুদূর দক্ষিণভারতের স্বামী-সম্প্রদায়ের কারিগর! সে যখন তাহার দীন গৃহে বসিয়া তাহার আদিযুগের পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত নেহাই-এর উপর ঝুঁকিয়া রৌপ্যখণ্ডের উপরে ঠুক ঠুক করিয়া তাহার ছোট্ট হাতুড়িটি ঠুকিতেছিল, তখন কি সে ভাবিতে পারিয়াছিল সে, তাহার হাতের কাজ একদিন সুদূর পশ্চিমের দেবকন্যাদের মত সুন্দরী নারী ও আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সংযমের শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রণয়ী পুরুষদের এমন করিয়া মন ভুলাইবে? ভারতীয় এই কারিগর ইহাদের মনে যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার ফলে অনেকেরই হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতেছে, এবং তাহা অনেক পরিবারেরই মনে এমন এক অশান্তির ঝড় বহাইয়া দিয়াছে যাহা দেখিলে অগ্নি ও ধাতুশিল্পের দেবতা ভালক্যানও বিস্ময়ে হতবাক্ হইতেন। তাহা যাহাদের মনে বিষাদের ছায়া ফেলিয়াছে, সেই ছায়া সরাইয়া তাহাদের অভ্যস্ত মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিতে সেই অলঙ্কারশিল্পী তাহার সর্বস্ব বিলাইয়া দিতে পারিত না কি? ভারতীয় শিল্প-ঐতিহ্যে গড়া রৌপ্য ও স্বর্ণ অলঙ্কারের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যপূর্ণ পদ্মফুলের চিত্র, গভীর লাল রুবি রঙের মিনের কাজ, যাহা বহুদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় হাতের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ল্যাপিস-ল্যাজুলি পাথরের উজ্জ্বল নীল বর্ণ, টরকইসের হাল্কা সবুজ কিম্বা পুরাকালের সত্রাজিতের স্যমন্তক মণি কি সত্যই প্রকৃতির নিজের অকৃপণ হাতে বর্ধিত ইংরেজ নারীর মাধুর্যকে বাড়াইয়া দিতে পারিত? বৃষ্টিস্নাত রৌদ্রোজ্জ্বল বসন্ত-সৌন্দর্যও ইহার কাছে ম্লান। উত্তর মেরুর নিষ্কলঙ্ক শুভ্র তুষার ইহার কোমল মসৃণ ত্বক হইতে কিছু স্বচ্ছতা ভিক্ষা করিতে পারে। ইহার গণ্ড হইতে রক্তরাঙা গোলাপ কিছু রক্তাভা যাচ্ঞা করিবে। কঠোর সাধনারত সন্ন্যাসী ইহার রাঙা ওষ্ঠাধর হইতে চুম্বন-চোর যুবকদের ক্ষমা করিবে। ইংরেজ রমণীর এই রাঙা ওষ্ঠাধর দেখিয়া উজ্জ্বল লাল প্রবালসমূহ সমুদ্রের গভীরে লুকাইবে। প্রাচ্য দেশের সৌন্দর্যের আদর্শ অবশ্য পৃথক। দৃষ্টি

তাহার খুব প্রখর না হইলে সে ইংরেজ রমণীর বর্ণ ছাড়া আর কোনও সৌন্দর্য দেখিতে পাইবে না। কারণ সে পছন্দ করে চাঁচাছোলা জ্যামিতিক মাপের সৌন্দর্য। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এ রকম পাথরে খোদাই মূর্তি শুধু চোখকেই ভুলাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ইংরেজ রমণীর ভাবপ্রকাশক্ষম মুখ মর্ম স্পর্শ করে। তাহার ক্রটি চোখের রঙে, মনে হয় তাহা আরও একটু কালো হইলে ভাল হইত। তাহার কেশ যেখানে সোনার রঙের নহে, তাহা একটু কালো, একটু লম্বা এবং আরও ঘন হইলে ভাল হইত। তাহাব দেহ আরও একটু পাতলা, কোমল এবং কিঞ্চিৎ কৃশ হইলে ভাল হইত। এবং মুখের ভাবে আরও কিছু পেলবতা, এবং বিদ্রোহীভাবেব স্বল্পতা থাকিলে ভাল হইত। এই বিদ্রোহভাবটি যেন তাহার মনের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছে। কিন্তু এসব ক্রটি অতি তুচ্ছ, বরং ইহা সৌন্দর্যের মহিমা আরও যেন বাড়াইয়া দিয়াছে। ইংরেজ পুরুষ ইহার জন্য যে গৌরব বোধ করে তাহা অকারণে। মূর্তি পূজারীরা তাহাদের দেবী মূর্তিসমূহের জন্য ইংরেজ রমণীর মুখকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে পারে। আমার মনে হয় সকল ম্যাডোনা মূর্তিরই, বিশেষ করিয়া বিখ্যাত 'ম্যাডোনা অব দি চেয়ার'-এর আদর্শ ছিল ইউরোপের উত্তর দেশের কোনও মুখের আদর্শে অঙ্কিত, কারণ রাফায়েলের এই ম্যাডোনার সঙ্গে লা ফরনারিনা অথবা জুইশ মুখাবয়বের কোনও সাদৃশ্য নাই। পক্ষান্তরে ইহার মধ্যে এমন একটা অনির্বচনীয় সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আছে যাহা রমণীকে রমণীয়ত্ব দান করে, এবং যাহা ইউরোপখণ্ডের নারীর মধ্যে বিশেষ দেখা যায় না। এবং আমি যদিও শুধু এই কারণে ইউরোপীয় রমণীর সৌন্দর্যের উপরে ইংরেজ রমণীর সৌন্দর্যের স্থান নির্দেশ করি, তবু অ্যামেরিকান রমণী প্রতিযোগীরূপে দাঁড়াইলে আমার বিচারে কিছু সঙ্কোচ দেখা দিবে। ইংরেজ রমণীর সমস্ত মাধুর্য সত্ত্বেও সে চাকচিক্যময় সাধারণ অলঙ্কারের জন্য আকুল হইবে, ঠিক যেমন বোর্নিওব আদিবাসী ডায়াক রমণী বেতের ব্রেসলেট, দক্ষিণ ভারতের তামিল রমণী তাহার কানের প্রকাণ্ড গর্তে ব্যবহারের জন্য বার্নিশ করা তালপাতার গহনা, এবং উত্তর-পশ্চিম দেশের কৃষক রমণী পাঁচ সের ওজনের পিতলের বেড়ি পায়ে পরিবার জন্য আকুল হয়। যন্ত্রণাদায়ক বেড়ি সে সমস্ত জীবন পায়ে পরিয়া বেড়ায় এবং মৃত্যুকালে তাহার উত্তরাধিকারিণীকে বংশ বংশ ধরিয়া ব্যবহারের জন্য দান করিয়া যায়।

প্রদর্শনী খুলিবার কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতীয় যাবতীয় অলঙ্কার এবং অন্যান্য কারুশিল্পের অধিকাংশই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। অলঙ্কার ব্যতীত অন্যান্য যেসব দ্রব্য জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা হইতেছে পটারি, ধাতুদ্রব্য এবং ল্যাকারের কাজ করা দ্রব্য। বোম্বাই, হাল্লা, মুলতান, জয়পুর এবং খুর্জার পালিশ করা পাত্রসমূহ সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। বোম্বাইয়ের পটারিতে দুই সহস্র বৎসরের পূর্বেকার ভারতীয় জীবনালেখ্য অজন্তা গুহার অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে পাত্রগুলি বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উহারা ইহার নাম দিয়াছিল Wonderland Pottery Works। এই সব চিত্রের বাস্তবানুগ ভঙ্গী এবং শিল্পমূল্য সম্পর্কে মিস্টার গ্রিফিথ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা

উল্লেখযোগ্য। তিনি "মুমূর্ষু রাজকন্যা" নামক ইহার একটি চিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছেন, "ইহাতে যে বেদনার প্রকাশ হইয়াছে, যে সেণ্টিমেণ্টের প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আমার মতে শিল্পের ইতিহাসে অনতিক্রম্য।" খুর্জার সবুজ অলঙ্কৃত পোড়ামাটির পটারি সকলেরই খুব ভাল লাগিয়াছিল। বারাণসীর পিতলের বাসনপত্র সোনার মত উজ্জ্বল, প্রদর্শনীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছিল এবং তাহার দাম শস্তা হওয়াতে অল্পবিত্ত দর্শকেরাও প্রদর্শনী দর্শনের চিহ্নস্বরূপ সঙ্গে লইতে পারিয়াছিল। মোরাদাবাদের জিনিসেরও চাহিদা কম ছিল না। ল্যাকারের কাজ করা পাকপত্তন, ডেরা ইসমাইল খাঁ এবং পাঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের কাঠের দ্রব্যাদিও সহজেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাতীর দাঁতের দ্রব্যাদি, বুননের কাজ, শাল অথবা বস্ত্রদ্রব্যাদি দর্শকের খুব ভাল লাগে নাই। রুদ্রাক্ষেব ব্রেসলেট এবং নেকলেস মহিলাদের মধ্যে প্রচুর বিক্রয় হইয়াছিল। বিলম্বে আসা দর্শকেরা ভাল ভাল জিনিস সমস্তই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে দেখিয়া বড়ই হতাশ হইয়াছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে, ইঁহাদের মধ্যে ম্যাক্সম্যুলারও ছিলেন।

আমি ভারতের এই সর্বজনপ্রিয় বিশ্বখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে অক্সফোর্ডে, আমার বিলাত প্রবাসের শেষ দিকে দেখিয়াছিলাম। সম্প্রতি তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুতে শোক পাইয়াছেন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন নির্জন বাস করিতেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন দূর ভারত হইতে একজন হিন্দু আসিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে সম্ভাষণ জানাইতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আনন্দের সঙ্গে দুইখানি হাত প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে সহৃদয় অভ্যর্থনা করিলেন। পার্থিব সকল প্রিয় জিনিস হইতে ভারত তাঁহার প্রিয়তর। নভেম্বর মাসের এক কুয়াশা ঢাকা সন্ধ্যায় আমি অক্সফোর্ড শহরতলীবাসী তাঁহার ঘরের দরজায় দর্শকদের নির্দিষ্ট ঘণ্টা বাজাইয়া আগমন ঘোষণা করিলাম। মিসেস ম্যাক্সম্যুলার নিজে দরজা খুলিলেন, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্রোফেসর মহাশয় কি বাড়িতে আছেন?" তিনি বলিলেন বাড়িতেই আছেন, এবং আমাকে ভিতরে আসিতে বলিলেন। বৃদ্ধ অধ্যাপক আমাকে অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, মাঝপথে আমাদের দেখা হইল। তাঁহার শ্রদ্ধেয় মূর্তি দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। বুঝিলাম, আমি এমন এক ব্যক্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি যিনি গভীর বেদজ্ঞানে সায়ন ও যাস্কের সঙ্গে, এবং বিশ্লেষণী অনুসন্ধিৎসা ও বিচারসহ তথ্য সংগ্রহে পাণিনির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারেন। আমি তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কি প্রোফেসর ম্যাক্সম্যুলারের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবার গৌরব লাভ করিতেছি?" তিনি শান্তভাবে বলিলেন, "আমিই সেই ব্যক্তি।" আমরা অতঃপর তাঁহার সুন্দর বৈঠকখানা ঘরটিতে গিয়া বসিলাম। একপাশে অগ্ন্যাধারে আরামদায়ক আগুন জ্বলিতেছিল, কিন্তু সমস্ত বাড়িখানাতেই যেন একটা বিষাদের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। অধ্যাপক মহাশয় সব সময়েই শুধু ভারতবর্ষ ও হিন্দুদের বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, এই দুইয়েরই প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও সহানুভূতি অতি গভীর। তিনি বলিলেন, তাঁহার দেহটি ইংল্যাণ্ডে থাকিলেও তাঁহার মন ও আত্মা

ভারতে রহিয়াছে। তাই তিনি ভারতীয় যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন তাহা দ্বারাই পরিবৃত থাকিতে চাহেন। এবং এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রদর্শনীতে কিছু কিছু ভারতীয় দ্রব্য কিনিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সবই বিক্রয় হইয়া যাওয়াতে তিনি কিছু আনিতে পারেন নাই। মাঝে মাঝে তিনি যে সব ভারতীয় জিনিস সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন তাহা দেখাইলেন, এইগুলিকে তিনি অতি যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পিতলের ঘড়া। এই ঘড়াটি কলিকাতার এক ভদ্রলোক তাঁহার মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সংস্কৃত পণ্ডিত হিসাবে তাঁহাকে উপহার দিয়াছেন। প্রোফেসর এই উপহারটিকে বিশেষ মূল্যবান বলিয়া মনে করেন এবং ইহাকে একটি বিশেষ স্থানে রাখিয়াছেন। তিনি তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইউরোপে যে বিবাহ-প্রথা চলিত আছে তিনি তাহার বিশেষ নিন্দা করিলেন। যতদূর মনে পড়ে তিনি পিতামাতা-নির্দিষ্ট প্রথম বয়সের বিবাহ পছন্দ করেন, তবে ভারতে যত অল্প বয়সে বিবাহ চলে, তাহা তাঁহার পছন্দ নহে। ইঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইংল্যাণ্ড প্রবাসের একটি সুমধুর সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। তিনি পুনরায় আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কাজের চাপে ইহা সম্ভব হয় নাই।

প্রদর্শনীর ভারতীয় অংশে সিল্‌কের পৃথক একটি বিভাগ ছিল। স্ট্যাফোর্ডশিয়রের লীক নামক স্থানের অধিবাসী মিস্টার টমাস ওয়র্ডল এই বিভাগের কর্তৃত্বভার লইয়াছিলেন। তাঁহার মত অন্য কেহ ভারতীয় সিল্‌ক্ বিষয়ে অনুশীলন করেন নাই। গত পূর্ব বৎসরে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিজ চোখে দেখিয়া যান। সিল্‌ক শিল্পের বাজার মন্দা হওয়াতে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ও অন্যান্য সিল্‌ক্ উৎপাদন স্থানে ইহাতে নিযুক্ত লোকদের সর্বনাশ হইয়াছে। মিস্টার ওয়র্ডল অবশ্য এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন এ বিষয়ে সুনিশ্চিত আশা পোষণ করেন। এমন কি ইতিমধ্যেই তাঁহার চেষ্টা সাফল্য লাভ করিয়াছে, কারণ তিনি সিল্‌কের অনেকখানি অংশ চীনাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, বাংলাদেশ ইংল্যাণ্ডের বাজার যেটুকু হারাইয়াছিল তাহার পুনরুদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। আমার ইংল্যাণ্ডে থাকাকালে বাংলাদেশের সিল্‌ক্ ও গুটি বা কোকুনের চাহিদা হঠাৎ খুব বাড়িয়া যাইতে দেখিয়াছি, সঙ্গে দামও বাড়িল এবং প্রত্যেকটি আউন্স বিক্রয় হইয়া গেল, ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যোগান কুলান গেল না। অবশ্য পরবর্তী মরশুমের জন্য বড় বড় অগ্রিম অর্ডার গ্রহণ করা হইল। মিস্টার ওয়র্ডল সিল্‌কের সূতা রীলে জড়াইবার একটি নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, ইহাতে ভারতীয় সিল্‌কের চাহিদা আরও বাড়িয়াছিল। তাঁহার উদ্ভাবিত এই যন্ত্র প্রদর্শনীতে লিয়ঁবাসিনী এক ফরাসী স্ত্রীলোক চালাইয়া দেখাইতেন। এই উপায়ে রীল করা সিল্‌ক্ আরও বেশি দামে বিক্রয় করা সম্ভব হইল। যন্ত্রটি সহজে বহনযোগ্য, গঠন সরল, দামেও শস্তা—মাত্র ১২ পাউণ্ড। ইতিমধ্যে মিস্টার ওয়র্ডলের অক্লান্ত প্রয়াসে গভর্মেন্টও এদিকে দৃষ্টি দিলেন, এবং বাংলার সিল্‌ক্ ব্যবসায়ের অবনতি ঘটিল কেন তাহার পূর্ণ অনুসন্ধানের আদেশ জারি করিলেন।

এই কাজে গভর্মেন্ট মিস্টার উডমেসন নামক এক ভদ্রলোকের সাহায্য লাভ করিলেন এবং মিস্টার নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভারতীয়কে তিনি সক্রিয় সহযোগীরূপে পাইয়াছেন বলিয়া আমি খুশি হইয়াছি।

সমস্ত বিষয়টাই নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে। বমবিসাই ডিস ও স্যাটারনিয়াই ডিসদিগকে (রেশমের পোকা) পুষিবার আয়োজন করা হইতেছে। নির্দোষ বেচারীরা জানেও না তাহাদের কি বিপদ আসিতেছে, তাই তাহাদের জঙ্গল আবাসের দুর্গে তাহারা আনন্দে গাছের ডালে ডালে বুকে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। নিষ্ঠুর মানুষ তাহাদের এই দুর্গের উপর আক্রমণ চালাইবে। সেই দুর্গ সুতায় গড়া। তাহারই মধ্যে নিজেদের বন্দী করিয়া ধ্যানাবস্থায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে, তাহার পর একদিন সেই গুটি ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ নড়িবার ক্ষমতা থাকে না। ইহাদের লইয়াই বিজ্ঞানী মানুষ এখন গবেষণায় মাতিয়াছে, মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখিতেছে কি কি উপায়ে তাহাদের কাছ হইতে আরও বেশি টাকা পাওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে 'বমবিক্স মোরি' প্রজাতিভুক্ত গুটিপোকা, মধ্য বাংলার সযত্নে রোপিত তুঁতগাছের পাতা খাইয়া বাঁচে। ছোটনাগপুরের উচ্চ জমিতে 'অ্যানথিরিয়া মাইলেট্টা' (তসর) নামক প্রজাতিভুক্ত গুটিপোকা কোলেরা পালন করে। ফিলোসামিয়া রি সি নি (এড়িয়া) নামক গুটিপোকা নিম্ন ভূমির ভেরেণ্ডার পাতা খায়। এটি পূর্ব হিমালয়ের দক্ষিণের রাজ্য। অ্যানথিরিওপ্‌সিস আসামা (মুগা) মাকিলাস ওডোরাটিসিমা, নীস-এর তন্তু খাইয়া থাকে। এবং আরও নানা জাতীয় গৃহ-পালিত লেপিডপটেরাস (প্রজাপতি, মথ ইত্যাদির জাতির নাম), যাহাদিগকে ভারতে পালন করা হয়, ইহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র তরুণ কর্মতৎপর অফিসারটির তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি ভীত জমিদারের সম্মুখে তাঁহার জমির উপযোগিতা পরীক্ষা করিতেছিলেন। গুপ্ত কূপ হইতে জমিতে জল দিবার পথের অর্ধলুপ্ত চিহ্ন দেখা যাইতেছে, এই কূপের উদ্দেশ্য এই যে, ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তী মেয়াদ ফুরাইয়া গেলে গ্রামের খাজনা বৃদ্ধি করা চলিবে।

প্রদর্শনীর একটি আলোচনী সভায়, মিস্টার ওয়র্ডল চাষ সম্পর্কে একটি বক্তৃতা দিলেন। তাঁহার বলা শেষ হইলে আমি বলিলাম, বাংলাদেশের সিল্‌কের উন্নতি যেমন প্রার্থনীয়, তেমনি ইহার মূল্য হ্রাসও প্রার্থনীয়, কারণ তাহা হইলে তাহা চীনাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশী সফল হইবে। এবং ইহা একমাত্র উৎপাদন ব্যয় কমাইলেই সম্ভব হইতে পারে। জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইলে কাহারও লাভের অঙ্ক কমাইতেই হইবে। উৎপাদনকারী, মধ্যবর্তী দালাল এবং বণিক—ইহাদের প্রত্যেকেরই পশম কাটিতে কাটিতে চামড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, এবং মনে হয় চামড়ার পরের স্তরেও অস্ত্র পৌঁছিয়াছে। একা জমিদার (ইঁহার ভূমিরাজস্বের স্থায়ী কৃষক) এতদিন কাঁচি এড়াইয়া গিয়াছেন, এখনও তিনি প্রচুর পশমের বোঝা ঘাড়ে লইয়া ফিরিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইঁহারই লোভ সিল্‌ক্-ব্যবসাকে ধ্বংস করিয়াছে। অন্যান্য শস্যের বেলায় ভূমিকর যেমন কম, তুঁতগাছের জমিতে তেমনি বেশি। এইখানে

উহা কমাইবার সুযোগ আছে। সিল্ক্-ব্যবসায় যখন প্রচুর লাভ হইত, সে সময়ে যে খাজনা সম্ভব হইয়াছিল এখন তাহা সম্ভব নহে। বর্তমানের হিসাবে উহা মাত্রাতিরিক্ত। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাজনাও কমাইয়া আনিতে হইবে। যদি চাহিদা ও যোগানের রীতির উপর খাজনা সংশোধনের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ব্যবসাটি সমূলে ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত তাহা সম্ভব হইবে না। কারণ আমাদের দেশের লোকেরা বাহিরের জগতের কোনও সংবাদ রাখে না। তাহাদের দৃষ্টি বৃহৎ পৃথিবীর বিস্তার মাপিবার শিক্ষা পায় নাই। তাহাদের পূর্বপুরুষ পায়ে হাঁটিয়া অথবা গোরুর গাড়িতে চাপিয়া শত শত বৎসর পূর্বে পৃথিবীর যেটুকু দেখিয়াছেন ইহাদের দৃষ্টি তাহার বাহিরে যায় না। তাই তাহারা বুঝিতে পারে না, যে সব কারণে দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছে অধিকাংশক্ষেত্রে তাহার প্রতিকার সম্ভব। সর্বশেষ, তাহারা সমবিপদে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া, তাহার প্রতিকারে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সেজন্য অবশ্যম্ভাবীকে স্বীকার করাইয়া লইতে জমিদারের উপর বাধ্যতামূলক চাপ দরকার। এই সভায় মিস্টার কেস্‌উইক নামক একজন উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমার সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি সুন্দর একটি ছোট্ট বক্তৃতার সাহায্যে তাঁহার নিজের মত ব্যক্ত করিলেন। ভারতীয় সিল্কের নানা বস্ত্র মিস্টার ওয়র্ডল সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন, সম্রাজ্ঞীও এইরূপ সুন্দরভাবে সাজান দেখিয়া খুশি হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রদর্শনীতে 'ভারতীয় বাজার' ইংরেজ সাধারণের কাছে বড়ই মনোহর বোধ হইয়াছিল। এইখানে হিন্দু ও মুসলমান কারুশিল্পীগণ তাহাদের নিজ নিজ কাজ করিতেছিল, এবং তাহা দেখিবার জন্য ব্রিটেনের সকল দিক্ হইতে নরনারীর ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। নিরেট জনতার সম্মুখে এই সব শিল্পী কেহ বা বস্ত্রে বুটি বুনিতেছিল, কেহ বা গুনগুন্ স্বরে গান করিতে করিতে কার্পেটের প্যাটার্ন বুনিতেছিল, কেহ বা হাতে ক্যালকোপ্রিন্টিং-এর কাজ করিতেছিল। যেসব স্থূল যন্ত্রাদি ইংরেজরা বহুদিন ত্যাগ করিয়াছে, তাহারই সাহায্যে ভারতীয়দের শিল্পকাজ করিতে দেখিয়া তাহারা অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। ঠিক যেমন একজন হিন্দু অবাক্ হইত একটি সিম্পাঞ্জিকে পুরোহিত সাজিয়া তালপাতার লেখা হইতে শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইতে দেখিলে। আমরা তাহাদের চোখে দেখিবার মত প্রাণীই বটে, যেমন জুলুরা কিংবা সিয়ু মোড়ল এখন (১৮৮৭) আমাদের চোখে। সর্বত্রই মানুষের স্বভাব অভিনবত্বের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা, এবং যে জিনিস যত অভিনব হয়, তাহাও ততই বেশি দর্শনীয় হইয়া উঠে। মহিলাদের নিকট হইতেই আমরা খুব বেশি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলাম। আমাদের সর্বাবস্থায়, হাঁটায়, বসায়, খাওয়ায়, কাগজ পড়ায়, সকল প্রকার চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আমাদের বিদ্ধ অনুবিদ্ধ করিতেছিল। সবুজ চোখ, ধূসর চোখ, নীল চোখ, কালো চোখ একত্র মিলিয়াছিল, এবং সব সময় তাঁহারা বলাবলি করিতেছিলেন "O, I, never!" আমরা প্রত্যেকে কতজন করিয়া স্ত্রী বাড়িতে ফেলিয়া আসিয়াছি ইহা লইয়াও তাঁহাদের মধ্যে আলোচনার অন্ত ছিল না। কেহ অনুমান করিতেছিলেন ২৫০ নিশ্চয় হইবে। অনেকেরই এই অনুমান। ইঁহাদের কাছে এ বিষয়ে যত অসম্ভব কথাই বানাইয়া বলা যাউক, ইঁহারা

কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। আমাদের মধ্যকার একজন এক সুন্দরী পরিচারিকাকে বলিয়াছিলেন, তোমার ব্যবহারে আমি ভীষণ খুশি হইয়াছি, আমি তোমাকে বিবাহ করিতে চাই। তুমি কি আমার গৃহে আমার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর পদ পূরণ করিতে রাজি আছ? এই পদটি সম্প্রতি আমার দেশত্যাগের পূর্বে আমার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর মৃত্যুতে খালি হইয়াছে। পরিচারিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কতগুলি স্ত্রী আছে?" "যেমন হয়ে থাকে—২৫০টি"—সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন আমার বন্ধু। "আপনার ৪০ সংখ্যক স্ত্রীর কি হইয়াছিল?" "আমি তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছি—কারণ সে আমার রান্না খারাপ করিয়াছিল।" বেচারি পরিচারিকা ইহা শুনিয়া ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। বলিল, "হতভাগা। দানব!" পরে তাহার নিকট হইতে তাহার এক বান্ধবীর দুর্ভাগ্যের কথা শোনা গেল। সুন্দরী সরলা বালিকা, সে এডিনবরোয় পাঠরত এক আফ্রিকার ছাত্রের প্রেমে পড়িল। ছেলেটি তাহার কাছে আসিয়া প্রণয় নিবেদন করিত। অবশেষে ইংল্যাণ্ডে তাহাদের বিবাহ হয়। দিন বেশ ভালই কাটিতেছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে ছেলেটি তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার লাইবেরিয়ার মরুদেশেব বাড়িতে লইয়া গেল। সেখানে একটিও শ্বেতাঙ্গ নাই, তাহার সেখানে বড়ই একা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার উপর একদিন তাহার শাশুড়ি পাখীর পালক ও পশুর চামড়া পরিয়া অর্ধমাতাল অবস্থায় নাচিতে নাচিতে বাড়ি ফিরিল, সেইদিন তাহার সহ্যসীমা পার হইয়া গেল। দুঃখে বেদনায় হতাশায় শুকাইয়া শুকাইয়া মেয়েটি মবিযা গেল।

অবশ্য পৃথিবীর সকল দেশের লোকই অন্য দেশের লোকদের অসভ্য মনে করিয়া থাকে, অন্ততপক্ষে তাহারা যে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এ বিষয়ে তাহাদের সন্দেহ থাকে না। বহুকাল হইতে মানুষের এই মনোভাব চলিয়া আসিতেছে, ভবিষ্যতেও বহুকাল থাকিবে। অতএব ইংরেজদের জনসাধারণ যে আমাদের বর্বর মনে করিবে ইহাতে আশ্চর্য হই নাই। কারণ তাহাদের চোখে আমবা সব দিক্ হইতেই অসভ্য বিবেচিত হইয়াছিলাম। পোষাক, আচরণ এবং মানুষের সাধারণ চালচলন হাবভাব বিষয়ে তাহাদের মনে একটি নির্দিষ্ট ধারণা আছে, ইহা হইতে এক চুল এদিক-ওদিক হইলে তাহা তাহাদের চোখে ধরা পড়িয়া যায়। ইহা তাহারা ক্ষমার অযোগ্য ভাবে। আমাদের অবশ্য তাহারা সর্বত্রই যথাসম্ভব প্রশ্রয় দিয়াছিল। সম্রাজ্ঞী নিজে তাঁহাদের সাধারণ রীতি আমাদের ক্ষেত্রে শিথিল করিয়াছিলেন, এবং সর্বত্রই আমাদের প্রতি লোকে এই অনুগ্রহ দেখাইয়াছে। একটি প্রাচীন জাতির প্রতিনিধিরূপে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন পুরুষ ও মহিলাগণ আমাদিগকে সম্মান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায়শঃই আমাদিগকে তাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করিতেন, প্রাইভেট পার্টির আয়োজন করিতেন এবং নানা উপভোগ্য আমোদের ব্যবস্থা করিতেন। কতকগুলি গৃহে আমরা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়াছিলাম, এবং প্রায় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত লোক হইয়া পড়িয়াছিলাম। ইঁহাদের কাছে আমরা সর্বদা 'সুস্বাগতম্' ছিলাম, এবং তাঁহাদের গৃহে গমন এবং সেখান হইতে প্রত্যাগমন আমাদের খুশিমত করিতাম। তাঁহাদের মধ্যে আমরা কয়েকজন বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম, এই ভদ্রলোকেরা আমাদের কয়েকদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই নিজেরা আসিয়া

আমাদের বাড়ি লইয়া যাইতেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে যে আনন্দময় দিনগুলি কাটাইয়াছিলাম তাহা আজও অনুরাগের সহিত স্মরণ করি, এবং আমাদের প্রবাসকালে তাঁহারা আমাদের প্রতি যে সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সরকারী বিষয়ক কাজে বেসরকারী ভদ্রলোকেরাও আমাদের দিকে তাঁহাদের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।। অনেক সময়েই "আমরা পাগড়িপরা ভদ্রলোকদের কথা শুনতে চাই" এরূপ দাবি শুনা যাইত। কিন্তু আমরা যে ভয়ঙ্কর রকমের এক আশ্চর্য জীব এ ধারণা অপরিচিতদের মধ্য হইতে দূর হয় নাই। আমরা যে তাহাদের ভাষা বুঝি, ইহা জানিলে কি তাহারা এমন মর্ম খুলিয়া আমাদের সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিত। আমাদের বিষয়ে তাহারা যাহা বলিত তাহা খুবই মজার। কাজের চাপে যখন আমাদের মন ক্লান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন এক গ্লাস পোর্ট ওয়াইন অপেক্ষা ইহাদের মন্তব্য বেশি ভাল লাগিত। আমাদের বিষয়ে ঐ সব পুরুষ ও মহিলাগণ যে সব মন্তব্য প্রকাশ করিবার যে নিপুণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা হুবহু বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। তাহা থাকিলে সেইসব আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ হইলে তাহা একখানি সেরা চিত্তাকর্ষক গ্রন্থরূপে গণ্য হইতে পারিত। অথবা যদি জানিতাম আমাকে পরে আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিতে হইবে তাহা হইলে পল্লীবাসীদের মুখের সরল মন্তব্যগুলির কিছু অন্তত টুকিয়া রাখিতাম। তাহারা অজ্ঞাতসারে অনেক সত্য কথাই বলিয়াছে আমাদের সম্পর্কে। এই জাতীয় মনোভাব সকল দেশেই আছে এবং তাহাদের মন্তব্যে আমাদের নিজেদের বিষয়ে আমাদের যে ধারণা এবং তাহাদের যে ধারণা, তাহার ভিতরের বস্তুগত পার্থক্য লইয়া দার্শনিকতার অবতারণা করা যাইতে পারে।

যে সব লণ্ডনবাসী তাহাদের পূর্বদেশীয় সাম্রাজ্যের লোকদের দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহাদেরই চোখে যদি আমরা এমন দেখিবার মত জীব হইয়া থাকি, তাহা হইলে ইংল্যাণ্ডের যে সব হাজার হাজার পল্লীবাসী প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল, তাহাদের চোখে যে আমরা কি বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিলাম, তাহাই ভাবি। তাহারা অবশ্য আমাদের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহার করিয়াছিল। তাহারা আমাদের সঙ্গে আলাপ করা পছন্দ করিত এবং আমরাও সুযোগ পাইলে তাহাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতাম। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, যাঁহাদের আত্মীয়েরা ভারতে সৈন্যরূপে অথবা অন্য কাজ উপলক্ষে ভারতে আছে, তাঁহারা ভিড় ঠেলিয়া কোনওমতে আমাদের কাছে আসিয়া আমাদের করমর্দন করিতেন, এবং ভারতস্থিত আত্মীয়বর্গের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন। এইভাবে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিত। "মহাশয়, জিমকে চেনেন? ঐ যে, জেমস রবিনসন—অমুক রেজিমেন্টের?"—এক প্রৌঢ়া মহিলা ভিড় ঠেলিয়া ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন একদিন। আমার ঘাড়ে যেন তিনি ঝড়ের মত ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কোনও ভূমিকা নাই, অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে কথা কহিবার রীতি মান্য করার বালাই নাই, সোজা প্রশ্ন। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাইলাম, তাঁহার সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তিনি তখন নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন তিনি

জিমের আণ্ট অর্থাৎ পিসি। তাহার পর তিনি তাঁহার ভাইপো কেমন করিয়া সেনাদলে যোগ দিল তাহার দীর্ঘ ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনাদের মারফৎ তাহার খবর পাঠাইবার এমন চমৎকার সুযোগ সে নষ্ট করিল বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাহাকে তাঁহার স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তিনি তাহাকে স্মরণ না করিযা থাকিতে পারেন না। এই মহিলার কিছু কিছু দুর্বোধ্য বৈশিষ্ট্য যাহা লক্ষ্য করিলাম, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—আমরা সাধারণত যে ধরনের ইংরেজী শুনি, ইঁহার ইংরেজী সেরকম নহে, তাঁহার ভাষাও মাঝে মাজে এলোমেলো হইয়া যাইতেছিল। তিনি আমাকে অনুবোধ করিলেন, আমি ফিরিয়া যাইবার পর যেন জিমকে এই মূল্যবান খবরটা দিই যে মিসেস জোন্‌স-এর পরিপুষ্ট শূকরটি স্মিথফিল্‌ড্‌ কৃষি প্রদর্শনীতে একটি পুরস্কাব লাভ করিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলাম, আমি ফিরিয়া গিয়াই উত্তর বর্মাব অবণ্যপর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া এ সংবাদ জিমকে দিয়া আসিব। মিসেস্ জোন্‌স্ তাঁহার বন্ধুদেব বলিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

৫

এক সময় আমি প্রদর্শনীর একটি উচ্চশ্রেণীর রেস্টোরাণ্টে বসিয়া খবরের কাগজের উপর চোখ বুলাইতেছিলাম। সকালে কাগজ পড়িবার সময় পাই নাই। পাশের এক টেবিলে ভদ্র চেহারার এক পরিবারের লোকেরা বসিয়াছেন। বোধ হইল তাঁহারা পল্লী অঞ্চলের লোক। ঐ টেবিল হইতে মাঝে মাঝে আড় চোখের দৃষ্টি আমার দিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। আমি ভাবিলাম কিছু মজা করা যাউক। আমার দিকে সবাই চাহিতেছে এ বিষয়ে সজাগ হইলাম, তাঁহারাও দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইলেন। আমি পাঁচ মিনিট ধরিয়া কাগজের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলাম যাহাতে উহাদের দৃষ্টি সম্মুখস্থ প্লেট হইতে আমার দিকে ফেরে এবং আমি যতই কাগজে মনোযোগ দিতেছি, ততই উহাদের চপল দৃষ্টিও আমার দিকে নিবদ্ধ হইল। মনে হইল, আমাকে ভাল করিয়া দেখিবার পর আমার সম্পর্কে উহাদের ধারণা আগে যতটা খারাপ হইয়াছিল, সে রকম এখন আর নাই। সম্ভবত আমার নরমাংসভোজনের যে প্রবৃত্তি রহিয়াছে, তাহা বাহিরের কোনও লক্ষণ দেখিয়া বুঝা যায় না, কিংবা হয়ত ঐ প্রবৃত্তি সম্প্রতি আমি দমন করিয়া রাখিয়াছি, অথবা স্থান ও পরিবেশ এমন নহে যাহাতে আমি উহাদের ঘাড়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি, অথবা অন্য যে কারণেই হউক, তাহারা কিঞ্চিৎ সাহসী হইয়া উঠিল এবং চাপা গলায় এমন আলাপ জুড়িয়া দিল যাহাতে আমার দৃষ্টি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষ কর্তব্যটি অবশেষে ঐ দলের প্রায় সতের বৎসর বয়স্কা সুন্দরী মেয়েটির উপর ন্যস্ত হইল, অবশ্য আমাকে শুনাইবার জন্য নহে, কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম, সে বলিতেছে, "এই লোকটির সঙ্গে কথা বলিবার আমার ভীষণ ইচ্ছা হইতেছে।" এমন কথা শুনিয়া আমি কি করিয়া চুপ করিয়া থাকি? আমি উঠিয়া তাহাদের কাছে গেলাম, এবং মেয়েটিকে বলিলাম, "তুমি কি আমার উদ্দেশে কিছু বলিতেছিলে?" সে ইহা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া এবং মাথা নিচু করিয়া রহিল। তাহার পিতা তাহার হইয়া বলিলেন, "আমার এই মেয়েটি প্রদর্শনীতে ভারত হইতে আনা দ্রব্যাদি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছে। কয়েকটি প্লেটে ও ঢালের উপর আপনাদের ভাষায় কি সব লেখা রহিয়াছে, সে উহার অর্থ জানিতে চায়। কিন্তু কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ভাবিয়া পাই নাই, তাহার পর আপনাকে এখানে দেখিয়া আপনার কাছাকাছি স্থানে বসিয়াছি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে বসিয়া কিছু পানীয় গ্রহণ করিবেন? আপনি কি পছন্দ করেন? এখানে দেখিতেছি মোজেল সুরাটি উৎকৃষ্ট। অথবা আপনি শ্যামপেন কিংবা আরও কড়া কিছু পছন্দ করেন?" আমি ধন্যবাদের সহিত পানীয় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলাম, এবং একটি চেয়ারে তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া কফটগারি পাত্রে যে সব উৎকীর্ণ কবিতা সোনায় অলংকৃত করা আছে, তাহার কয়েকটি অর্থ বুঝাইয়া দিলাম। তরুণী ততক্ষণে তাহার লজ্জা ত্যাগ করিয়া এমন উৎসাহের

সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহা তাহার পক্ষে সম্ভব হইবে বলিয়া আমি মনে করি নাই। যাহা বলিতেছি তাহাতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে, এবং আমার ইংরেজী শুনিয়া বিস্মিত হইতেছে, এবং "আমার" দেশ হইতে আনা ব্যাণ্ড বাজনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতেছে। আসলে ওটা ইণ্ডিয়ান নহে, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাণ্ড, নিগ্রো এবং ম্যুলাটো (শ্বেত ও কৃষ্ণকায়ের সঙ্কর)-রা বাজাইতেছিল। মেয়েটির প্রশংসা যে যথাস্থানে বর্ষিত হইল না, সেজন্য একটু অস্বস্তি বোধ করিলেও আমি প্রায় পনেরো মিনিটকাল আলাপ চালাইয়া গেলাম। এবং তাহার বন্ধু যিনি, জেন, বা লিজি যেই হউক, তাহাকে নস্যাৎ করিয়া তাহার যে সব আত্মীয় তাহার মত সৌভাগ্য লাভ করে নাই, তাহাদিগকে অন্তত বলিতে পারিবে যে, সে একজন আসল ব্ল্যাকির সঙ্গে আলাপ করিয়াছে—এই সব গল্প করিবার পর আমি ওই সময়ের মধ্যে তাহাকে যথেষ্ট উপকরণ যোগাইয়া দিয়াছি।

অন্য আর এক সময় গ্রিল-রুম নামক এক শস্তা খাদ্যালয়ে—সেখানে অল্প কয়েকটি মাত্র পদের খাদ্য বিক্রয় হয়, সেইখানে এক নাবিক আমার কাছে অগ্রসর হইয়া আসিয়া সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইল, আমি যেন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কিছু আলাপ কবি। সে বলিল গত পূর্বদিন সে অস্ট্রেলিয়া হইতে আসিয়াছে, এবং একদিনের ছুটি লইয়া তাহার স্ত্রীকে প্রদর্শনী দেখাইতে আনিয়াছে। সে তাহাকে যতটা সম্ভব খুশি করিতে চাহে। তাহার স্ত্রীর মাথায় এক ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে যে আমি তাহার সঙ্গে আলাপ না করিলে সে খুশি হইবে না, প্রদর্শনী উপভোগও করিতে পারিবে না। এই অদ্ভুত আবদারে বিরক্ত হইয়া আমি বলিলাম, 'ইহার কোনো মানে হয় না, আমি তাহার সহিত আলাপ করিতে পারিব না।" কিন্তু লোকটি নাছোড়, সে ভীষণভাবে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল, এবং বার বার দূরের এক টেবিলে বসা গোমড়ামুখী স্ত্রীর দিকে তাকাইতে লাগিল। যাহা হউক তাহার দৌত্য অবশেষে সফল হইল, আমি গিয়া তাহার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলিলাম। তাহার মুখচোখ তৎক্ষণাৎ খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাহার স্বামীকে পুরস্কারস্বরূপ আর একপাত্র হুইসকি পানে অনুমতি দিল। উহাদের বিবাদও মিটিল। শেষ পর্যন্ত তাহার স্ত্রীর সহায়তায় তাহাকে ধরাধরি করিয়া ক্যাবে তুলিয়া দিলাম, তাহা না হইলে সে বিপন্ন হইত।

আমাদের প্রতি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের ব্যবহার কিরূপ? আমার বিশ্বাস আমার দেশবাসী তাহা জানিতে চাহেন। ভদ্রলোকের প্রতি ভদ্রলোকের যেরূপ ব্যবহার তাঁহারাও আমাদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। সার জর্জ বার্ডউডের অপেক্ষা সদয় এবং সহৃদয় বন্ধু আর কাহাকে আশা করা যাইতে পারে? তাঁহারা এবং আমরা যেন এক দেশেরই মানুষ এই রকম একটা সহানুভূতির ভাব আমাদের মধ্যে ছিল। ভারতে চাকরির পদমর্যাদা আমাদিগকে পৃথক রাখিয়াছিল, ইংল্যাণ্ডে আমরা সবাই অতিথি। সম্মানিত অতিথির মর্যাদা তাঁহারা যদি না বুঝিতেন, তবে তাঁহাদের প্রবাস বাস বৃথা হইত। মাঝে মাঝে অবশ্য আমরা অদ্ভুত চরিত্রের দুই-একজনের দেখা পাইতাম যাঁহারা, বিশেষ করিয়া যদি সঙ্গিনীসহ থাকিতেন তাহা হইলে, তাঁহারা যে হিন্দি ভাষায় পণ্ডিত তাহা জাহির করিতে ব্যস্ত হইতেন,

সে ভাষায় জ্ঞান থাকুক বা না থাকুক। এবং ইহার দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেন তাঁহারা আমাদের চেয়ে কত বড়! অর্থাৎ সঙ্গিনীদের দেখাইতেন, "দেখ, আমরা কত বড়!' এ পর্যন্ত ভালই। আমরাও তাঁহাদের ভারতীয় ভাষায় অসাধারণ জ্ঞানের কাছে নত হইয়া তাঁহাদের সঙ্গিনীর চোখে তাঁহারা যাহাতে খুব মহৎ প্রতিভাত হইতে পারেন, সে বিষয়ে সাহায্য করিতাম। মহিলারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, এতই তাঁহাদের আনন্দ এবং গর্ব বোধ হইত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিমন্ত্রণ পাইতাম। হায় হায়! আমরা নিজেদের কি নরাধমই না ভাবিয়াছি! কিন্তু এ সবই উদারতার পরিচয়। যাহাই হউক ভারতীয় কয়েকজন প্রতারকের সঙ্গেও লণ্ডনে আমাদের মোলাকাত হইয়াছিল। ইহাদের ব্যবসা বড়ই মন্দা যাইতেছিল। একবার আমি এবং একবারই মাত্র, এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নিকট হইতে রূঢ় ব্যবহার পাইয়াছিলাম। সে কি বলিয়াছিল, ঠিক সেই ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব নহে, তবে আমি তাহার নিহিতার্থ এবং ভঙ্গিটি কথায় প্রকাশ করিতেছি। সে রাজকীয় ভঙ্গিতে আমার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "স্লেভ, আমাকে অমুক অফিসটি কোথায় দেখাইয়া দিবি?" আমি তাহার উত্তরে বলিলাম, "আমি দুঃখিত, আমি অন্য কাজে ব্যাপৃত আছি, আপনার আদেশ আমি এই মুহূর্তে পালন করিতে অক্ষম। তবে যদি আপনি সোজা গিয়া ডান দিকে ঘোরেন, এবং তাহার পর বাম দিকে, তাহা হইলে আপনি সেই অফিসটি দেখিতে পাইবেন।" সে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, "তোমাকে পথ দেখাইয়া দিতেই হইবে, তুমি কাহার কাজে নিযুক্ত আছ? কে তোমার প্রভু?" "আমি, মহাশয়, বর্তমানে ভারত সরকারের কাজে নিযুক্ত আছি, তিনিই আমার প্রভু। আর আমার সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছেন, তিনি অমুকের রিপোর্টার।" কিন্তু যাঁহার নাম করিলাম সেই নাম শুনিয়া লোকটি যেমন কেঁচোর মত হইয়া গেল, তাহা তাহার রূঢ় ব্যবহার অপেক্ষাও আমাকে বেশি পীড়িত করিয়াছিল।

প্রদর্শনীর বাহিরে আমরা কখনও কাহারও নিকট হইতে কোনও অসদ্ব্যবহার পাই নাই। ঈস্ট এণ্ড, ওয়েস্ট এণ্ড, এবং অন্যান্য স্থানে ঘুরিয়াছি, এবং অনেকবার পথ হারাইয়াছি। ছেলেমেয়েরা আমাদের চারিদিকে ভিড় করিয়াছে। কিন্তু আমাদের উপর কোনও অত্যাচার করে নাই। ভিখারী এবং অসৎ চরিত্রের স্ত্রীলোকেরা আমাদের সঙ্গে ব্যবহারে একটু বেশি সাহস দেখাইয়াছে, এই সাহস তাহারা ইংল্যাণ্ডবাসীদের সঙ্গে ব্যবহারে দেখাইতে পারে না। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনও অসুবিধার সৃষ্টি করে নাই। কোনও বাউণ্ডুলে স্ত্রীপুরুষ বা গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক আমাদের অনভিজ্ঞতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের প্রতারিত করে নাই। বরং যাহারা দরিদ্র পল্লীর সাধারণ পানালয়ে অলসভাবে বসিয়া বসিয়া সময় কাটায়, তাহারা সব সময়ে আমাদের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে, পথ হারাইলে পথ বলিয়া দিয়াছে। যে সব স্থানে লণ্ডনের শহুরে লোকেরাও দিনের বেলায় যাইতে সঙ্কোচ বোধ করে, আমরা সেখানে কোনও অঘটনের সন্ধানে গিয়াছি, কিন্তু প্রলোভন হইতে দূরে থাকিতে পারিলে অঘটন ঘটিবে কেন? একবার এক দুরাত্মার মত চেহারার জন্য আমার

উপরে হাতে-কলমে রসিকতা ফলাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দশ-বারোজন লোক ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বাঁচাইয়া দিল। অথচ ইহারা বেপরোয়া ধরনের লোক এবং সবাই আমার অপরিচিত। অন্য আর এক সময় কোনও একজন লোক চিৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ যে বিদেশী।" সঙ্গে সঙ্গে লোক বলিয়া উঠিল, "না উনি বিদেশী নহেন; আপনার-আমার মতই ব্রিটিশ প্রজা।"

ইংরেজদের অনুগ্রহের প্রসঙ্গে আমি একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। ঘটনাটি আমার বন্ধু মিস্টার গুপ্তের সম্পর্কে। তিনি এবং সার এডওয়ার্ড বাক্‌ একদিন সকালে কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে গিয়াছিলেন। এখানে পৃথিবীতে সকল দেশের টাটকা ফল প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এই ঋতুতে উৎকৃষ্ট ফুল ও উত্তম সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। সকাল ছয়টার সময় সর্বাপেক্ষা বেশী ভিড় হয় এই বাজারে, বিশেষ করিয়া মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার এবং শনিবারগুলিতে। সার এডওয়ার্ড আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কখনও র‍্যাস্পবেরি আস্বাদন করিয়াছেন কিনা। বন্ধু তাহার উত্তরে '...না' বলাতে, সার এডওয়ার্ড কিছু র‍্যাস্পবেরি সংগ্রহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন দেবি হইয়া গিয়াছে, সবই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এক খুচরা বিক্রেতা কয়েক ঝুড়ি র‍্যাস্পবেরি সকালে কিনিয়া সেগুলিসহ রওনা হইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সার এডওয়ার্ড একঝুড়ি কিনিতে চাহিলেন, কিন্তু সে বলিল, সে বিক্রয় করিবে না। তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলা হইল এই ভারতীয় বন্ধুর জন্য দরকার ছিল, তাহা শুনিয়া লোকটি তৎক্ষণাৎ একঝুড়ি ফল তাঁহাকে দিল। কিন্তু দাম কিছুতেই লইল না। সে বলিল, "মহাশয়, ইনি আমাদের অতিথি, আমি এই ঝুড়িটি তাঁহাকে উপহার দিলাম।"

আমার আগে ধারণা ছিল গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিই ফলের দেশ এবং আমই সবার সেরা ফল। এখন দেখিলাম আমার ধারণার কিছু পরিবর্তন আবশ্যক। হট হাউসে যে সব ফল হয় তাহার একটি চমৎকার গন্ধ আছে, তাহা খোলা জায়গার ফলে পাওয়া যায় না। উৎকৃষ্ট আম অবশ্যই ভাল, কিন্তু ইহা শ্রেষ্ঠ ফলগুলির অন্যতম, একমাত্র শ্রেষ্ঠ ফল নহে। বিনা সঙ্কোচে আমি ইহার সঙ্গে পীচ, নেকটারিন, আনারস এবং স্ট্রবেরিকে একাসনে বসাইতে পারি। ভারতে যাহা জন্মে তাহা নিকৃষ্ট। প্রথম শ্রেণীর দোকানগুলিতে যে আঙুর বিক্রয় হয় তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, হট হাউস ফলের কিরূপ উন্নতিসাধন করিতে পারে। ইউরোপ হইতে যে সব আঙুর আমদানি করা হয়, তাহা আমরা যে কাবুলি আঙুর আনাই তাহার সমান। কিন্তু ঐ গরম ঘরের আঙুর তাহা অপেক্ষা পাঁচগুণ বড় এবং দশগুণ বেশি রসাল এবং মধুর। ইংল্যাণ্ডের আপেল আমার খুব ভাল মনে হয় নাই, কিন্তু পেয়ারা, এবং আমরা যাহাকে পেয়ারা বলি তাহা আমাদের দেশের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। চেরি, গুজবেরি, এবং গ্রীনগ্রেজ, এবং অন্যান্য হট হাউসের ফলের দাম অনেক বেশি স্বভাবতঃই। পীচ ও নেকটারিন প্রথম শ্রেণীর হইলে প্রতিটির দাম তিন হইতে আট পেনি, হট হাউসের আনারস প্রতিটি এক গিনি, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে আনা প্রতিটি ৪ শিলিং, বাহির হইতে

আনা আঙুর এক পাউণ্ড ৫ পেনি, সর্বোৎকৃষ্ট হট হাউসের আঙুর এক পাউণ্ড ৫ শিলিং। ইংল্যাণ্ডে আম জন্মে না। কেহ কেহ ব্যক্তিগতভাবে বম্বাই হইতে আম আমদানির চেষ্টা করিয়া বারবার ব্যর্থ হইয়াছেন। ভাল কলা পাওয়া যায় না, কিন্তু কয়েক জাতীয় সবুজ কলা (বম্বাই, মাদ্রাজ, বর্মা প্রভৃতি দেশে যেমন হয়) ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ হইতে আনা হইয়াছিল। বরফঘরে যেমন মাংস ঠাণ্ডা করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত টাটকা রাখা যায়, তেমনি যদি কেহ টাটকা ফল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, তবে তিনি প্রচুর লাভবান হইতে পারিবেন। কমলালেবু ইটালি, মলটা এবং স্পেন হইতে ইংল্যাণ্ডে আমদানি করা হয়। হট হাউস অর্থাৎ উপরে ঢাকা, এবং চারিদিকে অল্পবিস্তর ঘেরা—সবই কাঁচের। ইহার মধ্যে গাছের বা ফুলের বৃদ্ধিতে যে পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োজন তাহা সৃষ্টি করা হয় গরম জলপূর্ণ পাইপ অথবা কিছুদূরে অবস্থিত বয়লার হইতে আনীত গরম বাষ্প দ্বারা। এইভাবে প্রয়োজনীয় আলো এবং উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করা চলে। পৃথিবীর যে অঞ্চলের গাছ, সেই অঞ্চলের তাপমাত্রা ইহাতে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা চলে, এবং দেশী বা বিদেশী সব রকম ফুল বা ফলের গাছেরই বৃদ্ধি বা বৃদ্ধিরোধ দুই-ই ইচ্ছামত করা যায়। তাই মরশুমের বাহির হউক বা মরশুমে হউক সকল সময়েই সব রকম ফুল ও ফল উৎপাদন করা চলে। ইংল্যাণ্ডের প্রত্যেক বড় বাড়ির সঙ্গেই একটি করিয়া হট হাউস যুক্ত আছে। আমার মতে ভারতেও এইভাবে ফলমূল বা সব্জী এই রূপ লাভজনকভাবে উৎপাদন করা যাইতে পারে। কাঁচের ঘর থাকিলে আবহাওয়ার কঠোরতা হইতে তাহাদের রক্ষা করা সহজ হইবে।

প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া আসিয়াছি, আরও কিছুদূর চলিতে চাহি, কারণ ইহা অকারণ নহে। আমার স্বদেশবাসীরা অবশ্যই জানিতে উৎসুক হইয়াছেন ইংল্যাণ্ডে কি কি সব্জী পাওয়া যায়। প্রথমেই নাম করিতে হয় আলুর। তাহার সঙ্গে মাংস ও রুটি যুক্ত হইয়া ইংরেজদের প্রধান খাদ্য হইয়া থাকে। সকল শ্রেণীরই ইহাই প্রধান খাদ্য। প্রাচীন জগৎ নূতন জগতের কাছে অর্থাৎ অ্যামেরিকার কাছে, দুটি খাদ্য বিষয়ে কৃতজ্ঞ—আলু ও মকাই। অ্যামেরিকা আমাদের দিয়াছে আনারস। এবং তামাককেও আমি অগ্রাহ্য করছি না। প্রথম প্রথম আমরা যেমন করিয়াছি ইংরেজরাও তেমনি প্রথমে আলু খাইতে রাজি হয় নাই। উহারা বলিত, আলুর কথা বাইবেলে নাই। এরপরেই নাম করিতে হয় বাঁধাকপির। ইংল্যাণ্ডের এটি একটি মূল্যবান সব্জী। ফুলকপিও দেখা যায়, কিন্তু এমন অপর্যাপ্ত নহে। গরমকালে সবুজ কড়াইশুঁটির মরশুম। কিন্তু উহারা কড়াইশুঁটি টিনে সংরক্ষিত করিয়া সকল ঋতুতেই ব্যবহার করে। ফ্রান্স হইতেও আসে, ভারতবর্ষেও ইহা ফ্রান্স হইতে আমদানি করা হয়। ভারতবর্ষেই কড়াইশুঁটি সংরক্ষিত করা যায় কিনা আমি জানি না, যথাকালে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। শুনিলাম ইউরোপের উৎপন্ন কড়াইশুঁটির স্বাদ ভারতের অপেক্ষা মিষ্টতর। আমি কিন্তু তুলনা করিয়া কোনও পার্থক্য বুঝিতে পারি নাই। লাউজাতীয় একরকম ফল আছে, ইহাকে 'ভেজিটেবল ম্যারে' (cucurbita Ovijera) বলা হইয়া থাকে, ইংরেজদের একটি প্রিয় খাদ্য, ইহার একজাতীয় মৃদু সুগন্ধ আছে। শসাও একটি প্রিয় খাদ্য, পাতলা

করিয়া কাটিয়া কাঁচাই খায়। খোসা বাদ দিয়া অথবা খোসাসুদ্ধ খাওয়া হইয়া থাকে। খাইবার সময় ইহার সহিত প্রচুর ভিনিগার ও ঝাল মিশাইয়া লয়। বড় আকারের কুমড়ো (cucurbita pepo) ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন হয়, ইহা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হইতেও আসে। উহাদের মূলা আমাদের দেশের মত বড় আকারের নহে, কিন্তু ইহাদের ওলকপি ও গাজর খুব উৎকৃষ্ট। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের বড় বড় শহরে আশেপাশে একমাত্র ইউরোপীয়দের জন্য যে ইউরোপীয় গাজর বর্তমানে উৎপন্ন হয়, তাহার স্বাদ আমাদের দেশের অনেকেই পান নাই। আমি তাঁহাদিগকে উহা একবার খাইয়া দেখিতে বলি। কাঁচা অবস্থায় বেশ মিষ্ট এবং কচকচ করিয়া চিবাইয়া খাওয়া যায়, ঠিক আধা-পাকা পেঁপের মতো। আমাদের দেশী গাজরে জলীয় অংশ বেশী, ইহার পরিবর্তে বিলাতি গাজরের চাষ করিলে হয়। কিন্তু ভয় হয ফলন খুব বেশি না হইতে পারে, এবং ফলন না হইলে চাষীরা ইহার দিকে ঝুঁকিবে না। স্পেনদেশীয় পেঁয়াজ আকারে প্রকাণ্ড, তাহা সিদ্ধ কবিযা খাওয়া হয়। ছোটগুলি চাকাচাকা করিয়া কাটিয়া ভাজা হয়। মাশরুম বা ছত্রাক (ব্যাঙের ছাতা) ইহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। বাহিরে যেখানে জন্মে সেখান হইতে অথবা অন্ধকার প্রকোষ্ঠে প্রচুর সার সার দিয়া খুব যত্নের সঙ্গে উৎপন্ন করা হয়। কয়েক জাতীয় ছত্রাক বিষাক্ত, কিন্তু এইগুলিকে পৃথক করিয়া চেনা কঠিন। ইংরেজরা 'ট্রাফল' জাতীয় ছত্রাকও খায়। একজাতীয় ট্রাফল কালো রঙের (Tuber cibarium) মাটির এক ফুট নিচে জন্মে, বাহিরে তাহার কোনও চিহ্ন থাকে না, অতএব কোথায় খুঁড়িলে ইহা পাওয়া যাইবে তাহা বুঝা যায় না। শোনা গেল ইহার সন্ধানের জন্য কুকুরকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। জেরুসালেম-আর্টিচোক এবং পারস্নিপ (মূলা জাতীয়) কিছু কিছু চলে। স্পিনিজ পাতা কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া খাওয়া হয়। টমাটো ইহারা প্রচুর খায়, ইহাদের মতে ইহা যকৃতের পক্ষে উপকারী। গ্রীন স্যালাড ইহাদের বড়ই প্রিয় খাদ্য। কাঁচা পাতা (সাধারণতঃ লেটিস) খণ্ড খণ্ড সিদ্ধ ডিম, বীট-শিকড়, লবণ, ভিনিগার, তেল ও অন্যান্য মশলা সহযোগে খায়। সিদ্ধ গলদা চিংড়ি কুচিকুচি করিয়া কাটিয়া ইহার সঙ্গে মিশাইয়া দিলে তখন ইহার নাম হয় লব্স্টার স্যালাড। ওয়াটার-ক্রেস্ একজাতীয় জলজ উদ্ভিদ, সেটিও কাঁচা খাওয়া হয়। আরও একটি নরম রসালো ডাঁটা জাতীয় এক রকম খাদ্য সিদ্ধ অবস্থায় খাইতে দেখিয়াছি। ইহার উপরের দিকটি শুধু দাঁতে কাটিয়া লয়, নিচের দিকটি শক্ত। নাম ভুলিয়া গিয়াছি। হয় তো অ্যাসপারাগাস্। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কোনও কোনও অংশে আমি রুবার্বের চাষ দেখিয়াছি। ইহার পাতা খাদ্যে সুগন্ধ যোগের জন্য ব্যবহার হয়। এইগুলিই ইংল্যাণ্ডের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিজ্জ খাদ্য।

নিরামিষ খাদ্যের প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের দুধের কথাও বলা উচিত। ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি ডেয়ারি ঘুরিয়া যাহা দেখিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে ইউরোপীয়ানদের যদি কিছুমাত্র রুচিজ্ঞান থাকে তবে তাহারা অবশ্যই ভারতীয় দুধকে অত্যন্ত ঘৃণার বস্তু বলিয়া মনে করিবে। গোরুর প্রতি হিন্দুরা যে ব্যবহার করে, তাহার মত এতখানি লজ্জাজনক অধঃপতন

সম্ভবত তাহার কোনও বিষয়ে হয় নাই। অনাহারক্লিষ্ট, কঙ্কালসার পশুগুলি এমনই দুর্বল যে ল্যাজ দিয়া মাছি তাড়াইবার ক্ষমতাও কমই অবশিষ্ট আছে, এ দৃশ্য নবাগত ইউরোপীয়ের চোখে সুখের নহে, এবং গোজাতি যে হিন্দুর বিশ্বাসমতে অতি পবিত্র এ-কথাও তাহারা বুঝিবে না। তাহার কাছে এটি বড়ই লজ্জাকর বোধ হইবে যে, যে মানুষেরা বিসমার্কের রাজনীতির ত্রুটি বাহির করে, হারবার্ট স্পেনসারের সমালোচনা করে, জন স্টুয়ার্ট মিলের ভ্রম সংশোধন করে, এবং হাক্সলি, টিন্‌ডাল এবং ফ্যারাডের গবেষণা বিষয়ে বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে, তাহারা স্থির মস্তিষ্কে এবং অতি উৎসাহের সঙ্গে এই সব দুর্দশাগ্রস্ত পশুদের যন্ত্রণা যাহাতে দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহার জন্য আন্দোলন করিতে পারে। সে স্বভাবতই প্রশ্ন করিবে, "এই জীবন হইতে তাহাদের মুক্তি দেওয়া কি তাহাদের পক্ষে আরামদায়ক নহে?" তাহার বন্ধু বলিবে "চুপ! তুমি পাপ বাক্য উচ্চারণ করিতেছ।" ভারতের বহু দুর্দশা আছে। ভারতের বহু সন্তান বহুবিধ অন্যায় কাজ করিয়া থাকে, এবং সমস্ত দেশে হিন্দুরা জাতি হিসাবে গোরুর উপর যে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া থাকে তাহা সেই সব দুষ্কার্যের অন্যতম। যে পশু আমাদের এত উপকার করে, তাহার প্রতি এই অমানুষিক বর্বরোচিত ব্যবহার কোনো দয়ামায়াবোধসম্পন্ন সরকারের অধীনে চলিতে দেওয়া উচিত নহে। আমার মতে অবিলম্বে খুব কঠোর আইনের সাহায্যে হিন্দুদিগকে এই দুষ্কার্য হইতে নিবৃত্ত করা উচিত। ইউরোপের বহু গোশালা আমি দেখিয়াছি। সেগুলি বেশ প্রশস্ত এবং তাহাতে হাওয়া খেলিবার সুবন্দোবস্ত আছে, বারান্দা আছে, এবং সে সব এমন পরিচ্ছন্ন যে তাহা মনুষ্যাবাস হইতে পৃথক নহে। মেঝে ইট দিয়া ঢাকা, তাহার উপর প্রচুর শুষ্ক ঘাস ও খড় ছড়ানো আছে। ইহার উপর গোরুগুলি ইচ্ছামত দাঁড়াইয়া অথবা শুইয়া থাকিতে পারে। এই খড়ের বিছানা প্রতিদিন বদল করা হয়, এবং মেঝের যাবতীয় জিনিস দূরে অবস্থিত ধাপায় নিক্ষিপ্ত হয়। জঞ্জাল সরাইবার পরে প্রতিদিন মেঝে ঝাঁটার সাহায্যে পরিষ্কার করা হয় এবং গ্রীষ্মকালে জলে ধোয়া হয়। গোরুদের পশ্চাৎ দিকে দেয়াল বরাবর প্রণালী কাটা আছে, ধোয়া জল সেই পথে নিষ্কাশিত হইয়া যায়। সেই প্রণালীটিও দিনে দুইবার ধোয়া হয়। দুগ্ধবতীদের আহার্যের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া হইয়া থাকে। তাহাদের খাদ্যের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ অ্যালবুমেন ও ফসফেট দেওয়া হয়, ইহাতে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ভারতবর্ষের দুগ্ধ বিক্রেতারা সাধারণতঃ যেভাবে গোরুর মাংস, চর্বি এবং রক্তকে দুধে পরিণত করে, ইহারা তাহা করে না। আমি দেখিয়াছি ইংল্যাণ্ডে একরের পর একর জমিতে নানা জাতীয় শালগম উৎপাদন করে শুধু গোরুর খাদ্যরূপে ব্যবহারের জন্য। খাশ বাংলাদেশে এই উদ্দেশ্যে এক একর জমিও ছাড়া হয় বলিয়া আমার জানা নাই। উত্তর ভারতে Sorghum বা জোয়ারের কিছু চাষ হয় এই উদ্দেশ্যে। ইউরোপে পানের জন্য গোরুকে বিশুদ্ধ জল দিবার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। ছোটদের টাইফয়েড ফিভার অনেক সময় অপরিষ্কার জল খাওয়া গোরুর দুগ্ধ হইতে থাকে এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে গোরুর দুগ্ধের সঙ্গে সব রকম নোংরা জলই মিশ্রিত

করা হইয়া থাকে। এরূপ দুধ খাইয়া কত শিশুর মৃত্যু ঘটে তাহার হিসাব কেহ রাখে না। তাহার পর ইউরোপের ডেয়ারির কথা। এইখানে, যেখানে দুধের ভাণ্ডার থাকে এবং ক্রীম প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিবার মত। এই স্থানের ঘর যথেষ্ট উচ্চ, আলো হাওয়া প্রচুর, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্থানটি পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, ইহার মধ্যে কোথাও ফাঁকি নাই। নিকটে কোনও দুর্গন্ধ বিস্তারকারী অথবা শূকরদের থাকিবার স্থান থাকিলে চলিবে না। এমন অযোগ্য স্থান হইতে দূরে ডেয়ারী নির্মাণ করা হইয়া থাকে। টাটকা দুধ ব্যতিরেকে অন্য কোনও প্রকার খাদ্য—যথা মাংস, চীজ, কিংবা অন্য কোনও জান্তব খাদ্য এই ডেয়ারিঘরের ভিতরে খাওয়া চলিবে না। এমন কি একফোঁটা দুধ মেঝেতে পড়িলেও অল্প সময়ের মধ্যে তাহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। তাক ও মেঝে প্রতিদিন অতি যত্নের সঙ্গে ঘষিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করা হয়। ডেয়ারির কাজের জন্য যে সব মেয়ে নিযুক্ত আছে, তাহাদেরও সব সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিতে হয়। ডেয়ারির ভিতরের হাওয়া যাহাতে কোনও মতেই দূষিত হইতে না পারে তাহার জন্য যথাসাধ্য যত্ন লওয়া হয়। ডেয়ারির কাজে নিযুক্ত মেয়েরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও সেখানে কাটাইতে পারে না। ধনীরাও ডেয়ারি রাখিয়া থাকেন। ইঁহাদের ডেয়ারিতে পরিচালনা বন্দোবস্ত আরও ব্যাপক। প্রয়োজনের জন্য প্রচুর ব্যয় করিবার পরেও ডেয়ারিটি যাহাতে দেখিতে খুব মনোহর হয় তাহার জন্যও যত ইচ্ছা টাকা খরচ করা হয়। জানিতে পারিলাম একটি গোরুর দাম পাঁচ হাজার পাউণ্ড, এবং এই দাম খুব বেশি মনে করা হয় না। এত দাম দুধ বেশী দিবার জন্য নহে, ইউরোপীয় আদর্শে যে গোরু দেখিতে সুন্দর তাহার জন্য এই দাম। একটি দণ্ডের মত পিঠটি সরল, মাথাটি ধীরে ধীরে সরু হইয়াছে, বড় বড় দু'টি চোখ উজ্জ্বল দেখাইতেছে, ঘাড় হ্রস্ব, বাঁটগুলি উত্তম আকারের, এবং দেহটি মসৃণ রেশমের মত লোমে ঢাকা —দুগ্ধবতী গাভীর অন্যান্য গুণের মধ্যে এগুলি অন্যতম। আয়ারশিয়র ও অলডারনি (চ্যানেল দ্বীপ) গোরু, ব্রিটেনের কয়েকটি বিখ্যাত পালিত গোরুর জাত। যে সব যত্নের কথা উল্লেখ করিলাম তাহা বিবেচনা করিলে ইংল্যাণ্ডের দুধ যে ভারতীয় দুধ হইতে বিশেষরূপে শ্রেষ্ঠ তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। গোয়ালা নিজেই গোরুর মালিক হইলে লণ্ডনেও ভাল দুধ পাওয়া যায়। এমন কি সাধারণ দুধের দোকানের দুধ আমি খাইয়া দেখিয়াছি (এক গ্লাস, দাম এক পেনি) সে দুধ খুব সুস্বাদু, অন্ততপক্ষে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট দুধের অপেক্ষা ভাল। লণ্ডনের কয়েকটি ডেয়ারিও আমি দেখিয়াছি। লণ্ডনে সাধারণতঃ গো-হত্যা করা হয় না, কিন্তু আমি এই সব শহরের ডেয়ারিতে নিজে যাহা দেখিয়াছি এবং জানিতে পারিয়াছি তাহাতে মনে হয়, যখন দুধ দিবার ক্ষমতা থাকে না তখনই সেই গোরুকে কসাইয়ের কাছে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। কলিকাতার হিন্দু গোয়ালারাও ইহাই করিয়া থাকে। আইন অনুযায়ী ইংল্যাণ্ডে দুগ্ধবতী গাভী মাংসের জন্য হত্যা করা নিষেধ, তবু যতটা খাদ্য দরকার তাহা শুকনা গোরুরা পাইতে পারে না। কাজেই বাছুর অবস্থায় যতটা খাদ্য পাওয়া যায় তাহা যোগান দিয়ে তাহাদিগকে বড় হইবার সুযোগ দেওয়া হয়। যাহারা বাকি থাকে তাহাদিগকে হত্যা করিয়া

'ভীল' (বাছুরের মাংস) রূপে ব্যবহার করা হয়। আমি ইংল্যাণ্ডে একটি অতি নিষ্ঠুর প্রথা দেখিয়াছি। অসহায় বাছুরগুলিকে তাহারা রক্ত মোক্ষণের দ্বারা বধ করে, ইহাতে তাহার মাংস শাদা রঙের হয়।

দেখা যাইতেছে কোনও কোনও হিন্দু ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া, ইচ্ছা করিলে জাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে। চাল ময়দা পাওয়া যায়, জার্মানি ও ঈজিপট হইতে ডাল আমদানি হয় (মশুর জাতীয়)। সব্জী অপর্যাপ্ত, ফলফুলও তাই, ভাল দুধ মাখন এবং চিনি যত ইচ্ছা পাওয়া যায়।

আমরা ১৮৮৬ সনের সাধারণ নির্বাচন দেখিলাম। চেল্‌সী আমাদের কাছেই অবস্থিত, এবং এইখানে আমরা স্যার চার্লস ডিল্‌ক্‌ এবং মিস্টার হুইটমোরের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সে সময়ের জন্য চেলসী স্থানটি আগাগোড়া ঈটান্‌স্‌উইল (পিকউইক পেপার্স দ্রঃ) হইয়া উঠিল। যেদিকে তাকান যায় সেদিকেই বড় বড় প্ল্যাকার্ড, এবং তাহাতে লেখা "ভোট ফর হুইটমোর" অথবা "ভোট ফর ডিল্‌ক্‌।" ইহারা যেন দর্শককে বলিতেছে "Short is your friend, not Codlin"—অর্থাৎ তোমাদের বন্ধু শর্ট, কডলিন নহে (ডিকেনসের দুটি চরিত্র)। কিংস রোডে প্রকাণ্ড এক ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা সবাইকে সার চার্লস ডিল্‌কের কৃতিত্বের কথা ঘোষণা করিতেছে। অন্যদিকে ফুলহ্যাম রোডে অবস্থিত মিস্টার হুইটমোরের অফিসের বাহিরে নানা ক্যারিকেচার চিত্র, ছড়া ও নানা তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, মিস্টার গ্ল্যাডস্টোনের মত বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে আর জন্মায় নাই। এক পক্ষ অন্য পক্ষ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছে, তাহা বাহিরের লোকের দৃষ্টিতে দেখিলে দুই পক্ষেরই ক্ষমতার লোভ এবং স্বার্থপরতার পরিচয় ফুটিয়া উঠিবে। রোমান অ্যামফিথিয়েটারের অঙ্গনে পুরাকালে গ্ল্যাডিয়েটরগণ যেমন লড়াই করিত, এখানে দুটি রাজনৈতিক দলের নেতারাও তেমনি মরীয়া হইয়া লড়াই করিয়াছেন। মানুষ মানুষে শত্রুতা সৃষ্টির ক্ষেত্ররূপে ধর্মের পরেই রাজনীতির স্থান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংল্যাণ্ডে রাজনৈতিক মতবাদ পুরুষানুক্রমিক, ভারতে ব্যবসা বা অন্য কোনও বৃত্তি যেমন। উহাদের কেহ গর্বের সঙ্গে বলে 'আমরা চিরদিন রক্ষণশীল' অথবা 'আমরা চিরকাল উদারপন্থী।' তবে কার্যক্ষেত্রে দুই দলের লোকেরা যাহা ছিল বা যাহা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না, কারণ দুটি পার্টির মধ্যে পার্থক্য আকাশপাতাল নহে। দুটি দলই জনমতকে অনুসরণ করিয়া চলে, এবং তাহাদিগকে জনমত গঠন করিতে হয়, তাহাদিগকে শিখাইতে হয়, সংহত করিতে হয়, এবং ভাগ্য খারাপ তাঁহারই যিনি পিছুইয়া থাকেন, অথবা যিনি বেশিদূর অগ্রসর হইয়া যান। অতএব সম্মুখবর্তী প্রত্যেকটি পদক্ষেপের আগে পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়, ভারতবর্ষে ঠিক ইহার বিপরীত। এখানে নেতারা নিজেরাই চলেন, ট্রেনবিহীন ইঞ্জিন যেমন চলে, এবং যখন তাঁহারা পিছনে তাকান তখন দেখিতে পান বহুদূরে ঝিমন্ত অবস্থায় জনতা অতি দ্রুত তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের অধৈর্য ঝোঁকের মাথায় কাজ করিবার অভ্যাসকে তাঁহারা সংযত করেন না। তাঁহারা প্রথমে জনসাধারণকে গড়িয়া পিটিয়া একটা সংহত সুসংগঠিত দলে পরিণত করেন না। তাহা না হইলে তাহাদের নিকট হইতে যাহা প্রত্যাশা করেন, তাহা যে কি বস্তু সে বিষয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের কোনও ধারণাই নাই।

আমাদের ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে "আবশ্যিক শিক্ষা" নামক একটি প্রস্তাব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি এ বিষয়ে আর কিছু বলিতে চাহি না, পাছে বলিতে গিয়া বেশি বলিয়া ফেলি। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল পরিবার সব সময়েই রক্ষণশীল মনোনয়ন প্রার্থীকে সমর্থন করে, যেমন উদারপন্থী পরিবার উদারপন্থী প্রার্থীকে সমর্থন করে। রক্ষণশীল হউক বা উদারপন্থী হউক, মানুষের মন জিব্রলটারের পাহাড়ের মত কঠিন, এবং তাহার উপরে প্রতিপক্ষের কোনও যুক্তিই কোনও দাগ কাটে না। তাহাদের মধ্যে বহু মতান্ধ গোঁড়া ব্যক্তি আছে, যাহারা তোমার বিপরীত মতের জন্য তোমাকে প্রকাশ্যে পুড়াইয়া মারিতে চাহিবে। ইংল্যাণ্ডে যে জাতিভেদ এবং রাজনৈতিক গোঁড়ামি আছে, তাহা কত গভীর তাহা অনভিজ্ঞ আমরা বুঝিতে পারি নাই। আমাদের কাছে সকল ব্রিটিশ মানুষই (আয়ার্ল্যাণ্ডবাসীদের লইয়া) এক মনে হইয়াছে। উচ্চনীচ, রক্ষণশীল বা অতি উদারপন্থী, দুই-ই আমাদের চোখে সমান। আমরা জানিতাম না নিম্নস্তরের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব পোষণ করা পাপ, অথবা উদারপন্থীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করা রক্ষণশীলদের প্রতি অপরাধ। ঘরোয়া বিবাদেও খোলাখুলি ভাবে পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। এক দলের সহিত আলাপ করিলে, অন্য দল তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবে এমন আশা করিও না। মনে হয় আমাদের অজ্ঞতা এবং অহমিকা বোধের জন্য এ সব ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সতর্ক হইতে পারি নাই। এবং এই কারণেই, যেখানে নীরব থাকিলে বিজ্ঞতার কাজ হইত, সেখানে হয়ত কথা বলিয়াছি। বাঙালীর মনে সম্প্রতি কিছু নব্য পরহিতব্রতী স্বাধীন চিন্তা জাগিতেছে, কিন্তু তাহার বৈষয়িক জ্ঞানের অভাব আছে। বদ্ধ ধারণা লইয়া যে-সব দল রহিয়াছে, তাহাদিগের হইতে স্বতন্ত্র আর একটি দল আছে, সেই দলের লোকদের মত বা ধারণা দোলায়িত হয়। তাহারা একবার এক দলকে সমর্থন করে, একবার অন্য দলকে সমর্থন করে। প্রধান দুটি দল প্রায় সমান, উদ্বৃত্ত অদলীয় লোকেরাই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। ইহাদের অসম্ভব ক্ষমতা। চেলসীতে সার চার্লস ডিল্‌কের পক্ষে যে ইলেকশন প্রচার চলিতেছে, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল এ প্রচার কিছু যেন প্রাণহীন। কিন্তু মিস্টার হুইটমোরের প্রচার ছিল খুব দুর্দান্ত। কিংস রোডের এক বাড়িতে ভোট গ্রহণ পর্ব অনুষ্ঠিত হইল। সমস্ত দিন ধরিয়া সে অঞ্চল ভোটারদের সমর্থন এবং বাজে লোকের ভিড়ে পূর্ণ ছিল। এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে রাত্রি ১০টার সময় আমি সেখানে ভোটিং-এর কাণ্ড-কারখানা দেখিতে গিয়াছিলাম। সে সময়ে ভোট গণনা চলিতেছিল। ফলাফল জানিবার জন্য শত শত ব্যস্ত লোকে রাস্তাটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পূর্ণ হইয়া গিয়ছিল। আশেপাশের পথেও বহু লোকের ভিড়। সবাই আশঙ্কা করিতেছিল একটা কিছু গণ্ডগোল বাধিবে। কারণ চেল্‌সী ও তন্নিকটস্থ স্থানসমূহ উৎসাহী লোকে পূর্ণ। সবাই ভাবিতেছিল এ উপলক্ষে অনেকের মাথা ভাঙিবে, এবং উপলক্ষটা তাহাতে আরও একটু উপভোগ্য হইয়া উঠিবে। শেষে রাত্রি ২টার সময় নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হইল। রক্ষণশীল প্রার্থী মিস্টার হুইটমোর জয়লাভ করিলেন। জনতার আনন্দচিৎকারে কান ফাটিয়া

যাইবার উপক্রম হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিরুদ্ধ প্রার্থীর সমর্থকদের কণ্ঠ হইতেও হতাশার ধ্বনি একই উচ্চগ্রামে উঠিল। সবাই এই ফলাফলে বিস্মিত। কাবণ, চেল্সীর আসনটি সার চার্লস ডিল্‌ক্ গত কুড়ি বৎসরের অধিককাল ধরিয়া দখল করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নাম তাঁহার পার্টির নিকট শক্তির দুর্গ স্বরূপ দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফল ঘোষণার অল্পক্ষণ পরেই মিস্টার হুইটমোর এবং সার চার্লস উভয়েই উপরের ব্যালকনিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিস্টার হুইটমোর তাঁহার সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাইলেন। সার চার্লস তাঁহার প্রতিপক্ষের বিজয়লাভে তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইলেন। এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে, বিজয়ীর জয়লাভ ন্যায্য ভাবেই হইয়াছে। তাঁহারা উভয়ে করমর্দন করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু জনতার মধ্যে যে উত্তেজনা জাগিয়াছিল তাহা তখনও থামে নাই। ভোরবেলা পর্যন্ত পথ জনাকীর্ণ ছিল, এবং এক দলের উল্লাস ও অন্যদলের আর্তধ্বনি পরস্পর পাল্লা দিতেছিল। গুরুতর লড়াই কিছু বাধে নাই।

কিন্তু এখানে আমি লড়াই না দেখিলেও আর একটি ইলেকশনে লড়াই আমি দেখিয়াছি। এক বন্ধু সেখানে একটা কিছু ঘটিবে অনুমান করিয়াই আমাকে সেখানে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার নির্দেশক্রমে আমি আমাব মাথা হইতে পাগড়ি খুলিয়া তাহার বদলে মজুরের টুপি পবিলাম। আমার আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, অতএব দেখিলাম স্থানটি লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছে। বসিবার স্থান আর পাইলাম না, হলের পিছন দিকে বহু লোক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্যে আমিও নীরবে গিয়া দাঁড়াইলাম। ইহার পরেও লোক আসিতে লাগিল এবং ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদের গায়ে গায়ে লাগাইয়া দাঁড়াইতে হইল, কোথাও ফাঁক ছিল না। এই পল্লীতে দুই দলের এক দল কর্তৃক মনোনীত এক প্রার্থী বক্তৃতা দিবেন কথা ছিল। যথাসময়ে তিনি ভাষণ দিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহার সমর্থক দলের হর্ষধ্বনিতে হলের চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। তিনি তাহা থামিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। প্রথম সারির ব্যক্তিগণ চুপ করিলেন, কিন্তু অন্য অংশের লোকেরা ক্রমাগত ছড়ি ও জুতা ঠুকিতে লাগিলেন। শব্দ থামিল না। এক দিকের থামে ত অপর দিকে আরম্ভ হয়। প্রথম সারির লোকেরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পিছনে তাকাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। বক্তা দুই-একবার কিছু বলিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু জনতার চিৎকারে তাহা আর শোনা গেল না। অনেক সাইলেন্স, সাইলেন্স ধ্বনি তুলিলেন, কিন্তু তাহার উত্তরে শুধু 'বু'-'বু' ধ্বনি উঠিল এর পরেই তুমুল কাণ্ড। প্রথম সারির লোকেরা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, মাথায় টুপি পরিলেন। কয়েকখানি চেয়ার হাওয়ায় চড়িয়া ভিড়ের মধ্যে আসিয়া পড়িল। সেইখানে জোর লড়াই আরম্ভ হইয়া গেল, কিন্তু ভিড়ের চাপে কেহ মাটিতে পড়িতে পারিল না। মুহূর্তের মধ্যে চেয়ারগুলির পিঠ, হাত ও পাগুলি চেয়ার হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, এবং এই অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উত্তেজিত জনতা অতি উৎসাহের সঙ্গে লড়াইতে মাতিয়া উঠিল। কয়েকজন শক্তিমান লোক একখানি বেঞ্চি টানিয়া তুলিতে পড়িয়া গেল, তাহার নিচে কয়েকটি মাথা চাপা পড়িল, এবং খানিকটা স্থান সেজন্য শূন্য দেখাইল সেই কালো টুপির

অরণ্যে। তাহার পর হুশ্‌—বাতাসে ছুটিয়া আসিতেছে, জলের ফোঁটার মালা গাঁথিয়া—যেন বড় একটি ধূমকেতু ও তাহার ল্যাজ ছুটিতেছে। সেটি জলভরা একটি গ্লাস, বক্তার টেবিলে ছিল। সভার কাজ এইভাবে চলিতে লাগিল, খুবই আনন্দজনক সন্দেহ নাই। প্রত্যেকেই খুব উৎসাহের সঙ্গে এ কাজ করিয়াছে এবং উপভোগও করিয়াছে পুরোপুরি। রক্ত যখন শিরায় টগবগ করিয়া উঠিল, তখন তাহা সকল বাধা ভেদ করিয়া নাক দিয়া, মাথা দিয়া এবং দেহের অন্যান্য অংশ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। এইভাবে যাহাদের মাথা কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল, তাহারা পশ্চাদপসরণ করিবামাত্র তপ্ত রক্তবিশিষ্ট অন্যরা সবাইকে ঠেলিয়া আসিয়া ঢুকিয়া পড়িল এবং তাহাদের স্থান দখল করিল। তাহারা বাহির হইতে ছুটিয়া আসিয়াছিল। এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছু নিরাপদ দূরত্ব হইতে সব পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম, কিন্তু এখন বাহির হইতে বহু নবাগত আসিয়া আমাদিগকে রবিনসন ক্রুসো গল্পের নেকড়ে বাঘদের মত সম্মুখেব দিকে ঠেলিয়া দিল। কিন্তু আমার মাথাটি ভাঙুক, নাক চ্যাপটা হইয়া যাউক এবং আমার চোখের চারিদিকের রং আরও কিছু কালো হউক, ইহা আমার বিশেষ পছন্দ না হওয়াতে, দশাসই চেহারার যে লোকগুলি আক্রমণ করিতে আসিতেছিল তাহাদের কনুইয়ের নীচ দিয়া খুব কৌশলে ঐ স্থান হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইহা করিতে আমাকে দস্তুরমত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। আমার ন্যায় শান্তি-বিলাসীর পক্ষে স্থানটি আর উপযুক্ত ছিল না, কারণ এইরূপ একটি অর্থহীন কাজে আমার কোনও অংশ ছিল না। আমার এখন অনুতাপ হইতে লাগিল আমার পাগড়িটি ফেলিয়া আসিলাম কেন। কারণ, এমন উত্তেজিত অবস্থায় উহারা আমার ভারতীয়ত্ব অন্যান্য সময়ের ন্যায় যদি মান্য না করিয়া আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া কিছু করিতে আসিত, তাহা হইলে এখন সেখানে যে টুপিটি রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা পাগড়িটি অনেক ভালভাবে মাথাটিকে বাঁচাইতে পারিত। আমাদের গ্রামের একটি লোক অন্ততপক্ষে এ বিষয়ে আমাব আদর্শ। সে দল ধরিয়া প্রতিবেশীর বাগান হইতে কাঠ চুরি করিতে গিয়া মার খাইবার সময় তাহার টাক মাথাটায় তাড়াতাড়ি কাপড়ের পাগড়ি বাঁধিয়া লইত কিন্তু এখন ত আমার কোনও উপায়ই নাই। বাহির হইয়া যাইবার কোনও উপায় থাকিলেও দরজা ত বাহিরের মজা দেখা লোকের ভিড়ে বন্ধ, এবং যখন সকলেরই দৃষ্টি সম্মুখে নিবদ্ধ, এবং যখন শত্রু-মিত্র ভেদে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে গুঁতান কর্তব্য বোধ করিতেছে, তখন সেখান হইতে পলায়ন চরম ভীরুতা। লড়াই রত মানুষের মধ্যে কে কোন্‌ দলের, কার কি রাজনৈতিক মতবাদ তাহা কে জানে, কেই বা কাহাকে জিজ্ঞাসা করে? এবং গুঁতাগুঁতির জন্য তাহার প্রয়োজনই বা কি? কিছুই আসিয়া যায় না। যাহাকে মারিতে হইবে সে হাতের কাছ থাকিলেই যথেষ্ট, এবং যাহারা পাশে উপস্থিত তাহারা সে সময়ে একটু ঠেলিয়া সরিয়া দুইজনের হাতের ব্যবহারের উপযুক্ত একটু জায়গা করিয়া দিলেই হইল। খুব স্ফূর্তির সঙ্গে তাহারা লড়াই করিতে লাগিল; ঠিক যেন স্কুলের বালক সব। যাহারা দাঁড়াইয়া ইহা উপভোগ করিতেছিল, তাহারা দেখিতেছিল কোনও পক্ষ যেন অধিক সুবিধা না পায়।

গুঁতা খাইয়া একজন ধরাশায়ী হইবামাত্র দর্শকদিগের ভিতর হইতে একজন আসিয়া তাহার স্থান গ্রহণ করিতেছিল। এগুলি উপযুক্ত হাল্কা লড়াই, প্রায় খেলা, এবং যাহারা শুধু দর্শকরূপে ক্লান্ত হইয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের জন্য। এই রকম একটি লড়াইতে একজন বলবান্ লোক একটি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান্ উৎসাহীকে উত্তেজিত করিয়া তাহার সঙ্গে লড়াইতে উদ্যত হইতেই দেখা গেল বিকট চেহারার একটি লোক (সম্ভবত উত্তর স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী) ঠেলিয়া আসিয়া দুর্বল লোকটিকে সরাইয়া দিয়া সবল লোকটিকে বলিল, I am your man. come on.—অর্থাৎ একবাব আমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা কর ত চাঁদ! লড়াই অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। প্রথম লোকটি ঘুঁসি খাইয়া চোখ ফুলাইল, নাক দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল, এবং পর পর চারবার ধরাশায়ী হইল। কিন্তু তবু হার মানে না। যতবার পড়ে ততবার তড়াক করিয়া উঠিয়া দর্শকদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আবার আক্রমণ করে! "Well done Rob Roy" বলিহারি রব রয়! (স্কটের নভেল দ্রষ্টব্য) এক দল চেঁচাইল। সম্ভবত লোকটির লাল চুলেব জন্য রব রয় বলা হইল। অন্য দল পরাজিতকে উৎসাহিত করিতে লাগল "Try again, Bill"—আবার লেগে যাও বিল। চতুর্থ বার যখন সে পড়িয়া গেল, তখন তাহাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে হইল। দাঁড়াইয়া বলিল, আর-একদিন দেখিয়া লইব। এই উপযুদ্ধ চলিতেছিল এক দিকে, কিন্তু আসল রণাঙ্গনে চলিতেছিল মহাযুদ্ধ। হঠাৎ কি হইল, দেখি, সেই নিরেট ভিড় পশ্চাদপসরণ করিয়া সিঁড়ি ও ভিতরের পথ খালি করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিল। দশ গুণিতে যত সময় লাগে তাহা অপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল। তাহাদের সম্মিলিত চাপে আমিও তাহাদের সঙ্গে পথে আসিয়া পড়িলাম। সেখানে দেখি জনতা এক এক চক্রে ভাগ হইয়া লড়াই চালাইতেছে। ভিতরের লড়াইয়ের সঙ্গে ইহাদেব কোনো সম্পর্ক নাই, ইহারা এখানে স্বাধীনভাবে লড়াই চালাইতেছে। কিন্তু হলের ভিতরেব লড়াই অনেক বেশী পূর্ণাঙ্গ ছিল, কারণ সেখানে ভাঙা আসবাব হইতে আক্রমণ ও প্রত্যাক্রমণের অস্ত্র সংগ্রহ করা হইয়াছিল। আমাব মনে হইল, ব্রিটিশরা আর যাহাই হউক, সভ্যতাপ্রাপ্ত বর্বর। কিন্তু তবু তাহারা ঝড়বৃষ্টি, বন্যা, ভূকম্প এবং আগ্নেয়গিরিপূর্ণ পৃথিবীর মতই জীবন্ত মানুষ। আর আমরা, যতদূর জানি, মৃত পর্বতমালা, জলহীন মরু, উদ্ভিদহীন প্রান্তর, এবং জীবহীন নীরব চাঁদের মত নিষ্প্রাণ। মনে রাখিতে হইবে, সভ্যতায় অধিক অগ্রসর দেশে, যেমন ইংল্যাণ্ডে, সব জিনিসেরই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মিলিবে। সবচেয়ে উদার এবং সবচেয়ে নীচ, দানবীর এবং ব্যয়কুণ্ঠ, সর্বাপেক্ষা ধার্মিক এবং সর্বাপেক্ষা অধার্মিক, সর্বাপেক্ষা গুণ্ডা প্রকৃতির লোক এবং সর্বাপেক্ষা খ্রীস্টের অনুগত, মানুষের দেখা মিলিবে। ইংরেজী অভিধানে 'কাউয়ার্ড' শব্দ অপেক্ষা অধিক অপমানকর অর্থদ্যোতক শব্দ আর নাই। প্রায় সকল ইংরেজই বরং মৃত্যু বরণ করিবে তবু অন্য ইংরেজের মুখে কাউয়ার্ড বিশেষণটি শুনিতে চাহিবে না। কাউয়ার্ডের মত কাজ তো করিবেই না। অবশ্য দৈহিক শক্তি সম্পর্কেই কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খ্রীস্টান হওয়া

এবং সে ধর্ম পালন না করা, অখ্রীস্টান হইয়া স্ত্রীর নির্দেশে চার্চে যাওয়া, অথবা এই জাতীয় সব কাজকে কাউয়ার্ডিস বা ভীরুতা মনে করা হয় না। আমাদের দেশেও এ জাতীয় কাজ ভীরুতা নহে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিয়াছি। এই-সব লড়াইয়ে কোনও দুইটি ব্যক্তি যুগ্মভাবে একটি ব্যক্তির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া লড়াই করে নাই। আমাদের দেশে এ রকম ঘটে এবং 'ভদ্রলোক' বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যেই ঘটে। ব্রিটিশদের এই লড়াইয়ের রীতিকে আমি উচ্চ প্রশংসা করিতে পারিতাম, কিন্তু পারিলাম না। কারণ, আমাদের দেশে সম্প্রতি কয়েকজন ইংরেজ দুর্বল অসহায় ভারতীয়কে গুঁতাইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা যে কখনও পাল্টা মারিবে না তাহা জানা সত্ত্বেও। এবং আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহারা মার খাইয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া যাইবার পরেও তাহাদের পেটে লাথি মারা হইয়াছে। ইংল্যাণ্ডের কোনও কোনও কাউন্টিতেও এইরূপ পাশবিক লড়াই হইয়া থাকে শুনিয়াছি। কিন্তু এ কথা সত্য যে, সাধারণতঃ ব্রিটিশরা এরূপ আচরণকে ভীরুতা গণ্য করিয়া থাকেন। কোনও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি পড়িয়া গেলে তাহাকে আর মারা হয় না। কিংবা প্রতিপক্ষ দুর্বল হইলে তাহাকে আঘাত দেওয়া হয় না, অবশ্য যদি তাহারা প্রত্যাক্রমণ না করিতে চাহে। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ব্যাপারে ইউরোপীয়দিগকে কিঞ্চিৎ মহাভারত পাঠ করিতে অনুরোধ জানাই। চার হাজার বৎসর পূর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কি করা হইয়াছিল তাহা তাঁহাদের জানা উচিত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে খ্যাত ব্যক্তিরা অস্ত্রহীন অথবা দুর্বল, বর্বর প্রতিপক্ষের বুকে কি বুলেট বিঁধাইতে পারেন? অশ্বথামা অবশ্য দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে এই জাতীয় অন্যায় কাজ করিয়াছিলেন, শত্রুপক্ষীয় পদাতিকদের উপর গ্রীকদের অগ্নিবর্ষণের সঙ্গে ইহা কিছু পরিমাণ তুলনীয়, তবে অশ্বথামা উচ্চ ব্রাহ্মণ-সন্তান হইলেও বিশেষ ন্যায়-চরিত্রের লোক ছিলেন না। ভারতে এমনকি কোনও কোনও অসভ্য উপজাতিদের মধ্যেও এমন নিয়ম আছে যে, তাহারা মানুষের প্রতি বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে না। নিক্ষেপ না করা তাহারা গৌরবের বলিয়া মনে করে। বর্তমান সভ্যতা, গৌরবের হানি করিয়াও মারণাস্ত্রের উন্নতি ঘটাইয়াছে।

ইংরেজ জনসাধারণ ঘুঁসিখেলা, বা ঐ জাতীয় নানা লড়াই খুব উপভোগ করে। ইহা তাহারা স্কুলে অভ্যাস করে, বস্তিতে অভ্যাস করে, মাঠে করে এবং যেখানেই তাহাদের কর্মস্থান নির্দিষ্ট হয়, সেখানেই করে। যতদিন শক্তি থাকে করে। অবশ্য ভদ্রসন্তানেরা স্কুল ত্যাগ করবার পরে ঘুঁসি খেলায় মাতে না, তবু লর্ড বংশের কেহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে-কোনও নিম্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে লড়াই করাকে ঘৃণ্য মনে করে না, অথবা এমন লড়াইতে হারিয়া গেলে তাহাকে নিন্দনীয় বোধ করে না। কিন্তু অনেক সময় উহারা লড়াইয়ের জন্যই লড়াই করে, এবং ইহার মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রহিয়াছে মদ্য পান। লড়াইতে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিলে কোনও ব্যক্তি তাহার গা হইতে কোট খুলিয়া তাহা পথের উপর ফেলিয়া রাখে এবং পথিকদের প্রতি হুঙ্কার ছাড়িয়া বলে, "আমাদের কোটের প্রান্তটি মাড়াইয়া দিবার

সাহস আছে কার, অগ্রসর হও।" পুলিশের লোক যদি কাছে না থাকে, এবং থাকিলেও কিছু প্রশ্রয় দেয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে অনেকেই এই চ্যালেঞ্জে সাড়া দেয়, এবং সে পরে উপলব্ধি করে তাহার কোটটি এবং মুখখানা বাড়িতে রাখিয়া আসিলেই ভাল করিত। মুষ্টিযুদ্ধ আইনতঃ নিষিদ্ধ, কিন্তু গোপনে বহুস্থানেই এই প্রতিযোগিতা চলিয়া থাকে। আমি ইংল্যাণ্ডে থাকিতে, মুষ্টিযুদ্ধে একটি লোক মরিয়াই গেল। ইহা শুনিয়া আমি আমার এক বন্ধুকে বলিলাম, যে মরিল, তাহার যথাসময়ে বলা উচিত ছিল, আর নহে, এইবার থাম। এবং উপস্থিত লোকেরাও যে যথাসময়ে এ খেলা থামাইতে বলে নাই ইহা লজ্জাকর ব্যাপার। ইহার উত্তরে শুনিলাম, "লোকটার তেজ দেখিলে না?" এই জাতীয় লোকেরা কাহাকেও ভয় পায় না, বয়স্ক পুরুষ, স্ত্রী, কম বয়স্ক ছেলে-মেয়ে কেহই ভয় পায় না। ইহারা স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হয়, বিপদ উত্তীর্ণ হইবার আনন্দ লাভের জন্য; ইহারা জলের উপরে অথবা স্থলের উপরে আকাশ-পথে বেলুন-যাত্রা করে। ইহারা মেরুপ্রদেশে কঠিন বরফের উপর পথ কাটিয়া চলে, উদ্দেশ্য মেরুকেন্দ্রের ছোট্ট বিন্দুটি কোথায় তাহা আবিষ্কার করিবে। ইহারা পিপেয় ঢুকিয়া নায়াগারা প্রপাতে পড়িবে। কেননা তাহারা বড়াই করিয়া বলিতে পারিবে "আমি ইহা করিয়াছি।" আলপস পর্বতমালায় বৎসরে কত লোক মারা যায় সেও শুধু এই জন্যই, অর্থাৎ বড়াই করার জন্যই। ইহা ভিন্ন অন্ধকার মহাদেশের— আফ্রিকার জঙ্গলের ভিতর অভিযানের যে কত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে! ইহারা আকাশে, জলে, গরমে অথবা ঠাণ্ডায়, জ্বর ও কলেরা তুচ্ছ করিয়া, বাঘ-সিংহকে তুচ্ছ করিয়া চলে। সকল রকম বাধা ও বিপদকে ইহারা চ্যালেঞ্জ করে।

বর্তমানে ইহারা ভূতের ভয়ও করে না। ডাইনি, দুষ্টু শিশু ভূত, অথবা পরী, কাহাকেও নহে। এমন কি যে সব ছোট ছোট দুষ্টু ছেলে খালি পায়ে অ'হ্রদের নিকটে কর্দমাক্ত স্থানে লম্ফঝম্প করিয়া বেড়ায়, তাহারাও এই সব ভূত ইত্যাদিকে ভয় করে না। কিন্তু ভারতবর্ষের পল্লীতে এই সব ভূত-প্রেত কি অনিষ্টই না করে। বিশেষ করিয়া বালকদের কাছে ইহা বিভীষিকা। ভারত সরকারের উচিত ভূত শিকারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা। সাপ অথবা বাঘ শিকারের জন্য যেমন পুরস্কার দেওয়া হয় ঠিক তেমন। এই কাজের ভার পাইতে পারে এমন অনেক অভিজ্ঞ লোক আমাদের মধ্যে আছে। আমি আমার কথার প্রমাণ স্বরূপ একটি লোকের নাম করিতে পারি, যে লোকটি কয়েকদিন আগে হাওড়াতে একটি প্রেতকে হত্যা করিয়াছে। অবশ্য ঐ প্রেত যে ছেলেটির উপর ভর করিয়াছিল, প্রেত-মারণের প্রক্রিয়ার ফলে সেও মারা গিয়াছে। কিন্তু সেটা আদৌ বড় কথা নহে। প্রক্রিয়া যাহার হাতে অতটা কঠিন হয় না, এমন লোকও আমার বাড়ির পাশেই থাকে। সমস্ত দেশে যত ভূত-ধরা ওস্তাদের বাস, তাহাদের অনেককেই আমি চিনি। দক্ষিণ দেশে, উত্তর দেশে, হিমালয়ে, মধ্যপ্রদেশে ইহাদের বাস। মধ্যপ্রদেশে গত ১৮৮২ সনের আদমসুমারী অনুযায়ী ৭০ জন ডাইনী-ধরা ওস্তাদ আছে। অন্যান্য জাতীয় ওস্তাদও ঐ প্রদেশে বহু আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করি—

এখানে ৯৫৪ জন শিল প্রতিহতকারীর দেখা মিলিবে, যাহাদের আবহাওয়া ও ঋতুর উপবে অসীম প্রভাব; বৃষ্টি, রোদ্র, বজ্র ও শিল তাহাদেব কথায় চলাফেরা করে। শুধু উপযুক্ত টাকার বরাদ্দ করিতে হইবে, অন্যথা কেমন করিয়া এই সব লুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করা যাইবে? হায়! তাহারা অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। কিন্তু আমাদের নির্দয় ভারত সরকার "না দেখে আমাদের অশ্রু, না শোনে আমাদের কান্না"—আমি কলিকাতার একখানি বাংলা সংবাদপত্র হইতে শেষের কথাগুলির উদ্ধৃতি দিলাম। আমি নিজে ভূত-বিরোধী, জীবিত অথবা মৃত কোনও ভূতের উপর আমার আস্থা নাই। সে ভূত দেহধারী হউক অথবা দেহহীন, পুরুষ ভূত হউক অথবা নারীভূত, শিশুভূত হউক বা বয়স্ক ভূত, ব্রাহ্মণ ভূত হউক বা মুসলমান ভূত, স্থলভূত হউক বা জলভূত, গোভূত হউক বা অশ্বভূত—মোটকথা যে ভঙ্গির ভূতই হউক তাহার বিরোধী আমি। আমাদের দেশের কত রকম ভূত আছে, তাহার সম্পূর্ণ তালিকা দিবার লোভ হইয়াছিল, ইচ্ছা হইয়াছিল তাহাদের সকলকে শ্রেণী, উপশ্রেণী, গুণ-বিন্যাস, জাতি এবং প্রজাতি হিসাবে পৃথক একটি অধ্যায়ে সাজাইয়া পাঠককে উপহার দিই, এবং সে অধ্যায়ের নাম দিই ভৌতিক রাজ্য, যেমন অন্যান্য বিষয়ে আছে, যথা খনিজ রাজ্য, প্রাণী রাজ্য। ভৌগোলিক, ভূতাত্ত্বিক অথবা প্রাণী বা উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা স্থানীয় বিবরণ দিতে যেমন অধ্যায়গুলির নামকরণ করেন তেমনি। কিন্তু আমি লোভ দমন করিলাম। তেমন একটি অধ্যায় যে আমি আমার পাঠকের ঘাড়ে চাপাই নাই, সেজন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিবেন কি দিবেন না, তাহা আমি ভাবিতেছি না, কিন্তু আমি ইহা দ্বারা যে একটি সৎকাজ করিলাম, তাহা ভাবিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছি। নিতান্ত শিশুকাল হইতেই আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের মনে ভূতপ্রেত এবং ঐ জাতীয় যাবতীয় জীবের ভয় ঢুকাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহার ফলে চীনা মেয়েদের পায়ে যেমন লোহার জুতা পরাইয়া তাহার বৃদ্ধি রোধ করা হয়, তেমনি ভূতের ভয়ের দ্বারা তাহাদের মনেরও স্বাভাবিক সাহসকে খর্ব করিয়া দেওয়া হয়। পরবর্তী জীবনে ভয়ে জমাট বাঁধা রক্তধারী নরনারী সন্ধ্যার অন্ধকারে বাগানে গাছের একটি পাতা পড়ার শব্দেও ভয়ে কাঁপিতে থাকে। একটি পেচক উড়িলেও ভয় পায়। কারণ, তাহার চারিপাশে সর্বত্রই সে ভূতের অস্তিত্ব অনুভব করিতে থাকে। পূর্বে যাহাই থাকুক, বর্তমানের ইংরেজ ছেলেমেয়েরা এই ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে। যদি কোনও প্রতিবেশীর বাগানের চেরি গাছের ডালে উঠিতে কোনও ইংরেজ বালক ভূতের মুখামুখি হইতেই দেখিতে পায় সেই ভূত তাহার ঘাড় মটকাইতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা হইলে বালকটি যদি অবিচলিত কণ্ঠে ভূতকে বলে "এখানেই কিছু করিয়া বসিও না, যদি লড়াই করিতে ইচ্ছা কর তবে নিচে নামিয়া আমাকেও লড়িবার সুবিধাটুকু দাও"—তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব না।

ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পরিবারের ছেলেদের সঙ্গে আমার মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। তাহাদের চরিত্রে সবচেয়ে আমার ভাল লাগিয়াছিল তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা, সম্মানবোধ এবং তাহাদের স্বাধীনচিত্ততা। তাহাদের মধ্যে যে জিনিসটির অভাব দেখিয়াছি, সে হইতেছে তাহাদের বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সজীবতা। যেন

তাহারা বয়সের আগেই বিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। বালকত্ববিহীন বালক তাহারা। তাহাদের গাম্ভীর্যপূর্ণ আচরণ এবং বাক্যে আমি তাহাদিগকে বালক ভাবিতে সঙ্কোচবোধ করিয়াছি। তাই তাহাদের সম্বন্ধে এই ধারণাই আমার মনে স্থান পাইয়াছে যে, তাহারা 'ছোট ছোট পুরা-মানুষ।' তাহার স্কুলের বিদ্যা যাহাই হউক, অপেক্ষাকৃত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা জানে তাহারা যে পৃথিবীতে প্রবেশ কবিতে যাইতেছে তাহা কঠিন।

যাহারা গৃহহীন এবং পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের সুনাম নাই, কিন্তু আমি তাহাদের বিরুদ্ধে কোনও কুৎসা শুনিতে প্রস্তুত নই, কারণ ইহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে তাহাদের বন্ধুত্বের সম্মান দিয়াছে। পৃথিবীতে এই বন্ধুত্ব অপেক্ষা দুর্লভ বস্তু আর কি আছে? পৃথিবীর বিকারপ্রাপ্ত জঠরে যে রত্ন লুকাইয়া আছে তাহাকে কি সেজন্য অগ্রাহ্য করিব? একটি ছয় বৎসরের বালক বিশেষভাবে আমার অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আমার এই বালক বন্ধুর অনেক কৃতিত্ব ছিল। সে আকাশে দুই পা তুলিয়া হাঁটিতে পারিত—কুড়ি গজ পর্যন্ত সে এই ভাবে হাঁটিত। তাহার দিকে কিছু টানিয়া বলার অপরাধ হইলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, তাহার মত এতদূর হস্তব্রজে চলা আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। এই ব্যাপারে সে তাহার সমবয়স্ক আর সবাইকে হারাইয়া দিতে সক্ষম। যাহার ইচ্ছা সে ইহার নিকট শিক্ষালাভ করিতে পারে, দাবি বেশি নহে, দশ গজ হাতে হাঁটা এক পেনি, অনেক সময় বিনামূল্যেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বন্ধুটির বন্ধুদের কাছেও আমি প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে দেখিলেই হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিত। বলিত, Hullo, the Shar! There is the Shar coming! Hurrah for the Shar! "ওরে 'শা র' আসছে!" তার মানে বোধ হয় এই যে, তাহারা আমাকে পারস্য দেশের শা মনে করিয়াছিল। শা ইংল্যাণ্ডে খুব খ্যাত হইয়াছিলেন, একথা ছোটরা বড়দের নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবে। রেল স্টেশনে ওজনের যন্ত্র আছে তাহাতে অনেক ছেলে এক পেনি ফেলিয়া নিজের ওজন দেখিয়া লয়। কোনও যন্ত্রে চকোলেট, কোনও যন্ত্রে সিগারেট, তাহাতে পেনি ফেলিয়া দিলে চকোলেট অথবা সিগারেট বাহির হইয়া আসে। ছেলেরা ইহাতে বেশ মজা অনুভব করে। ছোটখাটো আনন্দ। নিন্দার কিছু নাই।

পূর্বে রেল স্টেশনের বা অন্য কোনও প্রকাশ্য স্থানের ওজন যন্ত্রের বিষয় কিছু বলিয়াছি কি না মনে পড়ে না। ওজন যন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া একটি ছিদ্র দিয়া একটি পেনি ফেলিয়া দিলে ডায়ালের উপরে একটি কাঁটা ঘুরিয়া ঠিক ওজনের দাগে আসিয়া থামিবে। চকোলেট যন্ত্রে পেনি ফেলিলে চকোলেট বাহির হইয়া আসিবে, সিগারেট-যন্ত্রে সিগারেট আসিবে। এই জাতীয় যন্ত্রের সাহায্যে হাসপাতালের জন্য দান চাওয়া হয়। একটি একবার উপরে উঠিতেছে, একবার নিচে নামিতেছে, কার্ডে লেখা "দয়া করিয়া কিছু দান করুন।" একটি পেনি তাহার ছিদ্রপথে ফেলিবামাত্র আর একটি কার্ড উঠিবে, তাহাতে লেখা, "ধন্যবাদ।" সবই এখন যন্ত্রের সাহায্যে হইতেছে। সিগারেট জড়ানো হইতে সমুদ্রের নিচে সুরঙ্গ খোঁড়া, সবই যন্ত্রে। সুখের দেশ। অ্যামেরিকা শুনিয়াছি আরও বেশি ভাগ্যবান্।

ইংল্যাণ্ডে এখন সকল ছেলেমেয়েই স্কুলে যায়। শিক্ষা এখানে বাধ্যতামূলক। পিতামাতা সন্তানকে স্কুলে পাঠাইতে আইনতঃ বাধ্য। মধ্যবিত্তদের সন্তানদের হাতের লেখা, পড়া, ভূগোল, ইতিহাস ও অঙ্ক ইত্যাদি শিখিতে হয়। মেয়েদের উপরন্তু শেলাই এবং সাধারণ রান্না শিখিতে হয়। কোনো বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ছেলেরা রবিবারে স্কুলে যায়। দরিদ্রদের জন্য স্কুলের বেতন সপ্তাহে এক শিলিং হইতে ঊর্ধ্বে—বিদ্যালয়ের অবস্থার তারতম্য অনুযায়ী। স্কুলের পদমর্যাদা নির্ণীত হয়, কোন্ শ্রেণীর লোকের পৃষ্ঠপোষকতা সেই স্কুল লাভ করিয়া থাকে, তাহার দ্বারা। কোনও ব্যক্তির আয় বৎসরে পঞ্চাশ পাউণ্ড, কাহারও পঁচাত্তর পাউণ্ড, কাহারও একশো পাউণ্ড ইত্যাদি। সবাই পৃথক জাতি। তবে প্রত্যেককেই আয় অনুযায়ী কিছু না কিছু বাহ্যাড়ম্বর দেখাইতে হয়। উচ্চ বর্ণের লোকেরা এ সব স্কুলে তাহাদের সন্তানদের পাঠায় না। তাহাদের জন্য হ্যারো, ইটন এবং অন্যান্য অভিজাত স্কুল রহিয়াছে। এই সব স্কুলে ছেলে রাখিবার খরচ অতিমাত্রায় বেশি।

ভাল পরিবার সামান্য আয় লইয়া ইংল্যাণ্ডে বাস করিতে পারে না। দারিদ্র্য সর্বত্রই একটি অপরাধ, শুধু ভারতে অপরাধ নহে। শত শত উচ্চ বর্ণের ব্যক্তি দানের দ্বারা এখানে দারিদ্র্য বরণ করিয়া থাকে, তাই দারিদ্র্যকে ভারতে হীন চোখে দেখা হয় না। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি, ঐশ্বর্য সম্মানিত হইলেও ভারতবর্ষে দারিদ্র্যকে ঘৃণা করা হয় না। ইংল্যাণ্ডের অবস্থা অন্যরূপ। সেখানে ইহা গুরুতর অপরাধ। ধনী আত্মীয়ের পাশে নিজের দৈন্য সেখানে অসহ্য হইয়া উঠে, বিশেষ করিয়া যখন নিকটস্থ সবাই তাহাকে সব সময় তাহার দীন অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে থাকে। বাহিরের একটা ভড়ং বজায় রাখিতে অবস্থার সঙ্গে কি লড়াই-ই না করিতে হয়। ভারতে শুধু একটু ধর্মভাব দেখাও, তাহা হইলে তোমার দারিদ্র্যকে সবাই ক্ষমা করিবে, এবং পরদিন হইতেই সমাজ তোমাকে পূজা করিতে থাকিবে। ধর্মীয় ভাবের বাজার ইংল্যাণ্ডে বড়ই মন্দা।

একজন ইংরেজ জেনটলম্যানের শিক্ষা ও একজন ভারতীয় ভদ্রলোকের শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য অনেক। ইংল্যাণ্ডে জেনটলম্যানের উপযুক্ত গুণাবলী ভারতের অপেক্ষা অনেক উচ্চাঙ্গের। ইউরোপের জেনটলম্যানদের তাহাদের সমপর্যায়ের মধ্যে স্থান পাইতে হইলে, আমাদের দেশের অপরনির্ভর ভদ্রলোক অপেক্ষা অনেক বেশি জানিতে হয় শিখিতে হয়। সে পণ্ডিত না হইতে পারে, কিন্তু অতীত ও বর্তমানের যাহা কিছু মানুষের কাছে মূল্যবান্ মনে হইয়াছে, সে-সব বিষয়ে একটা মোটামুটি জ্ঞান তাহার থাকা চাই। বিদ্যালয়ে হয়ত তাহার কৃতিত্ব খুব বেশি প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু পরে তাহাকে যখন সম শ্রেণীর উচ্চ সংস্কৃতি-সম্পন্ন নরনারীর সঙ্গে মিশিতে হয়, তখন তাহার মনের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। তাহার মানস গঠনে ভ্রমণ এবং সংবাদপত্র বিশেষ সহায়ক। কিছু ফরাসী ভাষা তাহাকে শিখিতে হয়, বিজ্ঞানসমূহের প্রাথমিক একটা জ্ঞান তাহার থাকা চাই, অঙ্কন বিদ্যা, পেনটিং কিছু জানা দরকার, সঙ্গীত বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা চাই, এবং বিশেষভাবে সঙ্গীত যন্ত্রের কোনও একটা ভালভাবে বাজাইতে শেখা চাই। ইহা ভিন্ন অশ্বারোহণ, গাড়ি

চালান, শিকার বিদ্যা এ সব আর পৃথকভাবে বলিবার প্রয়োজন নাই, জেনটলম্যানের পক্ষে ইহা অপরিহার্য। ইংল্যাণ্ডে এখন আর ভাঁড়ামির দিন নাই। উচ্চশ্রেণী এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হইলে অবশ্য এখনও উহা সম্মানিত হইয়া থাকে।

পূর্বের কথায় ফিরিয়া যাই। বহু বালক, সভাগৃহের নিচে পথে যে মারামারি হইতেছিল, তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে হাতহালি দিয়া উৎসাহ দিতেছিল। আমি তাহাদিগের একজনকে আমাকে কোনও একটি কফি হাউসে পৌঁছাইয়া দিতে বলিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল ত আমি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছি?" সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "ইণ্ডিয়া", "কেমন করিয়া বুঝিলে?" জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "আমি জানি।" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "মুসলমানরা কি খুব খারাপ লোক?" "কেন" জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, "কারণ তাহারা সিপাহী বিদ্রোহ করিয়াছিল।" "এই বিদ্রোহের কথা তোমাকে কে বলিল?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "আমি একখানা বইতে মিউটিনি সম্পর্কে সবই পড়িয়াছি।" "ভারত সম্পর্কে অন্য কোনও বই তুমি পড়িয়াছ?" সে বলিল, "না।" এই উত্তরটিতে অনেক কিছুর ইঙ্গিত আছে। ইংল্যাণ্ডের এমন বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছি, যাহারা ভারত সম্পর্কে "মিউটিনি" ভিন্ন আর কিছুই জানে না। ইহার জন্য আমি বেদনাবোধ করিয়াছি। আমরা ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্কিত, অতএব ঐ সময়ের একটি ঘটনা প্রচারের ভার ইংরেজদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া অন্যায়। হায় রে, সেদিন! সেদিন আজিমুল্লার ভ্রূকুটি এবং তোপে উড়াইয়া দিবার ভয় দেখাইয়াও একটি "বাবু"কে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড় করান যায় নাই, যেদিন ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সৈন্যরা "ক্যালকাটা বাবুজ" লিখিত প্ল্যাকার্ড ভিন্ন আর কিছুকেই মান্য করে নাই—কারণ ঐ প্ল্যাকার্ড তাহাদের দরজার উপরে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এবং "বাবু"দিগকে ব্রিটিশ পক্ষে থাকিবার সাহসের পুরস্কার স্বরূপ পেনশন ও জমি দেওয়া হইতেছিল। তখন "বাবু"দের প্রতি সম্মান দেখান হইয়াছিল। সেই রাজভক্ত বাবুদের আজ নিন্দা প্রচার করা হইতেছে, এবং তাহাদের রাজভক্তিতে সন্দেহ করা হইতেছে। বাংলা কাগজে যখন ব্রিটিশদের জাতি হিসাবে নিন্দা করা হয় তখন আমি তাহাদের অজ্ঞতাকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু যখন দেখি ইংরেজী সংবাদপত্র ও ইংরেজ রাজনীতিকেরা খাশ বাংলাদেশের চার কোটি অজ্ঞ চাষী, যাহারা মধ্য আফ্রিকার নদীবাসী জলহস্তী পৃথিবী সম্পর্কে যাহা জানে, তাহা অপেক্ষা অধিক কিছুই জানে না, তাহাদের নিন্দা করে, তখন তাহাদিগকে কি বলিব? তখন লজ্জায় মাথা নত হয়। বাঙালীদের নিন্দার ব্যাপারে, আমি দুঃখের সঙ্গে বলিতেছি, ইংরেজরা অনেক সময়েই "নেটিভ"দের স্তরে নামিয়া আসে।

ছেলেটি আমাকে এক কফি হাউসে লইয়া গেল। খুবই দরিদ্রদের জন্য সেটি। শস্তাও খুব। চা, কফি অথবা চকোলেট, এক পেয়ালা এক পেনি। আইসক্রীম দুই পেনি। রুটি মাখন দুই পেনি। কেক দুই পেনি। সোডা ওয়াটার লেমনেড, জিনজার বিয়ার, প্রতি বোতল দুই পেনি। ডিম প্রতিটি এক পেনি। শূকরের মাংসের ফালি এক প্লেট তিন পেনি। আরও কিছু

জায়গায় এই একই জিনিসের দাম দ্বিগুণ হইতে তিনগুণ। এখানে সুরা জাতীয় কিছু বিক্রয় হয় না। লণ্ডন শহরে জিনিসের ভালমন্দের উপর সব সময় দাম নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কতখানি আভিজাত্য, তাহার উপর। ভাল ডিনার সাড়ে সাত শিলিঙে পাওয়া যায়, আবার স্থান-বিশেষে এক গিনি বা তাহার বেশিও লাগে। পোশাক পরিচ্ছদ বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিষয়েও ঐ একই অবস্থা। অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ না পাইলে সস্তায় বাস করার কৌশল নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়, এবং লণ্ডনে তাহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। আমি যেখানে খাইতে গিয়াছিলাম তাহার পরিচালিকা একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক।

ইংল্যাণ্ডের গৃহিণীরা ভারতবর্ষের গৃহিণীদের অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী দায়িত্ব পালন করিয়া থাকে। ইংল্যাণ্ডের স্বামী টাকা উপার্জন করে এবং ভারি কাজগুলি করে। ছোটখাটো শত রকমের কাজের ভার গ্রহণ করে স্ত্রী। স্ত্রীই গৃহের সব কিছু পরিচালনা করে, পারিবারিক সম্পত্তি দেখাশোনা করে, হিসাব রাখে, রান্না করে, ঘর পরিষ্কার করে, জামার বোতাম ঢিলা হইলে তাহা নতুন করিয়া আঁটিয়া দেয়, নিজের এবং ছেলেদের অন্তর্বাস শেলাই ও রিপু করে, ধোলাইয়ের কাজ করে, পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে, কেহ অসুস্থ হইলে তাহার শুশ্রূষা করে। পল্লী অঞ্চলের স্ত্রী মাঠের কাজেও স্বামীকে সাহায্য করে। আর ভ্রমণের সময় স্ত্রী স্বামীর পক্ষে অপরিহার্য হইয়া ওঠে, ভারতীয় স্ত্রীর ন্যায় অসহ্য রকমের বোঝা হইয়া উঠে না। ট্রাঙ্কের ভিতর যত্ন করিয়া এত জিনিস গুছাইয়া রাখে যাহা তাহার স্বামীর পক্ষে সাধ্য নহে। টিকিট সহজে কিনিয়া আনিতে পারে। এবং সমস্ত ভ্রমণ কালে অল্প ব্যয়ে বেশ চালাইয়া লইতে পারে। এটি সম্ভব এই জন্য যে, ইউরোপে সভ্য মানুষের বাস, এখানে প্রত্যেকটি পুরুষের মনে এ শিক্ষা গ্রথিত আছে যে তাহাকে স্ত্রীলোকের সুখসুবিধা এবং আরাম বিধানের জন্য নিজের অনেকখানি সুখসুবিধা ও আরাম বিসর্জন দিতে হইবে। মোটকথা, স্ত্রী সেখানে আক্ষরিক অর্থে তাহার স্বামীর সহকর্মিণী। পুরুষ নিজের সম্পর্কে অনেকখানি অসতর্ক এবং জীবনের ছোটখাটো বহু বিষয়ে সে উদাসীন। স্ত্রী তাহার এই ত্রুটি পূরণ করিয়া থাকে, স্ত্রীই স্বামীর দেখাশোনার ভার লয়, স্বামী স্ত্রীর নহে। অফিস হইতে ফিরিবার সময় হইলে যুবতী স্ত্রীর মুখে যে আগ্রহসূচক ভঙ্গি জাগে তাহা দেখিবার মত। অনেক সময়েই স্বামীকে অভ্যর্থনা করিতে পথে ছুটিয়া যায়।

বড় ঘরের মহিলারা অবশ্য কাজ করে না, স্বামীর কাজেও তাহারা বিশেষ লাগে না। কাজের সমস্ত ভার তাহারা ভৃত্যের উপর ছাড়িয়া দেয়, তাহারা সুদৃশ্য পোশাক পরে, বন্ধু যাহারা দেখা করিতে আসে পাল্টা তাহাদের বাড়িতে দেখা করিতে যায়, নভেল পড়ে, পিয়ানো বাজায়,গান গায়, গীর্জায় যায়, থিয়েটারে যায়, এবং কখনও দান-ধ্যানের কাজেও লিপ্ত হয়। পোশাকে বছরে তাহারা কত টাকাই না ব্যয় করে! এবং ইউরোপের নরনারীর উপরে ফ্যাশানের প্রভাব প্রায় অত্যাচারের সীমায় পৌঁছাইয়াছে।

ফ্যাশান প্রসঙ্গ আমাকে অনেক সময় ভাবাইয়া তোলে। সকল যুগে, সকল দেশের মানুষ ক্রীতদাস হইয়াই জন্মায়। আমার মনে হয় হারবার্ট স্পেনসার বা ঐ জাতীয় কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি একখানা বড় বই লিখুন, তাহাতে বর্ণনা করুন কেমন করিয়া আদি যুগ হইতে, যখন তাহার জীবন সরল ছিল, তখন আমাদের প্রধান কাজ ছিল, আমাদের নিজেদের হাত পায়ে পরাইবার জন্য শৃঙ্খল প্রস্তুত করা। কেমন করিয়া এক এক সময়ে মানুষ এই সব শৃঙ্খলে আরও একটু উন্নত কৌশল যোগ করিয়া খ্যাত হইয়াছে এবং কেমন করিয়া মানুষ ঘন ঘন পুরাতন শৃঙ্খল ভাঙিয়া তাহা হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দের সঙ্গে নূতন শৃঙ্খল পরিয়াছে। এই সবের ইতিহাস তাঁহারা লিখুন। অবিরাম মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতে না হইলে মানুষের, জীবনের কি চেহারা হইত? অতএব পুরাতন ঐতিহ্য, নবতম ফ্যাশান এবং আচরিত প্রথাসমূহ ব্রিটিশ সিংহকে যেমন, ভাবত হস্তীকেও তেমন অধীন করিয়া রাখে। একথা সত্য যে, পাশ্চাত্ত্য জগৎ একটি বড় রকমের সামাজিক বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কি লাভ হইবে জানি না। এ জাতীয় পরিবর্তনের পরে আবার আর এক প্রস্থ সুগঠিত নূতন শৃঙ্খল দেখা দেয়, টাটকা অবস্থায় সুন্দর দেখায় এবং তাহা পরবর্তী যুগকে শৃঙ্খলিত রাখিবার পক্ষে বেশ উপযুক্তই হয়। আমি আমাদের সমাজের অদ্ভুত সব রীতিনীতিব ঘোব বিরোধিতা করি বলিয়া একথা কেহ মনে করিবেন না যে আমি আমাদের দেশের সামাজিক শৃঙ্খলের পরিবর্তে ইউরোপীয় সামাজিক শৃঙ্খল পরিবার জন্য ওকালতি করিতেছি। আমি শুধু আমার দেশবাসীকে বলি তাঁহারা হয় থামিয়া থাকুন, আর না হয় ঠিক পথে সংস্কার সাধন আরম্ভ করুন। জমিতে শস্যও হয়, আগাছাও হয়। আগাছা উৎপাটন করা উচিত নহে কি? সময়টা সেইরূপ একটি ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ কল্যাণের শস্য ফলাইয়া থাকে। আগাছাকে সেই ক্ষেত্র হইতে সমস্ত পুষ্টি টানিয়া লইতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে আসল শস্যটিই শুকাইয়া মবে। ইউরোপকে যে শৃঙ্খলে বাঁধিয়াছে তাহাকে আমি প্রশংসা করিতে বলি নাই। আমি প্রশংসা করিতে বলিয়াছি তাহারা যে পক্ষ বিস্তার করিয়া উপরে উঠিতেছে তাহাকে।

ইংরেজরা যাহাকে ফ্যাশান বলে তাহাকে তাহারা যেভাবে অনুসরণ করে তাহা কৌতুককর। কোনও খ্যাত ব্যক্তি প্রথমে এক ধরণের কলার কিংবা কোট পরিলেন, তৎক্ষণাৎ দেখা যাইবে অন্যরাও ঠিক সেইরূপ কলার ও কোট পরিতেছে। অনেক দরজি আমাকে বলিয়াছে তাহাদের ব্যবসার খুব নিরাপত্তা নাই। “এখানে এই যে স্টক দেখিতেছেন, এগুলি বর্তমান ফ্যাশান অনুযায়ী প্রস্তুত। কিন্তু পর বৎসর এই ফ্যাশান হয়ত অচল হইয়া যাইবে; তখন এগুলিকে অর্ধমূল্যে বিক্রয় ভিন্ন আমাদের আর উপায় থাকিবে না, অথবা আমরা এগুলিকে ভবিষ্যতে কোনও দিন আবার এই ফ্যাশান চলিত হইবে আশায় তুলিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু সে আশা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যাহাদের বেশি মূলধন আছে তাহাদের সঙ্গে সেইজন্য সমান তালে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে।” যত চাহিদা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি তাহারা প্রস্তুত করে এবং তাহা মূল্যবানও বটে। উদ্বৃত্ত দিয়া তাহারা কি করিবে? দয়া

করিয়া প্যারিস সেগুলিকে গ্রহণ করিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া খামখেয়ালিপনা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিয়ত পরিবর্তনশীলতার জন্য কুখ্যাত আছে কিন্তু পোষাকের ফ্যাশান তেমন নহে। এক একটি পোষাক পঞ্চাশ হইতে একশো গিনি মূল্যে কিনিয়া এক মরশুম ব্যবহার করিয়া ফ্যাশান বদল হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইলে কত যে পোষাকের ও টাকার মায়া ছাড়িতে হয়। চাঁদের কলা বদলের মত একমাত্র ধনী মহিলারাই দিনে দিনে ফ্যাশান বদল করিতে পারে। দরিদ্রদের বেলায় কি হইবে? হিন্দু নারী কেউঞ্ঝর পাহাড় অঞ্চলের জোয়ং নারীর মত পাতার পোষাক পরা যেমন কল্পনা করিতে পারে না, তেমনি ইংল্যাণ্ডের নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত নারীও ফ্যাশান-বহির্ভূত পোষাক পরিয়া কোনও ড্রইং রুমে যাওয়া কল্পনা করিতে পারে না। লোভী দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকা, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করা, এবং আজীবন এক হাজার পাউণ্ডকে দুই দিয়া গুণ করিয়া দুই হাজার পাউণ্ডে পরিণত করার প্রয়াস ইহাদের পারিবারিক জীবন যে সব উপকরণ দিয়া গঠিত তাহার মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। যে সব ব্যক্তিকে ১০০০ পাউণ্ড x ২ পাউণ্ড উপার্জন করিতে হয়, তাহারা কি কখনও একটি কীটের জীবন হইতে তাহাদের জীবন ভিন্ন মনে করে। আমার শেষ কথা এই যে, অতি মহার্ঘ চোখ ঝলসান পোষাক পরা লেডি অপেক্ষা মধ্যবিত্ত ঘরের সাদাসিদা, ছিমছাম এবং পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা নারীকে অধিক পছন্দ করি আর যখন কোনও উৎসব সন্ধ্যায় চোখ ঝলসান পোশাকে নিমন্ত্রিতদের শোভাযাত্রা অভিজাত গৃহের মোটা কারপেটের উপর দিয়া প্রায় নীরব পদক্ষেপে চলিতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে এই হতভাগ্য থাকিলে তাহাকে নলবনে প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জলজন্তুর ন্যায় বোধ হইত। ইহাব অপেক্ষা কম আশ্চর্যজনক বোধ হইবে যদি দুর্গাপূজার জন্য সংগৃহীত হাজার-এক উপকরণের মধ্যে আফ্রিকা হইতে সদ্য আনা একটি গোরিলাকেও দেখা যায়। আমি যে এমন একটি বিভীষিকার সৃষ্টি করি নাই তাহার কারণ আমি তাহাদের মধ্যে চলিবার চেষ্টা করি নাই। ইংল্যাণ্ডে মেয়েদের জন্য অতি সাধারণ এক প্রস্থ পোষাকের দাম প্রায় পাঁচ পাউণ্ড।

ইংরেজরা তাহাদের পোষাককে কতখানি গুরুত্ব দান করে তাহা আমাদের দেশের লোকেরা কমই জানে। প্রচলিত প্রথা নিমন্ত্রিতের জন্য, কোনও বিশেষ সময়ের জন্য যে পোষাক নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, তাহা না পরিয়া যদি কোনও অতিথি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসে তাহা হইলে নিমন্ত্রণকারী তাহাকে অপমান বোধ করিয়া থাকে। সান্ধ্য পোষাক পরিয়া না গেলে থিয়েটারের স্টলেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ভদ্র পোষাক পরিহিত না থাকিলে উদ্যানে কিংবা অন্যান্য জনসাধারণের মিলন স্থানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। রীতিটি প্রশংসাযোগ্য। ট্রাম গাড়ীতে নোংরা পোষাক পরা লোকটির পাশে বসিতে কি কাহারও ভাল লাগে? অতএব ইডেন গার্ডেনে যদি হাল্কা ধুতি পরিয়া যাওয়াতে, যেখানে ব্যাণ্ড স্টাণ্ডে মহিলারা সমবেত হইয়াছেন, সেখানে আপনার উপস্থিতি আপত্তিজনক হয় তাহা হইলে তাহা লইয়া হল্লা করিবার দরকার কি? অপরে (যাহারা পোষাকের রীতি কঠোরতার

সঙ্গে মান্য করিয়া চলে) আপনাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে ইহা যদি পরিহার করিতে চান, তাহা হইলে ইংরেজ কর্তৃক প্রাইভেট পার্টিতে নিমন্ত্রিত হইয়া অসামাজিক পোষাকে যাইবেন না। ইংরেজী পোষাক পরিতে বা পরিচ্ছদরীতি গ্রহণ করিতে বলিতেছি না, এবং আমার মতে তাহা পছন্দসই নহে, কিন্তু সভ্য জগতে ডিসেন্সি বা শালীনতা নামক একটি বস্তু স্বীকৃত এবং প্রচলিত আছে এবং আপনার তাহা জানা বাধ্যতামূলক। যে সুন্দরী সিন্দুর-রঞ্জিত প্যাণ্ডেনাস গাছের পাতায় সাজিয়া আন্দামান দ্বীপসমূহের যুবকদের মন ভোলায়, তাহাকে সেই স্থানেই মানায়। সে যেন 'পালে রয়্যাল'-এর নিকটস্থ ফরাসী সালোঁর সুন্দরীর কাছে নাচিতে না আসে। একমাত্র পোষাকের হাস্যকর ফ্যাশনই যে ইংরেজদের অধীন করিয়া রাখিয়াছে, তাহা নহে। ফ্যাশানের চাকা ঘুরিতে ঘুরিতে শিল্পকৃতি, খেলনা, সাবান, পেটেন্ট ওষুধ, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সঙ্গীত শিক্ষা, নৃত্য শিক্ষা, ঘোড়া জকি, কবি, উপন্যাস-লেখক, রেড-ইণ্ডিয়ান, কুলু ঔপনিবেশিক, ভারতীয়—সব রকম বস্তুকেই হয় মাথায় তুলিতেছে, না হয় পদদলিত করিতেছে। এইভাবে বর্তমান বাঙালীদের নিন্দা করা ফ্যাশন দাঁড়াইয়াছে। কোনও বিখ্যাত লোক বাঙালীর বিরুদ্ধে একটি কথা উচ্চারণ করিল, তৎক্ষণাৎ চারিদিকে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতে লাগিল। মানবিক শব্দ কম্পন যন্ত্র হইতে যে তীক্ষ্ণ ধ্বনি উত্থিত হয়, পৃথিবীতে আর কোনও ধ্বনি তত তীক্ষ্ণ হইতে পারে না। হায় শ্রীমতী ফ্যাশান, আমাদের উপর ভ্রূকুটি হানিতেছ কেন? কেন তুমি এমন আদেশ প্রচার করিয়াছ যে, গঙ্গা নদীর কোটি কোটি নিরপরাধ মোহনাবাসীদের নিন্দা না করাটা বড়ই অসম্মানকর? এবং তাহাদের যে সব ভ্রাতা বহু যুগের জড়ত্ব হইতে সদ্য জাগিয়া উঠিতেছে তাহাদেরই বা কি অপরাধ? ফ্যাশান-সুন্দরীকে ধিক!

যে স্ত্রীলোকটির কফি-হাউসে গিয়াছিলাম তাহার ছয়টি সন্তান। তাহাদের একজোড়া যমজ। অন্য একটি কফি-হাউসে আমি দুই জোড়া যমজ দেখিয়াছি। শেষের দুইজন শিশু। তাহাদের মা তাহাদিগকে আমার নিকটে আনিয়া দেখাইল এবং বলিল, এই দুটি শিশু দুইজনের মধ্যে শ্রম ভাগ করিয়া লইয়াছে—একজন কথা বলা শিখিয়াছে, অন্যজন হাঁটা শিখিয়াছে। অতঃপর আমি ইংল্যাণ্ডে বহু যমজ সন্তান দেখিয়াছি। সেখানে ইহা দেখিলাম একটি সাধারণ ঘটনা। আমার ধারণা, ব্রিটিশদের ভারতীয়দের অপেক্ষা জননহার বেশি। শিশুমৃত্যু কম। সেখানে অনেকে ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করিয়া অবিবাহিত থাকে, তবু তাহাদের দেশে জননহার বেশি। বৎসরে প্রায় ছয় লক্ষ অ্যাংলো-স্যাকসন শিশুর আবির্ভাব ঘটে, অথচ তাহাদের ভবিষ্যৎ গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থাই থাকে না। প্রত্যেক দেশেরই (সে দেশ যতই ধনশালী হউক) লোক পালন ক্ষমতার একটা সীমা থাকে। অতএব ইংল্যাণ্ডের মত দেশে যদি বহু লোক অভাবগ্রস্ত থাকে, তবে অবাক হইবার কিছু নাই। দানের দ্বারা এ সমস্যার সমাধান হয় না। করবৃদ্ধি দ্বারাও স্থায়ী সমাধান হয় না। সে ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর কর বাড়াইয়া যাইতে হইবে, এবং তাহা সম্ভব নহে। উদারপন্থীরা অবশ্য বলেন, ইংল্যাণ্ডে এখন যত লোকের স্থান, তাহা অপেক্ষা অধিক

লোকের স্থান হওয়া উচিত। তাঁহাদের মতে জমি মাত্র কয়েকজন জমিদারের দখলে, তাঁহারা চাষীদের নিকট হইতে তাহাদের ফসলের বেশির ভাগ অংশ আদায় করিয়া লন, এবং তাহার আয় তাঁহারা ইংল্যাণ্ডে অথবা ইংল্যাণ্ডের বাহিরে যথা ইচ্ছা ব্যয় করেন। ইহার উপর বড় বড় ধনিক সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীরা ছোটখাটো সব শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্রাস করিয়া প্রতিযোগিতা চূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহারা এই উপায়ে মজুরদের চাহিদা কমাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছেন। এ কথা কতদুর সত্য তাহা আমি জানি না, ইহার প্রতিকার উদ্দেশ্যে তাঁহারা কি করিতে চাহেন, তাহাও জানি না। মজুরশ্রেণী অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিয়াছে। ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মজুরেরা শ্রমের জন্য একটা নিম্নতম হার ঠিক করিয়া লইয়াছে, তাহার নিচে তাহারা কাজ করিবে না; কিন্তু এই ট্রেড ইউনিয়নগুলিতেও খুব সুবিধা হয় নাই, কারণ বাহির হইতে আগত শ্রমিকের সঙ্গে মজুরির হারের প্রতিযোগিতায় তাহারা পারিয়া উঠে না। মজুরি বেশি পাওয়া যায় বলিয়া জার্মান ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানের শ্রমিক ইংল্যাণ্ডে চলিয়া আসে। তাহারা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক নির্দিষ্ট মজুরি অপেক্ষা কমে কাজ করিতে রাজি। মজুরি বেশি দিলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে, এবং তাহার ফলে অ্যামেরিকা জার্মানি এবং অন্যান্য দেশের জিনিস, ইংল্যাণ্ডের প্রস্তুত দ্রব্যাদি শুধু ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ হইতেই হঠাইয়া দেয় তাহা নহে, খাস ইংল্যাণ্ডেও বিদেশী জিনিসেরই প্রাধান্য বেশী হয়। অতএব ধনী এবং শক্তিশালী ইংল্যাণ্ডের—পৃথিবী ব্যাপী উপনিবেশের মালিক ইংল্যাণ্ড তাহার সবার জন্য সম-আইন, তাহার অবাধ বাণিজ্য রীতি ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও সে সুবিধার সঙ্গে বহু অসুবিধাও ভোগ করিতেছে—তাহার অগ্রগতি হইতে এখন যদি সে পিছু হটিয়া যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর ক্ষতি হইবে।

ইংল্যাণ্ড সুবিবেচনা ও সৌভাগ্যবশতঃ পৃথিবীর প্রত্যেকটি অংশে তাহার যে বাণিজ্য বিস্তার কারিয়াছিল সেইসব স্থান হইতে এখন অ্যামেরিকা ও ইউরোপীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধির পালা চলিতেছে। কোনও দিন হয়ত যুদ্ধ হইবে। তাহার পর আবার শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় লাঙ্গল চলিবে, হাতুড়ি বাটালির কাজ, তাঁতের কাজ চলিতে থাকিবে। হয়ত সেইন, রাইন ও ড্যানিউবের তীরে তীরে সৈন্য ব্যারাকগুলির কাজ ফুরাইবে। ল্যাঙ্ক্যাশিয়র ও বারমিংহ্যামে যে সব চিমনি গর্বের আকাশে মাথা তুলিয়া দূরের সব দেশে সুলভ বস্ত্রের আনন্দ-বার্তা পাঠাইতেছে, এবং ছোটখাটো ছুরি কাঁচি ও অন্যান্য কর্তন যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদের প্রতিযোগী হয়ত লিল্, ড্রেসডেন এবং প্রাগ শহরে মাথা তুলিতেছে। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহারা অল্প টাকায় জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, তাহারা অল্প মজুরিতে দ্রব্য উৎপাদনও করিতে পারে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের একান্তভাবে নিজস্ব শিল্পের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হইবে। এইভাবে তাহার অবস্থা বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিলে সে হয়ত তখন আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই বিদেশী শ্রমিকের অবাধ আমদানি বন্ধ করিয়া দিবে। অস্ট্রেলিয়া এবং অ্যামেরিকাও চীনা শ্রমিক আমদানি ঠিক এইভাবেই বন্ধ করিয়াছিল।

ইংল্যাণ্ডও স্বাধীন বাণিজ্য রীতি পরিত্যাগ করিয়া একটা মধ্যপন্থা অবলম্বন করিবে, এবং তাহা শুধু নিজের জন্য নহে, ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য স্বায়ত্ত শাসনহীন, অধিকারভুক্ত দেশগুলির জন্যও। তবে এরূপ হইতে বিলম্ব হইবে, অতএব এই সুবিধা গ্রহণ করিয়া আমাদের নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে অথবা বর্তমানে শিল্পের উন্নতি সাধনেও বিলম্ব হইবে। তাহার পূর্বে ইংল্যাণ্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট মূল্যেই বিলাতি দ্রব্য কিনিতে আমরা বাধ্য। আমাদের ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়াছে। তাই তাহাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমাদের ভাগ্যের উপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিবে। ইংল্যাণ্ড বাঁকিয়া দাঁড়াইলে বাহিরেব দেশসমূহের দুর্ভাগ্য সূচিত করিবে। স্বাধীনতার দুর্গ রূপে একমাত্র ইংল্যাণ্ডই সকলের ভরসা। যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম অথবা সুইজারল্যাণ্ড উপগ্রহস্বরূপ, ইহারা সকলেই ব্রিটিশ সূর্যের আলো গ্রহণ করিয়া থাকে। অন্যান্য উন্নত রাজ্যগুলি এখনও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। চীন হইতে পেরু অবধি আমরা মনকে চালনা করিয়া একথা জোরের সঙ্গে বলিতেছি যে, আমি বরং নিউজীল্যাণ্ডের সীমান্ত বরাবর অঞ্চলগুলিতে আইরিশ দুর্দান্ত লোকদের সঙ্গে অথবা টেক্সাসে বাস করিব তবু ইউবোপের উন্নত দেশগুলিতে বাস করিয়া চাপা গলায় কথা বলিতে, নদীর ওপারের প্রতিবেশীদের প্রতি ঘৃণা জাগাইয়া তুলিতে, মানবজাতিকে বিনাশ করিবার নবতম পদ্ধতি শিখিবাব জন্য ক্রীতদাসের ন্যায় জীবন কাটাইতে এবং সর্বদা জাতীয় ধ্বংসেব বিভীষিকা লইয়া বাস করিতে পারিব না। আমি যেরূপ শুনিয়াছি, এবং আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তাহা সমর্থন করিতেছে যে, আমরা ভারতবর্ষে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি, ইউরোপীয় জাতিগুলি তাহাদের গভর্মেণ্টের অধীনে ততটাও করিতেছে না অতএব ইংল্যাণ্ডের ক্ষতির অর্থ অন্য দেশের অগ্রগতিতে বাধা পাওয়া। মানবজাতি, বিশেষ করিয়া অশ্বেত জাতি, চরম যুক্তিবাদিতায় অনেক দুঃখ পাইয়াছে, যেমন প্রাচীন কালে সে চরম ধর্মচারিতায় দুঃখ ভোগ করিয়াছে। একটি জীবনের নীতি দেখা যায় তাহা অন্য জীব ধ্বংসের জন্য অবিরাম শক্তি প্রয়োগের নীতি, সে জন্য তাহা হইতে যুক্তিবাদিতার কুসংস্কার জন্মিয়াছে। ইহা মানুষকে আরও নিচে নামাইয়া আনিয়াছে, কারণ ঐ সব কুসংস্কার বর্তমানের উচ্চ জ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত। দার্শনিক ও নির্বোধের মধ্যকার বড় পার্থক্য এই যে, একজন তাহার অজ্ঞতা বিষয়ে চেতন, অন্যজন চেতন নহে। জ্ঞান কি আমাদের অজ্ঞতা দূর করার অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে? প্রত্যেকটি নূতন আবিষ্কার কি সীমাহীন অজ্ঞতার জগতে এক একটি অ্যামেরিকাকে প্রকাশ করিয়া দিতেছে? অজানাকে জানিবার বাসনা এক, অজানা সম্পর্কে বদ্ধ মতবাদ নির্ভুল এবং অব্যর্থরূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অন্য। ইহারা এতই অধীন যে অপেক্ষা করিতে পারে না। এইভাবে আমরা যুক্তিবাদিতা পূর্ণ এক মতান্ধতা লাভ করিয়াছি, ইহা সত্যকে অগ্রাহ্য করে, ন্যায়বিচার ও করুণাকে অমান্য করে, এবং যে সব উচ্চতর বৃত্তি নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হইতে মানুষকে পৃথক করে তাহাকে অমান্য করে। তদুপরি অসম্পূর্ণ এবং অর্ধপ্রতিষ্ঠিত তথ্য হইতে আরোহ এবং অবরোহ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া নীতি

বিধিকে ধ্বংস করিতে থাকে। এবং তাহার ফলে যে সব শক্তি আমাদিগের চারিদিকে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা তাহাদের কাছে আরও দুর্বোধ্য হইয়া উঠে। এবং ইহা ইউরোপের শক্তিশালী দেশসমূহে এমন একটি ঠগী ধর্ম শেখায় যাহা আজটেকদের সাম্রাজ্য বিধ্বংসী স্পানিয়ার্ডদের, অথবা যে শক্তিতে টেগাস্ হইতে ইরাবতী তীর পর্যন্ত আরবেরা যাবতীয় রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা নির্মম। তবু একথা মানিতে হইবে যে, বর্তমান যুক্তিবাদিত্ব ঘেঁষা ধ্বংস প্রবৃত্তির যুগে একমাত্র ইংল্যাণ্ড রাজ্যজয়ের সঙ্গে ন্যায় বিচারের মিশ্রণ ঘটাইয়া জয়ের রূঢ়তা কিছু কোমল করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং বিজিত দেশের উপর তাহার শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করিতেও পারিয়াছে।

ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রকার বা শ্রেণীর মানুষের জন্য একই রাষ্ট্রনীতি এবং সকলের জন্য অবাধ রাজনীতির মধ্যে আমাদের দেশের লোক হয়ত গর্ব করিবার মত কিছু দেখিতে না পাইতে পারে, কিন্তু ইংল্যাণ্ড যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে তাহা অন্যের অনুসরণ যোগ্য। হিন্দুগণ এই নীতি প্রাচীনকালে অনুসরণ করিয়াছে এবং তাহাদের অধঃপতনের সময়েও ইহা ত্যাগ করে নাই। শেষ পর্যন্ত তাহার ঘুণ ধরা জাতীয় জীবন পশ্চিমের উত্তাল জীবন তরঙ্গের স্পর্শমাত্র চূর্ণ হইয়া যাইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার নীতি অব্যাহত ছিল। আমি এক ব্যক্তির লেখা হইতে ইহা প্রমাণ করিতে পারি। তিনি আমাদের প্রতি খুব বন্ধু ভাবাপন্ন ছিলেন না, নাম তাঁহার কামাল উদ-দীন আবদার রাজ্জাক। তিনি সমরখন্দের জালাল-উদ-দীন ইশাকের পুত্র, জন্মস্থান হিরাট, জন্ম তারিখ ১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর। তিনি ১৪৪১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কালিকট সম্পর্কে তাঁহার উক্তি—"কালিকট সম্পূর্ণ নিরাপদ বন্দর, এবং হারমুজের মত পৃথিবীর সকল স্থান হইতে বণিকেরা এখানে আসিয়া থাকে। অনেক দুর্লভ জিনিস এখানে আসে, বিশেষ করিয়া অ্যাবিসিনিয়া, জিরবাদ এবং জানজিবার হইতে। মক্কা হইতে মাঝে মাঝে জাহাজ আসে, হিজজাজ হইতেও আসে, এবং যতদিন ইচ্ছা থাকিয়া যায়। এটি অমুসলমানদের শহর, অতএব আইনত ইহা আমাদের দখলের যোগ্য। এখানে অনেক মুসলমান বাস করে। তাহাদের দুইটি মসজিদ আছে, প্রতি শুক্রবার সেখানে তাহারা নমাজ পড়ে। তাহাদের একজন ধার্মিক কাজি আছেন। মুসলমানেরা এখানে অধিকাংশ সুফী সম্প্রদায়ের। এখানে পূর্ণ নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিচার অধিষ্ঠান করে। বণিকেরা এখানে পণ্যদ্রব্য আনিয়া যতদিন ইচ্ছা পথের উপরে অথবা বাজারে রাখিয়া দেয়, এবং কাহারও উপর তাহা দেখাশুনার ভার না দিয়া চলিয়া যায়। শুল্ক বিভাগের লোকেরা এই সব পণ্যদ্রব্যের পাহারায় লোক নিযুক্ত করে।" আমি আবু আদদাল্লা মহম্মদ অল ইদ্রিসের কথাও প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিতে পারি। তিনি ছিলেন মরোক্কোর বিখ্যাত ভূগোলবিদ, একদাশ শতাব্দীর মানুষ তিনি। তাঁহার লেখাতে দেখা যায়, ন্যায়পরায়ণতায় হিন্দুরা বিখ্যাত ছিলেন। অল ইদ্রিস বলিতেছেন—"হিন্দুরা স্বভাবতঃই ন্যায়ের পক্ষে। তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে কখনও ইহা হইতে ভ্রষ্ট হইতেন না। তাঁহাদের প্রতিশ্রুতিতে সততা এবং আনুগত্য সুবিখ্যাত। এবং তাঁহারা এই সব গুণাবলীর জন্য এমনই প্রসিদ্ধ ছিলেন যে পৃথিবীর নানাস্থান হইতে বহু লোক তাঁহাদের দেশে আসিত। দেশের উন্নতির মূলেও তাহাই।"

এই জন্য আমার দেশবাসীরা ইংল্যাণ্ডে যে স্বাধীনতা এবং ন্যায় ধর্ম আছে তাহার মূল্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত। তাঁহাদের মতে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, ইহাই ত মানুষের

স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের ভাগ্য এমন একটি যুগের সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে যুগে যুক্তিবাদজাত মতান্ধতা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, যে যুগে চিন্তানায়কেরা প্রকাশ্যে এমন সব মতবাদ প্রচার করিতেছেন যাহা ক্ষুধান্ধ বর্বরেরা পুরাতন পৃথিবীতে তাহাদের অজ্ঞাতসারেই অনুসরণ করিত। সেই মতান্ধতা, সেই ঠগী ধর্ম এখন সভ্য জগৎকে অনুসরণ করিতে বলা হইতেছে। তাহাদের শিখান হইতেছে ইহা দ্বারা তাহারা অনুন্নত জাতিকে উৎপীড়ত করুক; শিখান হইতেছে প্রাবল্যের কাছে ন্যায়ধর্ম পরাভূত হউক, প্রবল দুর্বলকে শিকার করুক, এবং সর্বাপেক্ষা সকল নরহন্তাই পৃথিবীতে শুধু টিকিয়া থাকুক! সিংহের শক্তি, শৃগালের ধূর্ততা এবং পুরাকালে হইলে যে জ্ঞান ও ক্ষমতা অতি মানবীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারিত, তাহা দ্বারা এই মতবাদসমূহ পৃথিবীর সকল অনুন্নত জাতির উপর প্রযুক্ত হইতেছে। এইভাবে আমরা দেখি স্পেনের হাত অ্যামেরিকাবাসীদের রক্তে গভীরভাবে রঞ্জিত হইয়াছে, তথাপি অ্যাটলাণ্টিক পারের "স্পেনের ইতিহাসে, পর্টুগালবাসীরা ব্রাজিলে যে মহা অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছে তাহার সহিত অন্য কিছুর তুলনা হয় না। এই পর্টুগীজরা ব্রাজিলে তথাকার অধিবাসীদের শিকারের স্থান সমূহে তাহাদিগের মধ্যে মড়ক ছড়াইবার উদ্দেশ্যে মারাত্মক ছোঁয়াচে স্কারলেট-ফিভার ও বসন্ত রোগীর কাপড়চোপড় ফেলিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অ্যামেরিকাতেও ইউরোপীয়গণ হীনতম অপরাধের অনুষ্ঠান করিয়াছে। সেখানে উটা অঞ্চলের প্রান্তর প্রদেশে যেখানে অ্যামেরিকান ইণ্ডিয়ানদের বিচরণ ভূমি, সেইখানকার কূপসমূহে স্ট্রিকনিন (কুঁচিলা বিষ) ছড়াইয়া দিয়াছে এবং অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা দুর্ভিক্ষে ক্ষুৎকাতর হইয়া যখন শ্বেতকায়দের দ্বারে আসিয়াছে কিছু খাইতে পাইবে আশায়, তখন গৃহিণীরা খাদ্যের সঙ্গে আরসেনিক (সেঁকো বিষ) মিশাইয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এবং টাসমানিয়ার ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা কি করিয়াছে? তাহাদের কুকুরের জন্য ভাল খাদ্যের অভাব ঘটিলে তাহারা স্থানীয় মানুষদের গুলি করিয়া মারিয়া তাহাদের মাংস কুকুরকে পরিবেশন করিয়াছে।" (উদ্ধৃতি চিহ্নিত অংশটি অসকার পেশেল লিখিত মূল জার্মানের অনুবাদ, লণ্ডনে ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত "দি রেসেস অভ ম্যান" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত।)

বাঙালীরা যেমনই হউক, কালো হউক, ক্ষীণ দেহ অথবা ভীরু হউক, একথা গর্বের সঙ্গে বলিতে পারে যে, তাহারা এমন একটি জাতি যে জাতি এতখানি নৈতিক নোংরামির অনুষ্ঠান কখনও করে নাই। ইংল্যাণ্ডে বর্তমানকালে, আমার মনে হইয়াছে, ন্যায় ও করুণার স্বপক্ষে অধিক সংখ্যক লোক আকৃষ্ট হইতেছে। অন্য কোনও যুক্তিবাদের দেশে এরূপ দেখা যায় না। ইংল্যাণ্ডের সংশ্রবে না আসিলে আমাদের দেশ সম্ভবতঃ তুরস্ক কিংবা পারস্যের মত হইত, কিন্তু জাপানের মত হইতে পারিত না। ইংল্যাণ্ড ইংরেজের দেশ ততটা নহে, যতটা সে সাম্রাজ্যবাদের, উদারনীতি এবং মানবিক স্বাধীনতার দেশ। প্রকৃতপক্ষে এটি সকল জাতীয় মানুষের স্বদেশ। যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা স্বীকার করিবেন। বহু বিভিন্ন জাতীয় লোক এখানে পরস্পর বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে। বেশী

ঝোলানো চীনা মেয়ে, কৃষ্ণকায় লস্কর, কোঁকড়া চুল আফ্রিকান, সরলনাসা ইহুদী, তাহা ভিন্ন জার্মান, ফরাসী, ইটালিয়ান এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকও আছে। সেখানে যাহারাই বাস করুক, এখনও বহুদিন যাবৎ তাহার সামাজিক অবস্থা ও আর্থিক অবস্থার দরুন সাম্রাজ্যাধিকারী শ্রেষ্ঠ দেশ হইয়াই থাকিবে। আমরা যদি ঐ ছোট্ট দেশটিকে সাম্রাজ্যের সবার দেশ বলিয়া মনে করি তবে ক্ষতি কি? ওটা যেন এক বিরাট শহর এবং আমাদের ভারত তার একটি বড় অংশ। আমরা কলিকাতা লইয়া যেমন গর্বিত, ইংল্যাণ্ড রূপ বড় শহর লইয়াও গর্বিত হইতে পারি।

আমরা ইংল্যাণ্ডের লোকদের সে দেশে বাসের ব্যয় কমাইয়া দিয়া বস্তুতঃ সাহায্য করিতে পারি। বিরাট ভারতভূমিতে নানা খাদ্যবস্তু রহিয়াছে। তাহা উচ্চ হিমালয়ের হুনিয়ারা, নীলগিরি অরণ্যের বাদাগরেরা অথবা মহীশূরের মালভূমিবাসী কুরুম্বারা যেভাবে খাইয়া বাঁচে, ইংল্যাণ্ডের দরিদ্র লোকেরাও তেমনি বাঁচিতে পারে। চাউল, গম, ডাল এবং আলুর মত পুষ্টিকর আমাদের জোয়ার প্রভৃতি অনেক শস্য আছে। ইহার জন্য চাহিদা সৃষ্টি করিতে পারিলে ছোটনাগপুর, মধ্য প্রদেশ, মধ্য ভারত, মহীশূর, আসাম এবং বর্মায় যে সব বিস্তীর্ণ অঞ্চল অনাবাদী পড়িয়া আছে, তাহাতে জোয়াবের (Sorghum vulgare) শ্বেতগুচ্ছ, কোডোর (Paspatum scaobulrtum) সোনার শীষ, চুযার (Amarantus blitum) রক্ত শীর্ষ এবং রাগীর (Eleusine coracana) ব্রাউন রঙের নখর মাথা তুলিবে। ইংল্যাণ্ডে শস্তা খাদ্যের প্রচলন করিয়া আমরা কি সুবিধা ভোগ করিব তাহার কথা আপাতত ভাবিতেছি না। ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ভারতের লোকেরা কি মর্মান্তিক দুঃখ ভোগ করে, অথবা ইউরোপের দরিদ্রের মধ্যে চির খাদ্যাভাব তাহাদিগকে যে দুঃখ দেয় ইহা যাহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদের মনে মানুষের দুঃখ ঘুচাইবার প্রবল বাসনা ভিন্ন অন্য কোনও বাসনা স্থান পাইতে পারে না। ইংরেজ মানবপ্রেমীগণের পক্ষে উত্তর ভারতের একবেলা খাওয়া লোকদের দুঃখে অশ্রুবিসর্জন করা প্রশংসাযোগ্য সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ইংরেজরা চার বারে যতটা খায়, ইহারা একবারেই ততটা খাইয়া থাকে। আমাদের দেশবাসীরাও, ইংরেজ আমাদের দুঃখে অশ্রুপাত করিতেছে দেখিয়া বসিয়া বসিয়া অশ্রুপাত করিতে পারে। কিন্তু আমি বলিতেছি না যে আমাদের কৃষক শ্রেণীর অবস্থা আশানুরূপ ভাল। যদি তোমরা তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে ইচ্ছা কর তাহা হইলে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন কর যাহাতে যাহারা অস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় বাস করিতেছে তাহাদের খাজনা কমিতে পারে, গভর্মেণ্টকে বল খাজনা টাকায় অথবা উৎপাদিত জিনিসে গ্রহণ করিতে কিন্তু তাহা অবস্থার উন্নতি অবনতির সঙ্গে উঠানামা করা চাই। তাহার পর কৃষকদের স্বাধীনভাবে ভোগ করিবার জমি দাও, প্রজাদের সঙ্গে খাজনা বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কর, চাষের জমি অন্যকে উপস্বত্ব দেওয়া বা বণ্টন করা নিষিদ্ধ কর, সামাজিক প্রথার বিশেষ করিয়া বিবাহের খরচ বিষয়ে যে রীতি আছে তাহার সংস্কার সাধন কর; জীবনের মান উন্নত করিবার এবং সেই লক্ষ্যে খাটিবার শিক্ষা দাও। আমি

যাহা বলিতে চাই তাহা এই যে, স্বাভাবিক সময়ে আমাদের দেশে যে অভাব অনটন দেখা যায় তাহা ঠিক ইউরোপীয় দরিদ্রদের অভাব অনটনের ন্যায় অতখানি দুঃসহ নহে। ইংল্যাণ্ডে কোনও ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহে অক্ষম হইলে যে চরম অসহায়তার মধ্যে পড়ে তাহাতে তাহার অবস্থা দুইদিক হইতে অসহনীয় হয়। এমন কোনো নদী তাহার জন্য নাই যাহাতে সে একটি মাছ ধরিতে পারে, এমন কোনও জঙ্গল নাই যেখান হইতে সে কোনও মূল বা পাতা সংগ্রহ করিয়া খাইতে পারে, এমন কোনও প্রতিবেশী নাই যাহার অপ্রচুর খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ গ্রহণ করিতে পারে। তাহার গৃহ নাই যেখানে সে বাস করিয়া জীবন কাটাইতে পারে। সেখানকার ভূমি কয়েক জন মাত্র ব্যক্তির অধিকারে, এবং প্রত্যেকের জমি তারের বা ছোট ছোট গাছের বেড়ায় ঘেরা। অতএব আমাদের দেশের দরিদ্রের মতো আম বাগানে তাহার ক্লান্ত দেহটি বিছাইয়া ক্লান্তি দূর করিবে এমন স্থান তাহার কোথাও নাই। ইহার উপর আবার তাহার আয়ের উপর নির্ভরশীল ছোট ছেলেমেয়ে থাকিলে দুঃখের অন্ত থাকে না। এরূপ অনেক হতভাগ্য সেখানে জলে ডুবিয়া মারা পড়ে। সাম্প্রতিক মিডল্যাণ্ড রেলওয়ের ধর্মঘটের সময় এক ইংরেজ পুনরায় চাকরিতে বহাল হইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া তাহার পরিবার সমেত জলে ডুবিয়া দুঃখদুর্দশার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। অবশ্য এমন অবস্থায় তাহারা নিঃস্বালয়ে গিয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু যাহার কিছুমাত্র আত্মসম্মানবোধ আছে, তাহার পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। আমি সেখানে থাকাকালীন আর একটি অতি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিতে দেখিয়াছি। এক দরিদ্র বিধবা, তাহার তিনটি সন্তান। বড়টি মেয়ে, বয়স সাত বৎসর, ছোটটি কোলে। সকাল ৭টায় সে কাজ করিতে বাহির হইয়া যাইত, ফিরিত রাত্রি ১১টায়। অনেক সময় ১২টাও হইত। এমনকি ১টাও বাজিয়া যাইত। এই সময় ঐ শিশুটিকে সে তাহার সাত বৎসরের মেয়ের উপর দেখাশোনার ভার দিয়া যাইত। রাখিয়া যাইত মাত্র এক ফারদিং (এক পয়সা) মূল্যের সামান্য একটুখানি দুধ। বেচারী ইহার বেশি আর খরচ করিতে পারিত না। কারণ কাজের শক্তি বজায় রাখিতে তাহাকেও কিছু কিনিয়া খাইতে হইত। শিশুটি মরিয়া গেল। ডাক্তার বলিল অনাহারে ও অযত্নে মৃত্যু ঘটিয়াছে। আমার মনে হইল এই শিশুটি এই দুঃখ ভোগ করিত না, তাহার মৃত্যুও হইত না, যদি সে তার এই এক পয়সার দুধের সঙ্গে আধ পয়সা দামের ভারতীয় খাদ্য রাগী (Eleusine coracana) মিশাইয়া খাইত। ইংরেজদিগকে যদি এই খাদ্যে অভ্যস্ত হইতে, অথবা বজরার (Pennisetum typhodeum) রুটি এবং ভাত ও ডাল খাওয়া অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিই, তাহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি নাই। আমাদের দেশেও দরিদ্র আছে, এবং তাহাদিগকে নূতন খাদ্যে অভ্যাস করাইয়া দিতে হইবে। আমাদের হিতব্রত সর্বদাই বস্তুনির্ভর, অর্থাৎ কিছু দানের উপর নির্ভরশীল, তাই আমরা কোনও নূতন নীতির পরিকল্পনা ও তাহা কার্যকর করিয়া হিতসাধনের কল্পনা করিতে পারি না।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দরিদ্রের প্রতি আমাদের ব্যবহার ইউরোপীয়দের অপেক্ষা ভাল। আমাদের বিভিন্ন জাতি বা অবস্থার লোকদের পরস্পরের ভিতর একটা ভ্রাতৃত্ব বোধ

আছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এরূপ নাই। আমাদের ধর্মে হিতব্রতকে ঈশ্বরের অভিপ্রেত মনে করা হয়, সামাজিক দায়িত্ব মনে করা হয় না। ব্রাহ্মণদের শিক্ষা ও ন্যায়ের বোধ, বৈষয়িক হিসাবে তাঁহাদের অধিকাংশই অতি দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নৃপতি, বণিক এবং ধনীসম্প্রদায়ের লোকদিগকে দারিদ্র্যের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য করিয়াছে। আমাদের দেশে ঐশ্বর্য তাই ইউরোপের মত সম্ভ্রম লাভের অধিকারকে একচেটিয়া করিয়া রাখে নাই। আমাদের জাতিভেদ সত্ত্বেও মানুষে মানুষে পরস্পর যে সমবেদনাবোধ আমাদের মধ্যে রহিয়াছে ইউরোপে তাহা নাই। পল্লীগ্রামে বিভিন্ন জাতি ও অবস্থার লোকদের ভিতর আমরা যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অনুভব করি তাহা ইউরোপে অজ্ঞাত। বিপদে আপদে পরস্পরকে ইহাবা সাহায্য করিতে ছুটিয়া আসে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পরস্পরে একটা সম্পর্ক পাতাইয়া লয়, এবং ভাই, দাদা, চাচা ইত্যাদি সম্বোধন করে। যদি ইংরেজরা দেখিতে চাহে শিক্ষায় এবং সামাজিক মর্যাদায় ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কিভাবে একত্র এক পরিবারভুক্ত হইয়া মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাদের ভারতীয় পল্লীগ্রামে আসা উচিত। আমাদের জীবন বীমা নাই, নিঃস্বালয় নাই, চাকুরিজীবী নার্স নাই, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য পৃথক বৃত্তিধারী সংস্থা নাই। আমাদের প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে কোনও গোপনীয়তা নাই। বন্ধ তাক খুলিয়া নরকঙ্কাল আবিষ্কার কথার অর্থ আমরা জানি না।

ইংল্যাণ্ডের অবস্থা স্বতন্ত্র। সেখানে প্রতিবেশীদের বিষয়ে কাহারও মাথাব্যথা নাই। পাশের বাড়ির ব্যাপারে কৌতূহলপ্রকাশ অশিষ্টাচার মনে করা হয়। আমার বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না, "It is my business" অন্যায় কৌতূহলীকে এই রকম জবাবই শুনিতে হয়। সেখানে জনের ব্যাপার জনেরই, টমের নহে। আমাদের দেশে অল্পবিস্তর রামের ব্যাপার প্রতিবেশী শ্যামের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপীয় মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষ জীবনের গোড়া হইতেই আরম্ভ হয়। এ বিষয়ে তাহারা আমাদের অপেক্ষা প্রকৃতিকে অধিক অনুসরণ করিয়া থাকে। পাখীরা উড়িতে শিখিলে বাসা ছাড়িয়া যে যাহার পথ দেখিতে বাহির হইয়া যায়। আমরা পৈতৃক বাসা ছাড়ি না। আমরা স্ত্রীদের সেইখানে আনিয়া হাজির করি। বিবাহ করিতে যাইবার সময় মাকে বলি, "তোমার জন্য দাসী আনিতে চলিলাম।" ইহাই প্রচলিত রীতি। নববধূ সত্যই কন্যারূপে পরিবারে আসিয়া যোগ দেয়। আমাদের ছোট ছোট অ্যালিস বা অ্যাগনিস উড়িতে শিখিয়া খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া পৃথক বাসা বাঁধিতে চায় না, কারণ তখন তাহার বয়স হয়ত মাত্র পাঁচ বৎসর। ইংল্যাণ্ডে ছেলেমেয়েরা একুশ বৎসর বয়স উপস্থিত হইলে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে পৃথক বাস ও জীবিকা নির্বাহ পছন্দ করে। ঐ বয়স পর্যন্ত সন্তানদিগকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদি দিয়া তাহাদের প্রতি কর্তব্য বা আইনতঃ কর্তৃত্ব শেষ হইয়াছে মনে করে। এইভাবে যে সব সন্তান পৃথক হইয়া যায় তাহাদের জন্য অবশ্য পৈতৃক গৃহের দ্বার উন্মুক্তই থাকে। তাহাদের বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত সে বাড়ী তাহাদেরই মনে করে, অনেক সময় ছুটির দিন সেখানে আসিয়া কাটায়। বিবাহের পরে আর তাহা থাকে না। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রীতি কিছু

অন্য রকম, বিশেষ করিয়া কন্যাদের সম্পর্কে। ইঁহারা যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া প্রাপ্তবয়স্কা হইলেই কন্যাদের প্রতি কর্তব্য শেষ করেন না। তাহাদের জন্য এমন সংস্থান রাখেন যাহাতে তাহারা তাহাদের বংশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। ইঁহাদের শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত পিতৃগৃহেই থাকে এবং অনেক সময় পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া নিজের পছন্দমত বিবাহও করে। এবং এইসব বিদ্রোহী পুত্রকন্যাদের বিষয়েই উপন্যাস লেখকেরা খুব রোমাঞ্চকর সব কাহিনী রচনা করিতে ভালবাসেন। অভিজাত পরিবারের মেয়ে অথচ অর্থাভাব, এরূপ ক্ষেত্রে তাহারা অন্য লেডির সঙ্গিনী অথবা তাঁহাদের গৃহে সন্তানদের শিক্ষিকার কাজ করে।

৮

পরিবারের বিভাজন ইংল্যাণ্ডে একটি স্বাভাবিক ঘটনা মনে করা হয়। আমাদেব দেশে ইহাকে মনে করা হয় স্বার্থপরতা। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিব কাছেই ইহা স্পষ্ট যে, আমাদের সামাজিক পদ্ধতি ঠিক পথে চলে নাই। ইহা হইতে আর কি সিদ্ধান্ত করা যায়? আমি ত ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রে গৌরবময় জাতীয় জীবনের বহু সূত্র হইতে আবোহ প্রণালীতে যাহা যুক্তিসঙ্গত তাহাতে উপনীত হইতেছি। এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমি এক বিবাট ব্যর্থতা হইতে অবরোহ প্রণালীতে যাহা ভ্রমাত্মক সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতেছি। বহু ভ্রান্তিপূর্ণ ঘটনা একের পর এক জমা হইয়া তাহাদের অশুভ প্রভাবে শেষ পর্যন্ত ভারতের অধঃপতন ঘটাইয়াছে। অনেক সময়েই আমাদের গুণগুলিই আমাদের দোষে পবিণত হইয়াছে, এবং তাহাদের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি গুণে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবতঃ আমাদেব পূর্ব দিগন্তে একটি ক্ষীণ আলোর রেখা দেখা দিয়াছে। আমাদের জগতকে যে অন্ধকাবে ঢাকিয়াছে তাহাকে কি আমরা মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া আমাদের আলোকোজ্জ্বল বন্ধুদেব তাহা দেখিতে দিব না? দিব না এই ভয়ে যে তাহারা যদি সে অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, অথবা তাহাদের উগ্র আলোকে তাহা যদি মিলাইয়া যায়? অহমিকা, মিথ্যা দেশপ্রেম, উন্মাদনাপূর্ণ ধর্মশীলতা যেন আমাদের বুকের মধ্যে কখনও এই সাপকে দুধকলা দিয়া না পালন করে। হয় তো আমি ইংল্যাণ্ডের আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিতে দেখিয়াছি, কোনও মেঘ ভ্রূকুটি-কুটিল, কোনওটি বা সরিয়া যাইতেছে, কোনওটি শক্তি সংগ্রহ কবিতেছে, কোনওটি মিলাইয়া যাইতেছে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এবং ইহাই চিরকাল চলিবে। ক্ষয়িষ্ণুতার চির উপস্থিতিও ব্রিটিশ জাতীয় দেহকে সহজে ক্ষয় করিতে পারিবে না, তাহাকে বহুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ আমি যতদূর বুঝিয়াছি এই দেহের জীবনীশক্তি এখনও পূর্ণ শক্তিতে সক্রিয় রহিয়াছে। এখনও সে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে। সেখানকার লোকেরা তাহাদের দোষ ত্রুটি সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। তাহারা ক্রমেই অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিতেছে, পরিবর্তনে তাহারা ভীত নহে, এবং সমস্বার্থে তাহারা সকলে মিলিত ভাবে কাজ করিতে পারে। মোটের উপর তাহাদের শক্তি সুদৃঢ় হইতেছে, ভাঙিয়া যাইতেছে না। সেখানকার লোকদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধীশক্তি ক্রমেই উচ্চগৌরব লাভ করিতেছে, জাতিভেদের অসঙ্গতিসমূহ ক্রমেই দূর করা হইতেছে, ভূমিতে একচেটিয়া অধিকার ক্রমে ভাঙিয়া দেওয়া হইতছে এবং দরিদ্রদের প্রতি সযত্ন মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। একথা ঠিক যে, এখনও অনেক বাকি, অনেক বিষয়ে আরম্ভ মাত্র হইয়াছে, তবু দানবেরা ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনের চাকায় ঘাড় লাগাইয়া বীর্যের সঙ্গে চাকাটাকে ঘুরাইয়া দিতেছে, এ দৃশ্যকে প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।

সৃজনমূলক কাজে ব্যক্তির যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা এইভাবে ইউরোপের লোকদের মনে জীবনের প্রথম থেকেই অনুভূত হইতে থাকে। ইহার যেমন একটি ভাল দিক আছে, তেমনি ইহার একটি মন্দ দিকও আছে। ইহাতে যেমন কোনও ব্যক্তিকে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হইতে শিক্ষা দেয়, তেমনি সেই সঙ্গে ইহাতে আত্মপ্রেম অযথা বাড়াইয়াও দিতে পারে। এই রকম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ইংরাজদের আছে, সেজন্য আমার কিছু ভয় আছে। এবং এই ভয় হইতেই আমি আমার দেশবাসীকে বলিতে চাহি যে, উহাদের পথে অকারণ বাধা সৃষ্টি না করাই ভালো। উহাদের দেশে জীবন সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে ব্যক্তি কিছু উপরে উঠিতে পারিয়াছে তাহার বন্ধুগণ তাহাকে আরও উপরে উঠিতে সাহায্য করে, এবং যে নীচে তলাইয়া যাইতেছে তাহাকে আরও নীচে নামাইয়া দেয়। অতএব অংশতঃ আত্মগরিমার জন্য এবং অংশতঃ এই ভয়ের জন্য সে তাহার প্রতি সহানুভূতিশীল প্রতিবেশীর নিকট হইতেও তাহার ব্যক্তিগত অবস্থা গোপন রাখিয়া যায়। সেজন্য প্রতিবেশীরা পরস্পর পরস্পরের বাড়িতে সব সময় যায় না, যদি কখনও যায় তাহা হইলে বাড়ির সকল অংশে প্রবেশ করে না। রান্নাঘরে যায় না, এবং সেদিন কে কি রান্না করিয়াছে বা খাইয়াছে তাহা লইয়া পরস্পর আলাপ করে না। তাহারা বসিবার ঘরে থাকে, অথবা ডাইনিং রুম পর্যন্ত যায়। মেয়েরা কেবল তাহাদের স্বামীদের আচরণ লইয়া অথবা সন্তানদের কার্যকলাপ লইয়া আলাপ করে। অথবা তখন যদি দেশে কোনও উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়া থাকে তাহা লইয়া আলোচনা করে। তাহাদের ভাল দিকটাই সব সময়ে তাহারা তাহাদের প্রতিবেশীদের সম্মুখে প্রকাশ করে। তাহাদের প্রধান চেষ্টা পরস্পরকে সব বিষয়ে হারাইয়া দেওযা, অ্যাট হোম, টী পার্টি, গার্ডেন পার্টিগুলিও কি এই উদ্দেশ্যেই? কে জানে! যাহাই হউক অনেক জিনিসই উহাদের দেশে শুধুই প্রথা পালন এবং আনুষ্ঠানিক। প্রথমতঃ এসব ব্যাপার কর্তব্যবোধ হইতে, দ্বিতীয়তঃ ইহার পিছনে সামাজিক দিক হইতে আবশ্যকতাবোধ এবং সবশেষে আনুষ্ঠানিক আড়ম্বর, কিন্তু ইহাতে সেন্টিমেন্ট অথবা হৃদয়ের স্পর্শ বা ভাব লালিত্য খুব কমই আছে। কর্তব্যবোধের কাছে মনের কোমল ভাবসমূহকে বিসর্জন দেওয়াই ইংরেজ চরিত্রের বিশিষ্টতা। আর ভারতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হইল সেন্টিমেন্টের কাছে কর্তব্যকে বিসর্জন দেওয়া। ইংরেজ চরিত্রেও যথেষ্ট সেন্টিমেন্ট আছে, কিন্তু তাহা আমাদের মত অতটা উন্মাদনা ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ নহে। তাহাদের যাহা আছে তাহা অত্যন্ত দৃঢ়। তাহা ভাঙে কিন্তু নোয়ায় না। তাহারা কি ভালবাসা, স্নেহ, বদান্যতা ও দয়া-ধর্মকে কোমল ভাব বলে? সম্ভবত আমারই ভুল, কারণ আমার মনে হইয়াছিল, কোমল কোষদেহ গাছের চারা শুষ্ক ভূমিতে আনিয়া পুতিলে দৃঢ় হয় এবং তাহাতে কাঁটা গজায়। ওদেশের নরনারীর উগ্র স্বাতন্ত্র্যবোধ, উহাদের জীবন বেষ্টন করিয়া যে শুষ্ক লৌকিকতা, যে লৌহদৃঢ় জাতিভেদ, এবং সরল বিশ্বাসী মানুষেরা যেভাবে দেশের সর্বত্র ছড়ান চোর জুয়াচোর এবং নরপশুদের হাতে সহজে ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রতারিত হয়, তাহাতে আমাদের

দেশের মত তাহাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় কঠিন হইয়া উঠে। অতএব আমরা ভারতবর্ষে যেভাবে দানের যোগ্য স্থানকে বা পাত্রকে সোজাসুজি দান করি, ইংল্যাণ্ডে সেরূপ হইতে পারে না। প্রথমতঃ দানের যথার্থ স্থান বা পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া দুঃসাধ্য। দ্বিতীয়তঃ যাহার স্বভাবে দানপ্রবণতা আছে, এ ভাবে দান করিলে অল্পদিনের মধ্যে তাহার অবস্থা অচল হইয়া উঠিবে। কেহ হয়তো মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষের জন্য শত শত পাউণ্ড দান করিল, সেই সময়েই সম্ভবতঃ তাহাব অট্টালিকার কয়েক হাত দূবে কোনও শিশু অনাহারে মরিতেছে। কাজেই বদান্যতা ওদেশে একটি সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র আদর্শ রূপ লইতে বাধ্য। ইহা যে কোনও চাঁদার তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে। দাতার সংখ্যা অগণিত। তাহারা ব্যক্তিগত কাহাকেও দান করে না। প্রতিষ্ঠানকে দান করে।

ইংরেজদের জাতিভেদ প্রথা লইয়া আমি ইতিপূর্বে কিছু কিছু উল্লেখ করিযাছি। বৃত্তি ও ধর্মের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কবিযা আমাদের দেশে যেভাবে জাতিভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে, ইংল্যাণ্ডের জাতিভেদ সেরূপ নহে। এই দুটি জিনিস সেখানে যে ভাবে পরস্পরকে জড়াইয়া আছে, একে অন্যের সীমানায় প্রবেশ কবিয়াছে, তাহাতে কোথায় একটা জাতি শেষ হইল এবং অপরটি আরম্ভ হইল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তবু ইহা বলিতে আমি বাধ্য যে, জাতি বিষয়ে কুসংস্কার বা পক্ষপাতিত্ব ওদেশে আমাদের দেশের অপেক্ষা অনেক বেশি প্রবল। ওদেশের এবং আমাদের দেশের দুই জাতীয় জাতিভেদ প্রথা মিলিয়া আমাদের দুটি দেশের লোকের মধ্যেই সামাজিক সম্পর্ক আশানুরূপ গড়িয়া উঠে নাই। আমাদের দেশে ইউরোপীয়দের জাতির ভিত্তি প্রধানতঃ অর্থ ও পদমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ততঃ আমাদের সম্পর্কে এ কথা অবশ্যই সত্য। ইহা উভয়ের মধ্যে এক দুস্তর বাধা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষার বা সংস্কৃতির অসমতা বড় কিছু নহে, কারণ ইহার প্রতিকার আছে, এবং ইংরেজরা দেশী নৃপতি বা ধনকুবেরের ক্ষেত্রে জাতিভেদের কোনও তোয়াক্কা করে না। তাই দেখা যায় তাহাদের নেটিভদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা কয়েকজন রাজা মহারাজা অথবা যে অল্প সংখ্যক লোকদের মনে কোনও সংস্কার নাই, অথবা যাহারা এদেশের মানুষ হইয়াও এদেশের সহিত সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহা ভিন্ন "জেনটলম্যান"-এর সংজ্ঞা বিষয়েও ওদেশের সঙ্গে এদেশের আদর্শভেদ আছে। এদেশে আগের কালে নীতিজ্ঞান, শিক্ষা এবং বংশ—এই তিনটির যোগে ভদ্রলোক হওয়া চলিত। এখন ইহার সঙ্গে ঐশ্বর্য, জমিদারি এবং গভর্মেন্টের অধীন একটি বড় চাকরি, অথবা কোনও ভদ্রবৃত্তিজাত আর্থিক সাফল্য যুক্ত হইয়াছে। প্রথম তিনটি গুণ প্রাচ্য দেশের ভদ্রলোকের আদর্শ, এবং শেষের আধুনিক গুণ পাশ্চাত্ত্য দেশের আদর্শ। এবং এইগুলিই তাহাদের 'জেনটলম্যান' রূপে গণ্য হইবার একমাত্র গুণ। অন্যত্র বলিয়াছি যে, ইউরোপের বর্তমান জাতিভেদ প্রথা ক্রমে ভাঙিয়া যাইতেছে। ইত্যবসরে আমার আশা করিতে বাধা নাই যে, এ দেশে ইউরোপীয়দিগের সহিত সামাজিকতায় কোনও ভারতীয় যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার

নিজস্ব সম্মানবোধ না হারায়। এবং প্রত্যেকটি ভারতীয়ের যেমন বড় কর্তব্য তাহার জাতিভেদ প্রথার অসঙ্গতিগুলি পরিহার করিয়া চলা, কারণ ইহা মানবিক কর্তব্য, উদারতা, এবং সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের বিরোধী এবং জাতীয় উন্নতিরও পরিপন্থী, তেমনি তাহার উচিত, সে যে গৌরব উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছে, তাহার যেন সে উপযুক্ত হয়, এবং তাহাকে বাঁচাইয়া চলে। আত্মসম্মান বোধের দাবি উভয়ের প্রতিই।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরদিন সকালে আমি ঐ অঞ্চলের পুলিস ম্যাজিস্টেটের আদালতে গিয়া অনুসন্ধান করিলাম, যে মারামারি আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার জন্য কোনও পক্ষ মামলা দায়ের করিয়াছে কি না। কেহই এ কার্য করে নাই। ওখানে উহাদের মামলা করিবার সময় নাই। প্রয়োজন হইলে অবশ্যই যায়, মামলা করার আমোদ উপভোগ করিতে যায় না। মোকদ্দমার বিলাস, ইহার উত্তেজনা এবং বিষণ্ণতার মুহূর্ত, ইহার আনন্দ এবং বেদনা, ইহার জয় ও পরাজয়ের অভিজ্ঞতা হইতে ওদেশের মূঢ়গণ বঞ্চিত। আমাদের দেশের বিচারালয়গুলি দীর্ঘজীবী হউক। আমাদের হাজার হাজার দরিদ্র কৃষিজীবী ফসল কাটা হইলে অপর্যাপ্ত সময় হাতে পায়, তাহা লইয়া কি করিবে ভাবিয়া পায় না। তাহাদের কাছে আদালত সুখের ও সান্ত্বনার আকর। ইংল্যাণ্ডের লোকেদের জুয়ার আড্ডা আছে, উহা মোকদ্দমার নিকৃষ্ট বিকল্প। আমি যে আদালত দেখিতে গিয়াছিলাম তাহার আশেপাশে অলস প্রকৃতির লোকেদের উপস্থিতি লক্ষ্য করিলাম না। এই জাতীয় লোক আমাদের দেশের আদালতের কাছে গাছের তলায় ধৈর্যের সঙ্গে বসিয়া থাকে এবং কেহ সেদিকে আসিতেছে দেখিলে তাহার দিকে আড়চোখে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে, সাক্ষী দরকার আছে কি? 'অ্যালিবাই' দরকার আছে? অর্থাৎ খুন জাতীয় অপরাধ করিয়া থাকিলে অপরাধী অপরাধ অনুষ্ঠানের সময় অন্য স্থানে ছিল প্রমাণের জন্য এই জাতীয় লোক কিছু টাকার বিনিময়ে সেরূপ সাক্ষী হইতে রাজী থাকে। এই নূতন ব্যবসাটি ব্রিটিশ বিচারবিধির ফলে জন্মিয়াছে। ঝানু লোক ভিন্ন নবাগতরাও এই কাজ করিয়া থাকে। কোনও একটিমাত্র ফৌজদারি মামলাতেও ধনী ব্যক্তি জড়িত থাকিলে কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় নাই ইহা কি কোনও ম্যাজিস্ট্রেট বা ব্যারিস্টার কিংবা উকিল আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিবেন? ধনীর হাতে মিথ্যা সাক্ষীরূপ অস্ত্রটি বড়ই ভয়ঙ্কর। ইহা দ্বারা তাহারা দুর্বলকে নতি স্বীকারে বাধ্য করিতে পারে। মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে কতজনে দণ্ড পাইতেছে, ব্যারিস্টার মিথ্যার পক্ষে লড়িতেছেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ড দিতেছেন। ইহা আমাদের দেশে একটি অতি সাধারণ ব্যাপার। ইহার বিপরীত ঘটনা এককালে ঘটিত স্মরণ আছে। সরলপ্রাণ পল্লীবাসী সাক্ষীর সমন পাইলে, পাছে আদালতে গিয়া অসতর্কতাবশতঃ কোনও অসত্য বলিয়া বসে, সেজন্য সে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে বাড়ি হইতে দূরে পলাইয়া যাইত। বর্তমান বিচার-রীতিই ইহার জন্য দায়ী, অথচ ইহা অপেক্ষা ভাল কোনও রীতি কি হইতে পারে তাহাও আমি বলিতে পারি না। জাতীয় জীবনের এই সব চাপল্য বিষয়ে যখন চিন্তা করি তখন মাঝে মাঝে মনে অবসাদ আসে।

জাতীয় জীবনে জাতীয় গৌরববোধ প্রথম কথা। যাহা আমাদের জাতীয় লজ্জার কারণ, পুরুষের মত তাহার মোকাবিলা করার যদি সাহস না থাকে তবে আর সে কি গৌরব? জাতীয় গৌরব রক্ষার খাতিরেই আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার বিরুদ্ধে অবিরাম কঠোর সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়া দরকার। এই হীন ও নিষ্ঠুর প্রথার বিরুদ্ধে কঠোরতম আইন হইলেও মনে করিব তাহা যথেষ্ট কঠোর হইল না। মিথ্যা সাক্ষ্যের চাহিদা বর্তমানে ইংল্যাণ্ডে খুবই কম। এবং যেটুকু চাহিদা আছে, সমাজের গণ্যমান্য অংশ হইতেই তাহার যোগান দেওয়া হইয়া থাকে। চাহিদা বাড়িলে অবশ্যই অনেক সাক্ষী জুটিবে এবং কম দামেই পাওয়া যাইবে। ইহার যে সম্ভাবনা একটা দেখা দিয়াছে তাহা দ্বিতীয় চার্লস-এর ক্যাথলিকদের ভীতি, কিংবা গত শতাব্দীতে যখন লাইসেনসিং অ্যাক্টের সাহায্যে মদ্যবিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা হয় সে সময়ে। সব রকম অপরাধেরই প্রথম চিহ্নগুলি সকল জাতির ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে। দণ্ড হইতে মুক্ত থাকা, সুযোগলাভ এবং অর্থপ্রাপ্তি এই জাতীয় লোকের বংশবৃদ্ধি ঘটায়! কিন্তু ব্যক্তিগত সম্মানবোধ ইংল্যাণ্ডে এমনই প্রবল যে সেখানে এ রকম ঘৃণ্য জীবের চাহিদা বৃদ্ধি হইতে পারে না। জনমতও প্রবলভাবে ইহার বিপক্ষে। পূর্বেই বলিয়াছি সেখানকার লোকদের মোকদ্দমা করিবার সময়ের অভাব। মারামারি হইল, তাহার পর এক গ্লাস উগ্র পানীয় পেটে পড়িলেই সব মিটিয়া যায়। লণ্ডনের আদালতে যেসব কেস আসে তাহা গুরুতর কিছু নহে, তাহার মধ্যে মাতলামি অন্যতম।

ইংল্যাণ্ডে বা ইউরোপের অন্যত্র মাতলামি একটি নিন্দনীয় অভ্যাস। ইহার কোনও প্রতিকার নাই, কারণ কোনও না কোনও জাতীয় সুরাপান সেখানে জাতীয় পান রূপে স্বীকৃত। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর একটা অংশ থাকিবেই যাহারা মদ্যপান করিলেই মাতাল হইয়া পড়ে। মৃদু তিক্ত পানীয় হইতে ক্রমশঃ কড়া 'এল' ও 'স্টাউট' এবং তাহার পর হুইসকি ব্র্যাণ্ডি জাতীয় কড়া পানীয়। ইহার অভ্যাস ছাড়া কঠিন হয়, শেষে ব্যাধিতে পরিণত হয়, এই অভ্যাস ছাড়া আফিং ছাড়ার মতই কষ্টকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় স্ত্রীলোকদের মাতাল হওয়ার অভ্যাস। তাহারা খোলা পথে মাতলামির অপরাধে ধরা পড়িয়া আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হয়, এরূপ ঘটনা মনকে পীড়া দেয়। স্ত্রীলোকরা যে জাতীয় অপরাধই করুক, তাহা অস্বাভাবিক বোধ হয়, এবং এরূপ দৃশ্যে অনভ্যস্ত চোখে আরও বেশি অস্বাভাবিক ঠেকে। যে গৃহে স্বামী স্ত্রী উভয়েই মাতাল হয়, সে গৃহের দুর্দশার কথা আলোচনা না করাই ভাল। তবে সুখের বিষয় এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটে না।

এই জাতীয় দৃশ্যই ইউরোপে সুরাপানের বিরুদ্ধে একটা বিরূপতা জাগাইয়া তুলিয়াছে, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে যাহা হয়, পানবিরোধীরা আর এক চরম প্রান্তে গিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের হাতে ক্ষমতা থাকিলে যাহাতে কেহ এক ফোঁটা মদও না খাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইয়া থাকেন বৎসরে কত কোটি টাকা

ইহাতে ব্যয় হয় এবং কত হাজার লোক মদ্যপানের ফলে প্রতি বৎসর মারা যায়। আমাদের মধ্যে কত না ভবিষ্যদ্বক্তা আছেন তাঁহারা গণনা করিয়া বলিয়া দিতে পারেন কবে বিশ্ব ধ্বংস হইয়া যাইবে। কত না জ্যোতির্বিদ আছেন যাঁহারা ধূমকেতুর পুচ্ছের ঘায়ে পৃথিবী ভাঙিয়া পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইবে ভয়ে সর্বদা কাঁপিতেছেন। কত না জীবাণুবিদ্ আছেন যাঁহারা ধ্বংসের জীবাণু লইয়া আন্দোলন করিয়া আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতেছেন। কত না দার্শনিক আছেন যাঁহারা বলিতেছেন মাংসাহার করিয়া আমরা ক্রমে পশুতে পরিণত হইতেছি। (তাঁহারা কি নিরামিষ খাইয়া উদ্ভিদে পরিণত হইতেছেন?) অতএব আমাদের মধ্যে সুরা-বৈরী আছেন, আফিং-বৈরী আছেন, তামাক-বৈরী আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই এইসব সেবীদের ধ্বংসের পরিণামটা দেখাইয়া দিতেছেন। জীবন-প্রবাহ তথাপি বহিয়া চলিতেছে।

৯

স্মরণাতীত কাল হইতে মানবজাতি সুরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে তথাপি মানবজাতি বিলুপ্ত হয় নাই, স্বল্পায়ু হয় নাই, অথর্ব হয় নাই। পূর্বে যেমন চলিতেছিল, দুনিয়া আজিও তেমনি চলিতেছে। সর্বাপেক্ষা বীর যাহারা, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যাহারা, সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান যাহারা সেইরূপ সকল জাতিই আগেও যেমন সুরা ব্যবহার করিত, এখনও তেমনি করিতেছে, তথাপি তাহারা আগের মতই বাঁচিয়া রহিয়াছে, আগের মতই বৃদ্ধি পাইতেছে। মাতলামি সর্বথা নিন্দনীয়, কড়া মদ খাওয়ার নেশা যেমন নিন্দনীয় ঠিক তেমনি। কিন্তু এ কথা এখনও অপ্রমাণিত আছে যে, ওয়াইন বা দ্রাক্ষাসুরা অথবা বিয়ার পরিমিত মাত্রায় পান করিলে দেহের পক্ষে তাহা মারাত্মক হইয়া উঠে। এক পাত্র বিয়ার অথবা এক পাইপ তামাক লক্ষ লক্ষ মানুষের সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কিছু আনন্দ দিয়া থাকে। যে-সব বৃদ্ধ বই পড়িতে অথবা ধর্মকর্মে নিযুক্ত হইতে পারে না, তাহারা তাহাদের দুর্বল দেহকে একটুখানি চাঙ্গা করিয়া তুলিতে একপাত্র সুরা পান করিয়া থাকে। শ্রমিক ও বৃদ্ধদের এই একমাত্র আনন্দ হইতে শুধু এই কারণে বঞ্চিত করিব যে, অল্প কয়েকজন মানুষ ইহার অপব্যবহারের দ্বারা নিজেদের পশুতে পরিণত করিয়াছে? মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন আমাদের দেশের লোকের কাছে চিত্তাকর্ষক বোধ হইলেও কঠোর অভিজ্ঞতা হইতে উৎসাহীদের কার্যকলাপের সুফল বিষয়ে সন্দিহান করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের দেশে আমরা একটি ভুল করি এই যে, সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কাজ বা সৎকাজ কতদূর টানা যাইতে পারে তাহার বিষয়ে উদাসীন থাকি। সীমা ছাড়াইয়া গেলে ভাল জিনিসও মন্দে পরিণত হয়। আমাদের দেশের অনেকেরই জানা নাই যে, দ্রাক্ষাসুরা বা বিয়ার সামাজিক রীতি সঙ্গতভাবে গ্রহণ করা, আর পান করিয়া মাতাল হওয়া বা পানে অতি অভ্যস্ত হওয়া এক কথা নহে। তাহার কারণ আমাদের দেশে যাহারাই মদ্য গ্রহণ করে তাহারাই মাতাল হওয়ার জন্য উহা করে। ইহাদের দোষ নাই, কারণ সুরা তাহারা একটু একটু আস্বাদ করিয়া পান করা অভ্যাস করে নাই। বিভিন্ন সুরার বিভিন্ন স্বাদ, বিয়ার চিরেতার জলের মত তিক্ত স্বাদের, পোর্ট ওয়াইন অতিরিক্ত মিষ্ট এবং কড়া স্বাদের ড্রাই শ্যামপেন ধারালো এবং উগ্র স্বাদের, হুইসকি ধোঁয়াটে। কিন্তু পানীয় যে জাতেরই হোক, ভারতীয়রা তাহা কুইনিন মিক্সচারের মত এক ঢোঁকে গিলিয়া ফেলে। উদ্দেশ্য অব্যবহিত ফললাভ, অর্থাৎ মাতাল হওয়া। ইউরোপে এরূপ করা হয় না। সেখানে উহা জল খাওয়ার সামিল। ইউরোপের সর্বত্র ভদ্রগৃহে দামী মদ পান করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে কেহই নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে না। মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়া রীতিসঙ্গত নহে। তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত হইবে ব্র্যাণ্ডির গন্ধ নিশ্বাসে ছড়াইয়া

কোনও জেনটলম্যান অন্য জেনটলম্যানের বাড়িতে যাইবার কল্পনা করিতে পারে না। ইহা ঘৃণ্য বলিয়া মনে করা হয়।

মদ জ্ঞানী লোকের নিন্দার কারণ হয়, ইহা ভুল। পক্ষান্তরে হীন লোকের হাতে পড়িলে মদেরই বদনাম হয়। একথা বলিয়াছেন হাফিজ।

মদ্যবিরোধীদের মতে মদের জন্য গ্রেট ব্রিটেনে বহু লোকের মৃত্যু ঘটে। আমার কিন্তু মনে হয় মৃত্যু ঠিক ঐ কারণে নহে। বৃদ্ধত্ব, বাত ও ফুসফুসের অসুখেই তাহাদের বেশি মৃত্যু ঘটে। আমাদের দেশে যেরূপ কলেরা কিংবা জ্বর হয়, ইংল্যাণ্ডে তাহা প্রায় অনুপস্থিত। যে-সব কষ্টকর অসুখ তাহাদের সর্বদা উত্তেজনার মধ্যে রাখে তাহা হইতেছে সর্দি, ডিসপেপসিয়া ও দাঁতের ব্যথা। খুব অল্প বয়স হইতেই নারী পুরুষ উভয়েই দাঁত তোলাইয়া থাকে। সতেরো বৎসরের ছেলেরও দাঁত তোলাইতে দেখিয়াছি, ইহার পূর্বেও কেহ কেহ তোলাইয়া থাকে। এখন সেজন্য কৃত্রিম দাঁত তৈয়ারির দিকে উহারা বিশেষ মন দিয়াছে। এখন চীনামাটির দাঁত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। ভারতের অনেক অংশের আবহাওয়া অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া অনেক ভাল। সেখানে উহা শীতল এবং কর্মপ্রেরণাদায়ক। ইউরোপের ন্যায় এখানকার শীত অতি ঠাণ্ডা নহে, গ্রীষ্ম অতি গরম নহে। গ্রেট ব্রিটেনের চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, তাহা হইতে প্রচুর বাষ্প ইহার উপর আসিয়া থাকে, এবং তাহা ইহার আকাশকে পর্দার মত ঢাকিয়া রাখিয়া জমির উত্তাপকে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় না। এবং সেই সঙ্গে সূর্যকেও তাহার পূর্ণ উত্তাপ জমিতে পৌঁছাইতে দেয় না। এই সব বাষ্প প্রায়ই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির আকারে মাটিতে পড়িতে থাকে। নদী এই কারণে পূর্ণ থাকে এবং মাঠ সুন্দর সবুজে ভরিয়া তোলে।

গোরু ভেড়ার প্রচুর খাদ্য মেলে এখানে। আমি একবার এক ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "যদি কখনও নৌযুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের পরাজয় ঘটে এবং শত্রু দ্বীপটিকে চারিদিক্ হইতে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, বাইরের কিছু এখানে প্রবেশ করিতে না দেয়—এবং যদি তাহা অন্তত মাস দুই কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে ইংরেজরা কি করিবে? খাদ্যাভাবে তোমাদের দারুণ কষ্ট হইবে না?" ইংরেজটি খুব গর্বের সঙ্গে জবাব দিল, "আমরা যতদিন ভাল বীফ ও মাটন উৎপাদন করিতে পারিব, ততদিন আমাদিগকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না।" গুঁড়া বৃষ্টির ফলে বাতাসে আর্দ্রতা বেশি থাকে কিন্তু জমি ভিজা থাকে না। জমির পরিমাণ কম, সে জন্য বাড়ির নিচের তলাটা জমির নিচে তৈয়ার করে। মাটির নিচের এই তলায় রান্নাঘর করে, এবং জমি শুষ্ক থাকে বলিয়া কোনও অসুবিধা হয় না। অনেক গরিব লোক এই রকম মাটির নিচের ঘরেই বাস করে। সাধারণ গুঁড়ি বৃষ্টির বদলে যদি ধারা বর্ষণ হয়, তৎক্ষণাৎ সেখানকার সংবাদপত্র এমন ঘটনাকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ধারাবর্ষণ বলিয়া বর্ণনা করিবে। বলিবে, "rain fell in tropical torrents" ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য—উহার যখন তখন বদল ঘটিতেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বহু রকম ঋতু-পরিবর্তন ঘটিবে। এখন হয়ত দারুণ শীত, উত্তর দিক্ হইতে হাড় কাঁপান বায়ু

বহিতেছে, পরক্ষণেই বৃষ্টি হইতেছে, আবার রোদ উঠিতেছে, সহৃদয়তার উষ্ণতা সঞ্চার করিতেছে। আমরা ভারতীয়রা অনেক সময় হাঁফাইয়া উঠি। ইংল্যাণ্ডে বাস করিয়া ইংরেজদের ধাতে এই সব আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা সহিয়া গিয়াছে, এবং ইহারই জন্য তাহারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া পড়িতে পারে, উপনিবেশ গড়িতে পারে। সম্প্রতি একদিন লর্ড নর্থব্রুক অনুগ্রহপূর্বক “পীপ্‌ল্‌স ট্রিবিউন” নামে খ্যাত মিস্টার জন্ ব্রাইটের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। সে সময়ে তাঁহার একটি কন্যা তাঁহার সঙ্গে ছিল। অন্য কিছুক্ষণ আলাপ করিয়া আমি লর্ড নর্থব্রুককে তাঁহার নিকটে রাখিয়া নিকটস্থ আর একটি ভদ্রলোকের কাছে গেলাম। আমি তাঁহাকে গিয়া বলিলাম, ভারতের শিক্ষিত সমাজ জন্ ব্রাইটকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। ভদ্রলোক আমার অভিমত শুনিয়া তাহা জন্ ব্রাইটকে বলিতে বলিলেন। ব্রাইটের কন্যার দিকে ফিবিয়া চাপাসুরে বললাম, “আমরা শান্তিপ্রিয়, আমরা যুদ্ধকে পাপ বলিয়া গণ্য করি, প্রত্যেকটি জীবিত প্রাণীকে আত্মীয় জ্ঞান করি—অতএব এটি সহজেই বুঝা উচিত যে, আমরা তোমার পিতাকে গভীর শ্রদ্ধা না করিয়া পারি না। ভারতবাসীরা সত্যই মিস্টার ব্রাইটকে ভালবাসে।” পরে আমি স্বয়ং ব্রাইটকেই বলিলাম, তিনি মানবতার কল্যাণে এ পর্যন্ত যে-সব মহৎ কাজ করিয়াছেন তাহাব জন্য তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। আরও বলিলাম, “এবং আশা করি ভারতবাসীর জন্য এ যাবৎ যাহা করিয়াছেন, ভবিষ্যতেও তাহা কবিতে থাকিবেন।” ব্রাইট বলিলেন, “আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িতেছি, এবং শীঘ্রই কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিব, কিন্তু সব সময়েই আমি ভারতের প্রতি মনোযোগী থাকিব, এবং ব্রিটিশ শাসনে ভারতের উন্নতি হইতেছে শুনিলে আমি সব সময়েই আনন্দ লাভ করিব।”

আরও একজন ভারত বন্ধুর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম, তাঁহার নাম মিস্ ম্যানিং। এই উদারপ্রাণ মহিলা ভারতবাসীদিগকে তাঁহার পোষ্য সন্তান বলিয়া অনুভব করেন। আমাদের মঙ্গলের জন্য তিনি অবিরাম কাজ করিয়া যাইতেছেন। ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তিনি প্রাণ স্বরূপ। তাঁহার গৃহে যে সব সান্ধ্যকালীন আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, তাহাতে ভারতীয়গণ ইংরেজদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পায়, এই সুযোগ তাহারা অন্য উপায়ে লাভ করিতে পারিত না। তিনি যে মহৎ কাজ করিতেছেন, তাহার সঙ্গে যুক্ত তাঁহার সহায়ক হইব, এমন ইচ্ছা আমার কাজের দায়ে দমন করিতে হইয়াছিল। আমি শুনিয়াছি, আমার কোনও কোনও দেশবাসী অল্প সম্বল লইয়া ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হইয়াছে এবং তাঁহার উদারতার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা নিতান্তই লজ্জার কথা।

আমাদের দেশের দায়িত্বহীন যুবকদের কি করিয়া বুঝাইব যে, এরূপ সম্বলহীন অবস্থায় ইংল্যাণ্ডে যাওয়া বড়ই অন্যায়। ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষ নহে। আমাদের দেশে এরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় যে কোনও স্থানে গিয়া আশ্রয় ও অন্নবস্ত্র পাওয়া সম্ভব, এমন কি বিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থাও লাভ করা যায় সচ্ছল অবস্থার লোকের নিকট হইতে। আতিথেয়তা ও অর্থদান প্রশংসাযোগ্য, এবং আমার দেশবাসীগণ—হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের

লোকেরাই বহু কাল অবধি এই সব গৌরবজনক গুণের জন্য খ্যাত। কিন্তু আতিথেয়তা ও দানের অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করা প্রশংসাযোগ্য নহে।

এইরূপ আচরণ আমাদের দেশে আত্মসম্মানবোধ এবং মনুষ্যত্বের গৌরব নষ্ট করিয়াছে, এমন কি অপেক্ষাকৃত সচ্ছল শ্রেণীর মধ্যেও এই রূপ অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে ভিক্ষুক, নিষ্কর্মা এবং অপদার্থ শ্রেণী প্রতিষ্ঠা করা খুব একটা কৃতিত্বের কাজ, স্বর্গে যাইবার বাঁধা পথ। ভিক্ষাবৃত্তিকে আমাদের দেশের একটি পবিত্র বৃত্তি গণ্য করা হয়, কারণ অনেক ধর্মাচারী এদেশে ভিক্ষাকে জীবিকার উপায় রূপে গ্রহণ করিয়াছে। আর কিছুই না, কেবল কাজকর্ম ছাড়িয়া নিষ্কর্মা হইয়া অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকা, তাহা হইলে স্বর্গের সকল দেবদূত—নারী পুরুষ—সবাই দিনরাত কোদাল কুড়ুল হাতে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া তোমার জন্য স্বর্গের পথ প্রস্তুত করিয়া দিবেন। এইভাবে যিনি ধর্ম প্রচার করেন এবং যিনি তাহা গ্রহণ করেন উভয়েরই মনে এমন একটি বোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে, যাহা ভিক্ষার সঙ্গে যে হীনতা এবং স্বার্থপরতা অচ্ছেদ্য ভাবে জড়াইয়া থাকে, সেই সচেতনতাকে নষ্ট করিয়া দেয়।

আরও এক মহিলার সঙ্গে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ আমার হইয়াছে—তিনি বিশ্ববিখ্যাত মিস্‌ ফ্লোরেন্‌স্‌ নাইটিংগেল। সার এডওয়ার্ড বাক্‌ তাঁহার সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়া দেন। ভারতের প্রতি তাঁহারও সহানুভূতি গভীর। জাতীয় সমস্যার সমাধান চিন্তা করিতে পারেন এমন গুণসম্পন্না নারী আমাদের দেশে কখন দেখা দিবেন? নারীর শক্তিকে ভোঁতা হইবার সুযোগ করিয়া দিয়া আমরা যে সামাজিক বিবর্তনের ধারা ব্যাহত করিতেছি, এ কথা কি কেহ কখনও চিন্তা করিয়া থাকেন? পিতা ও মাতা উভয়ের পরিপুষ্ট শক্তি যদি সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, তাহা হইলে কি সত্য নহে যে, বর্তমানে ভারত-সন্তানগণ অর্ধেক শক্তিমাত্র লাভ করিতেছে? প্রকৃতপক্ষে ঘরে বন্ধ রহিয়া এবং পঙ্গু রহিয়াও মিস্‌ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল মানব-কল্যাণচিন্তাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। পৃথিবীর কোথায় স্বাস্থ্য-বিষয়ক ব্যবস্থা কেমন তাহার সমস্ত তথ্য তাঁহার নখদর্পণে। এবং পার্ক লেনের ছোট্ট ঘরখানিতে বাস করিয়া তিনি তাঁহার নৈতিক প্রভাব এমনভাবে বিস্তার করিতেছেন যাহার কাছে দেশের শাসকগণ নত-মস্তক। তথ্য জানিবার ব্যাকুলতা আমি অন্য কোনও নারীর মধ্যে এমন দেখি নাই। তাঁহার প্রশ্নগুলি সর্বদাই খুব বাছাই করা এবং যথাযথ বিষয়ে। ইহাতে তাঁহার চিন্তার যে গভীরতা প্রকাশিত এমন দেখায় আমরা অভ্যস্ত নহি। ইহা আমার কাছে একটি বিস্ময় বলিয়া বোধ হইয়াছে। ভারত ও ভারতবাসীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার সমস্ত জানা আছে বলিয়া আমার বোধ হইল। ভারতের দ্রুত উন্নতির পথে কি কি বাধা রহিয়াছে, তাহাও তাঁহার জানা। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল অনেকেই ভারতেও আছেন ইংল্যাণ্ডেও আছেন। কিন্তু আমরা যদি উন্নততর জীবনাদর্শে উঠিতে না চাহি, তবে তাঁহারা কি করিতে পারেন?

আরও একজন ভাবতমিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ইঁহার নাম মিস্টার পিয়ের ডাফ, ইনি আমাদের পরিচিত বিখ্যাত ডক্টর ডাফের পুত্র। একদিন তিনি লণ্ডনের নিকটস্থ ডেনমার্ক হিলে অবস্থিত তাঁহার বাড়িতে আমাদিগকে লইয়া গেলেন। আমাদের উপভোগ্য অনেক কিছুরই আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন। মিস্টার ডাফ আমার কাছে বলিলেন, লণ্ডনে ইংরেজদেব 'হোম ফর এশিয়াটিক্‌স্‌' নামক প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু ভারতীয় রাজামহারাজারা ইংল্যাণ্ডে গিয়া এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কোনওরূপ আগ্রহ দেখান না, ইহার প্রতি তাঁহাদের কোনও আকর্ষণ নাই। ডেনমার্ক হিলে আমি মিস্টার স্মিথকে প্রথম দেখিলাম। ইনি এখন আর জীবিত নাই। তাঁহার মৃত্যুতে আরও একজন বন্ধুকে হারাইলাম। ভারতেব কল্যাণ বিষয়ে আগ্রহশীল যত নরনারীকে আমি সেখানে দেখিয়াছি তাঁহাদের মাত্র কয়েকজনের সম্পর্কেই আমি আলোচনা করিলাম। অন্যদের নাম আমাদের দেশে অপবিচিত বলিয়া তাঁহাদের সম্পর্কে আর কিছু বলিলাম না।

১০

প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নাগরিকতাগুণে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, ব্রিটেনের লোকেরা যেন প্রদর্শনীতে আগত বিবিধ উপনিবেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেন,যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের দেশের একটি স্নেহপূর্ণ স্মৃতি বহন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন। এই প্রস্তাবটি প্রাজ্ঞজনোচিত এবং সহানুভূতিজাত। কিন্তু ইহার নিজস্ব মূল্য যাহাই হউক, যে স্থান হইতে প্রস্তাবটি আসিল তাহার জন্যই বিশেষ করিয়া সকলে ইহাকে সহর্ষ অভ্যর্থনা জানাইল, কারণ প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্‌—আমাদের ভাবী সম্রাট—ইংল্যাণ্ডের সকল শ্রেণীর লোকেরই খুব প্রিয়। তিনি খুব উদার এবং সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট। তাঁহাকে সবাই মনে মনে পূজা করে। আমাদের কাছে ইংল্যাণ্ডের সকল দিক হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিতে লাগিল। সকল শ্রেণীর নিকট হইতে। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়ার নিকট হইতেও আসিল। নিমন্ত্রণের সংখ্যা এত হইল যে ইহার জন্য একটি স্বতন্ত্র রিসেপশন কমিটি গঠন করিতে হইল। পরে জানিতে পারিলাম এই নিমন্ত্রণের জন্য নিমন্ত্রিতদের মধ্যেও কিছু কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। ইহা ঘটিয়াছিল ব্রিটিশ-জাত ঔপনিবেশিক লোকদের মধ্যে, এবং যাহাদের সঙ্গে কোনও না কোনওভাবে প্রদর্শনী অথবা উপনিবেশের লেশমাত্র সংশ্রব আছে তাহাদের মধ্যে। আমাদের অপেক্ষা ইহারা এই নিমন্ত্রণের মূল্য বেশি বুঝিতে পারিয়াছিল। পিলিউ দ্বীপপুঞ্জের প্রিন্স ল'বুর মত আমরা বিস্মিত হইয়া ভাবিতেছিলাম, এই সামান্য ব্যাপার লইয়া এত উত্তেজনা কেন। ক্রমশঃ আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল।

দেখিলাম আমাদের দেশের অপেক্ষা ইংল্যাণ্ডের লোকদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোর। আসলে ইহা শ্রেণীভেদ।

ইংরেজ জাতিকে মূলতঃ দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। উচ্চ শ্রেণীতে জনসংখ্যা দশ হাজার, এবং এই দশ হাজার ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত শ্রেণীকে বলা হয় "সোসাইটি", ইহাদের নিম্নস্থ আর সবাই, যাহারা সোসাইটিভুক্ত নহে, অথবা অন্য কথায় যাহারা জেনটলম্যান নহে, তাহারা নিম্ন শ্রেণীর। কিন্তু এই মূল বিভাগের মধ্যবর্তী অনেকগুলি স্তর আছে, এবং ইহাদের মধ্যে যাহারা একটু উচ্চ পর্যায়ের তাহারা তাহাদের নিম্ন পর্যায়ের লোকদের ঘৃণার চোখে দেখে। এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা চেষ্টা করিতেছে তাহাদের অব্যবহিত উপরের শ্রেণীতে স্থান পাইতে। এ বিষয়ে কিছু যোগ্যতা লাভ করিবামাত্র সে সোসাইটিভুক্ত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে। অর্থাৎ তাহারা ঐ সর্বোচ্চ দশ হাজারের মধ্যে নিমন্ত্রিত অতিথি হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে। যদি নেহাৎ দীন হীন হয় তবে সে তাহারা ঠিক উপরের স্তরে উঠিতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্য মনে মনে পোষণ করে বলিয়া ইহারা কেহই নিজেদের উপার্জনের পরিমাণ কাহাকেও জানায় না, এবং সে যাহা

নহে, তাহাই দেখাইতে সব সময় চেষ্টা করে। অনেক দোকানদার ও দরিদ্র ব্যক্তি রাজনৈতিক মতবাদে রক্ষণশীল, উদ্দেশ্য এই যে, কেহ তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে ভাবিবে ইহারা সম্মাননীয় এবং ধনী লোক। কারণ অভিজাত শ্রেণী সকলেই রক্ষণশীল ও ধনী, এবং ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অপরিচ্ছন্ন লোকেরা উদার এবং সংস্কারপন্থী।

ইংরেজদের এই জাতিভেদ এই ভাবে প্রকাশ করা যায় (১) রাজপরিবার ও প্রাচীন উচ্চ অভিজাতদের সমাজভুক্ত ব্যক্তিগণ, (২) প্রাচীন অভিজাতদের নিম্ন শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ, (৩) অভিজাতবর্গের উপাধিহীন আত্মনির্ভর আত্মীয় স্বজন, এবং যাহারা অধুনা উপাধি লাভ করিয়াছে এবং ধনী বণিকগণ, যাহারা অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে, (৪) অভিজাত শ্রেণীর নিকট-আত্মীয়গণ যাহাদের নিজস্ব কোনও উপার্জন নাই, এবং যাহারা উত্তরাধিকার লাভ করিবার আশা রাখে অথবা যাহারা লাভজনক বিবাহের অপেক্ষা করিতেছে। ইহারাই সর্বোচ্চ দশ হাজারের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। যে সব ব্যক্তি রাজপরিবারে জন্মায় নাই, যাহারা রেস-কোর্সে, থিয়েটারে, চিত্রশিল্পে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, অথবা সরকারি চাকরিতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে, তাহাদিগকে ইহারা প্রশংসা দ্বারা, পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা আপ্যায়ন করিয়া থাকে। সোসাইটি বহির্ভূত লোকেরা অগণিত জাতিতে বিভক্ত, প্রধানতঃ অর্থের পরিমাণ বিচারে। জন্মসূত্রেও কিছু পরিমাণ বিচার হইয়া থাকে। হিন্দুদের মতই ইংরেজরা নিম্ন জাতির সঙ্গে একত্র পানাহার করে না, বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয় না। এবং আমাদের পবিত্র ব্রাহ্মণরা যেমন করে, তেমনি নিষ্ঠাবান্ অভিজাত ইংরেজরাও কোনও উপলক্ষে নিম্ন শ্রেণীর ইংরেজের সংস্পর্শে আসিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। অপবিত্রত দূর করিবার জন্য অনেক সময় তাহারা সুগন্ধ মিশ্রিত জলেও স্নান করে। একবার এক ভদ্র লোককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। ত্রিবাঙ্কুরের ব্রাহ্মণ যে কারণে একজন অস্পৃশ্য পুলিয়াকে ছোঁয় না, তিনিও সেই একই কারণের কথা উল্লেখ করিলেন। পানাহার বিষয়ে অবশ্য উহাদের আমাদের মত ছুঁৎমার্গ নাই, কারণ ও দেশে ধর্ম এ রকম বিধান দেয় নাই। হোটেলে ইংরেজ ব্রাহ্মণ ইংরেজ ব্রাহ্মণেতরের সঙ্গে খাইতে পারে, জাহাজে অথবা অন্যত্র পারে—মোট কথা যেখানে না পারিয়া উপায় নাই। তবু এ সব স্থলেও সে যথাসম্ভব দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলে। যাত্রী জাহাজে সে অল্পকালের মধ্যেই নিজেদের দলের লোক খুঁজিয়া লয় এবং তাহারা পৃথক দল গঠন করে। নিম্ন শ্রেণীর ইংরেজের সঙ্গে এরূপ ক্ষেত্রে মিশিলে ব্রাহ্মণ জাতিভ্রষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহাদের দলে খুব স্বাধীনভাবে মেশে না। মিশিলে তাহার স্তরের লোকেরা তাহাকে নিচু নজরে দেখিবে। দাতব্য উদ্দেশ্যে উচ্চস্তরের মহিলা অথবা ধর্মজীবীদের নিঃসম্বল লোকদের বাড়িতে যাওয়া অবশ্য নিষিদ্ধ নহে।

আন্তঃশ্রেণিক বিবাহ অচিন্তনীয়, কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। যদি কোনও নূতন ধনী হওয়া বণিক সোসাইটিতে উত্তীর্ণ হইতে চাহে এবং কোন দরিদ্র ইংরেজ ব্রাহ্মণ বিবাহসূত্রে অর্থ লাভ করিতে চাহে, তাহা হইলে আন্তঃশ্রেণিক বিবাহ ঘটিয়া থাকে। কন্যা ও তাহার

আত্মীয়গণ তখন সোসাইটিতে গৃহীত হয়, যদিও সম্পূর্ণ বিনা আপত্তিতে নহে। অবশ্য পরবর্তী বংশের লোকেরা স্বতঃই সোসাইটি-ভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর মেয়েকে বিবাহ করিলে, অথচ তাহার টাকা নাই, এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহিতের বড়ই দুর্ভাগ্য। তাহার ঘাড়ে জাতিচ্যুতির খড়্গটি নামিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। আমাদের দেশে ধর্মীয় প্রতিকূলতা আছে খাওয়া ও বিবাহের ক্ষেত্রে, কিন্তু ভ্রাতৃত্ব বোধে নাই। এ ক্ষেত্রে উচ্চ নীচ ভেদ নাই। ইংল্যাণ্ডে সেরূপ নহে। সেখানে দুই জাতির মধ্যে ভালবাসাও নাই, ঘৃণাও নাই। উচ্চ সেখানে নীচকে সোজাসুজি অগ্রাহ্য করিয়া চলে। সে তাহার কথা চিন্তাও করে না, তাহার অস্তিত্বকে স্বীকারও করে না, শুধু ভোট ভিক্ষার সময় তাহাকে স্মরণ করিতে হয়। যাহাদের পূর্বপুরুষ উইলিয়াম দি কংকারার-এর সঙ্গে ব্রিটেনে আসিয়াছিল, এবং সে সময় সেখানকার জমির পূর্ব মালিকের নিকট হইতে জমির স্বত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহারাই ইংরেজ সোসাইটিতে প্রথম শ্রেণীর লোক। পরে যে সব লোক নানা দিক হইতে বড় হইয়াছে, তাহারাও ক্রমে সোসাইটিভুক্ত হইয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। শিক্ষার প্রসার, সমস্ত শ্রেণীর লোকদের ভিতর অর্থ ছড়াইয়া পড়া, উদার আইনের দরুণ সকলের পক্ষে অধিক ধনলাভ সহজ হওয়ায় অভিজাতদের ক্ষমতা ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে, এবং তাহাদের স্বাতন্ত্র্যও ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

তদুপরি নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে সম্প্রতি অভিজাতদের রক্তের মিশ্রণ পুনঃ পুনঃ ঘটাতে এমন হইয়াছে যে, সাধারণ শ্রেণীর মানুষ এখন লর্ড সভার সভ্য হওয়ার ব্যাপারটা খুব সম্মানজনক কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করিতেছে। পুরাতন জাতিভেদ প্রথা ভারতেও যেমন ইংল্যাণ্ডেও তেমনি ভাঙিয়া পড়িতেছে—কারণ উভয়ত্রই এক, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার। অবশ্য দুটি দেশেই উচ্চ জাতিকে সম্মান করার রীতিটি এখনও প্রবল আছে। অতএব প্রাসাদ হইতে যে নিমন্ত্রণ আসিল তাহাতে ঔপনিবেশিকগণ ও ভারতীয়গণ রাজপরিবারের এই অবনমনে তাঁহাদের আতিথেয়তা লাভে ব্যগ্র হইয়াছিল স্বভাবতঃই। আমরা অন্ততঃ এই আতিথেয়তা না পাইলে ইংরেজ জীবনের সঙ্গে এতটা পরিচিত হইতে পারিতাম না।

১৮৮৬ সনের জুলাইয়ের প্রথম দিকে আমাদিগকে উইণ্ডসর কাস্‌লে লাঞ্চের নিমন্ত্রণ হইল। পত্রটি এই ভাবে লিখিত ছিল —

"The Lord Steward has received Her Majesty's command to invite—' to luncheon at Windsor Castle on Monday, the 5th of July at 2 o'clock "

কার্ডের বিপরীত দিকে কি পোষাকে আসিতে হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়া ছিল। যথা,, মহিলাগণ মর্নিং ড্রেস পরিবেন, ভদ্রমহোদয়গণ ঈভনিং কোট, মর্নিং ট্রাউজার্স, তৎসহ শ্রেণী-পরিচায়ক চিহ্ন ও সম্মান-চিহ্নাদি। আরও ছিল "the Court will be in mourning" (রাজপরিবার ও পদস্থ কর্মীগণের শোকচিহ্ন ধারণ করা থাকিবে।)

৫ই জুলাই সকাল দুইটা ত্রিশ মিনিটের সময় উষার আলো ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আরও পরে পূর্বাকাশে সোনার রং দেখা দিল। সুপ্ত লণ্ডন শহরের উচ্চ চিমনিগুলি প্রথম রং গ্রহণ করিল। জানালা দরজা বন্ধ, রাজপথ জনশূন্য, শুধু জাগ্রত পুলিসের লোক বীটে ফিরিতেছে, কিংবা কোনও গৃহহীন কাহারও দরজার ধাপ হইতে জাগিয়া হাই তুলিতেছে ও হাত টান করিয়া আড়মোড়া ভাঙিতেছে। ক্রমে সেই স্বর্ণাভা সর্বত্র নিজেকে বিস্তার করিয়া সমস্ত অন্ধকার দূর করিল। শুধু পাখীর ডাক শোনা যাইতেছে, লণ্ডন তখনও সুপ্ত। লণ্ডনে তখনও রাত্রি। সাড়ে চারিটা বাজিল। ক্রমে পথে বুটের আওয়াজ শোনা যাইতে লাগিল, একটি দুইটি করিয়া পরে রাজপথে পদশব্দে মুখরিত হইল। মধুর সন্ধানে এই সব মৌমাছিদের যাইতে হইবে ত। ফুলের পাপড়ি খুলিয়াছে, হাওয়ায় সুগন্ধ, অতএব কাজ আরম্ভ কর।

মধু মক্ষিকার সঙ্গে তুলনা (যদি আদৌ তুলনা চলে) ওদেশে করিয়া থাকে, ওদেশের পক্ষে যোগ্য তুলনা সন্দেহ নাই। সব ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে সময়ের একটি মুহূর্ত উহারা বাজে নষ্ট করে না। প্রয়োজনের চাপে বিশ্রামেরও অনেকখানি অংশ উহাদের কাজের হাতে সমর্পণ করিতে হয়। ওখানকার প্রত্যেকটি নরনারী মক্ষিকার মতই কর্মব্যস্ত। কয়েকটি ড্রোন (অলস পুরুষমক্ষিকা, অন্যের শ্রমের ফলভোগী) কর্মহীন, অলস প্রকৃতির লোকদের ক্ষতি অন্যদের পরিশ্রমের ফলে পূরণ হইয়া যায়। কিছু সংখ্যক লেডি ও জেনটলম্যান ব্যতীত প্রত্যেকই কাজ করে, এবং কাজ করে সাধারণতঃ সকাল ৮টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত এবং আমরা যেভাবে কাজ করি তাহা হইতে ইহা পৃথক। এখানে আমরা ধীরে সুস্থে মন্থর গতিতে কাজ করি, উহারা ওদেশে সময়ের পিঠে চাবুক মারিয়া চালায়। সেখানে বহুলক্ষ যন্ত্রের হাতের সঙ্গে চারি কোটি মানুষের হাত যুক্ত হইয়া জমি চাষ করে, হাতুড়ি চালায়, শেলাই করে, বয়নের কাজ করে—দিনে রাত্রে অবিরাম। যাহা উৎপন্ন হয় তাহা যে জমিটুকুর উপর ঘনীভূত করা হইয়াছে, সেই জমিটুকুর নাম দেওয়া হইয়াছে ব্রিটেন। আর আমাদের দেশে, আবহাওয়া এবং দৈহিক সামর্থ্যগত অসুবিধার কথা ধরিলেও শুধু কি করিয়া শ্রমকে লাভবান করা যায় সে জ্ঞানের অভাব এবং বয়স্কদের কর্মবিমুখতায় খুব কমিয়া হিসাব করিলেও প্রতিদিন ১৬ কোটি শ্রম-ঘণ্টা নষ্ট হয়। ঘণ্টায় এক পয়সার শ্রম নষ্ট হইলেও প্রতিদিন পঁচিশ লাখ টাকা আয় কম হইতেছে। অন্যকথায় এই অলস হাতগুলিকে যদি কর্মতৎপর হইতে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা আশি দিনের কাজে ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের মত একটি রেলপথ গড়িয়া তুলিতে পারে। স্বর্গমর্ত্যের ভাগ্যগণনাকারী ভবিষ্যদ্বক্তারা এখন কোথায় গিয়াছেন? বর্তমানে তাঁহাদের কেহ কি আমাদের ভিতর আবির্ভূত হইয়া সভ্য মানুষের মত জীবন কাটাইবার উপায় বলিয়া দিতে পারেন না? আমাদের কি শিখাইতে পারেন না যে, অলসতা পাপ, এবং কাজ করা পুণ্য এবং ইহাই পার্থিব বহু দুঃখ ভুলাইয়া দিতে পারে এবং স্বর্গে যাইবার অনুমতি-পত্র দিতে পারে? অথবা বিত্তহীন লোকদের নিকট হইতে অর্থ উপায়ের নূতন নূতন বুদ্ধি না খাটাইয়া

ইহাদের নিকট তাহার বিনিময়ে শ্রম লইলে ত হয়? এই শ্রম ত তাহারা অব্যবহারে নষ্ট করে। ইহা দ্বারা সড়ক, রেলপথ, কূপ, পুষ্করিণী খাল করাইয়া লওয়া যায়। এমন সমাজে, যেখানে জনসাধারণ ঠিক পথে চিন্তা করিতে জানে না, সেখানে পিটার দি গ্রেটের মত একজন শাসক দরকার, যাঁহার হুকুম আইনের কাজ করিবে এবং যাহাতে পার্লামেন্টের নিকট হইতে কোনও বাধা আসিবে না, খবরের কাগজের অর্থহীন চিৎকার থাকিবে না। তাহা হইলে নিয়মতান্ত্রিক সরকার যাহা করিতে একশত বৎসর লাগায় তাহা করিতে দশ বৎসর লাগিবে। জাপানের কথা ভাবিয়া দেখুন না?

একটি এঞ্জিন ভূগর্ভস্থ রেলস্টেশনের শেড হইতে খুব যেন অনিচ্ছার সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল এবং শানটিং করিয়া শ্রমিকদের জন্য গাড়ি জুড়িয়া ফেলিল। প্ল্যাটফরমের উপব বুকস্টলের লোকেরা আসিয়া হাজির হইল, শ্রমিকেরা পেনি খরচ করিয়া সকালের সংবাদপত্র কিনিতে লাগিল। বাহিরে চাকায় ঠেলা কফি-স্টল আসিল। তাহাতে পাশাপাশি দুইটি বড় পাত্রে জল ফুটিতেছে। একটি কাঠের বোর্ডে শস্তা দামের অনেক কাপ ও সসারের ঠুন ঠুন শব্দ হইতেছে। ব্যস্ত-সমস্ত লোকেরা স্টল ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কফি গিলিতে লাগিল, এবং শেষ হইলে একটি করিয়া পেনি রাখিয়া যে যাহার মত চলিয়া গেল। ছেলেরা খবরের কাগজ হাঁকিয়া যাইতেছে পথে পথে, দুধওয়ালা কড়া সুরে চিৎকার করিতেছে, ভৃত্যেরা দরজা পরিষ্কার করিতেছে, পিতলের কবজাগুলি ঘষিয়া ঝকঝকে করিতেছে, ধাপগুলি সাবান জলে ধুইয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিতেছে। দোকানীরা দোকান খুলিয়া ধূলা ঝাড়িয়া বিক্রেয় দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিতেছে। সাতটার মধ্যে শ্রমিক লণ্ডন জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু ভদ্র শ্রেণীর লোকেরা গত রাত্রির ডিনার এবং বলনাচের ক্লান্তিবশত এখনও ঘুমাইয়া আছে। তাহারা দশটাব আগে বড় একটা বিছানা ছাড়ে না। ঔপনিবেশিক আগন্তুকেরাও নিমন্ত্রণে যোগ দিয়া ক্লান্ত, তাহারাও শুইয়া আছে।

সম্রাজ্ঞী কর্তৃক ব্যবস্থিত স্পেশাল ট্রেন আমাদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই ট্রেন প্যাডিংটন স্টেশন হইতে অপরাহ্ণ একটার সময় যাত্রা করিল। উইণ্ডসরে রাজকীয় বাহন প্রস্তুত ছিল, আমাদিগকে লইয়া সেগুলি ক্যাসল-এর দিকে রওনা হইল। সার বার্ডউভ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয়তাবশতঃ ইণ্ডিয়া অফিসের মাধ্যমে আমাদিগকে মিস্টার ফিটজেরালড্ নামক এক পলিটিক্যাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখিলেন। ইনি সার সেমুর ফিটজেরালডের ভাই। আমাদের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। উইণ্ডসরের পথগুলিতে নানাদেশের অতিথিদিগকে দেখিবার জন্য লোকের ভিড় হইয়াছিল খুব, কিন্তু তাহারা সুসংযত ছিল। ক্যাসলের দিকে যত অগ্রসর হইতেছি, ততই একের পর এক হর্ষধ্বনিতে আমাদিগকে অভ্যর্থনা জানান হইতেছে। আমরা ভারতীয়রা সর্বাপেক্ষা অধিক হর্ষধ্বনি লাভ করিয়াছিলাম। প্রদর্শনীর সংশ্রবের বাইরে যাঁহারা রাজনিমন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা—নরসিংগড়ের রাজা, গণডালের ঠাকুর সাহিব, গাইকোয়াড়রাজের ভ্রাতা সম্পত রাও এবং সুরাট অঞ্চলের এক মুসলমান নরপতি। আমাদের গাড়ী হাই স্ট্রীট

হইয়া, সপ্তম হেনরি গেট দিয়া স্টেট অ্যাপার্টমেণ্টে উপস্থিত হইল, অভ্যাগতগণকে "জন্মদিন বহি" বা বার্থ ডে বুক-এ স্বাক্ষর করিতে বলা হইল। বইখানি সুন্দর ভাবে বাঁধাই করা, প্রতি পৃষ্ঠায় তারিখ ছাপা। প্রত্যেকে যিনি যে তারিখে জন্মিয়াছেন সেই তারিখের পাতায় নাম স্বাক্ষর করিলেন। স্বাক্ষর গ্রহণের 'হবি' হইতেই ইহার জন্ম, এবং এ রকম বই অনেক গৃহেই আছে জানি, কারণ অনেকের বাড়িতেই এ-রকম স্বাক্ষর করিতে হইয়াছে। এবং শুধু ইংরেজীতে নহে, স্বদেশী ভাষাতেও করিতে হইয়াছে। ইহার পব লোভনীয সব খাদ্য পরিবেশন করা হইল। লান্‌চের পরে পরিচয়, অভ্যর্থনা ইত্যাদির পালা আরম্ভ হইল। প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ সবাইকে একে একে সম্রাজ্ঞীর কাছে পরিচয় করাইযা দিলেন। প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ দণ্ডায়মানা সম্রাজ্ঞীর দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইলেন, প্রিনসেস অভ ওয়েল্‌স্ বাম দিকে দাঁড়াইলেন, পরিবারের অন্যান্য সকলে পিছন দিকে দাঁড়াইলেন। ঘোযক এক-একটি নাম উচ্চারণ করে, সে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়ায়। যুবরাজ তখন ঐ অতিথির পরিচয় সম্রাজ্ঞীকে শুনাইয়া দেন। তৎক্ষণাৎ অতিথি মাথা নত করিয়া অভিবাদন জানায়। এবং ইহার পরেই রীতি অনুযায়ী সেখান হইতে সরিয়া যায়, তখন সেখানে আর একজন আসিয়া দাঁড়ায। ভারতীয়দের প্রতি সম্রাজ্ঞীর সদয়ভাব লক্ষ্য করিলাম। ইহার পরে অন্য সময়েও ইহা লক্ষ্য কবিয়াছি। অনুষ্ঠান শেষ হইলে আমরা ক্যাসল-এর সমস্ত অংশ দেখিবার সুযোগ পাইলাম। সেদিন তথাকাব সমস্ত কক্ষ আমাদের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়েছিল।

স্টেট অ্যাপার্টমেন্টগুলি সম্রাজ্ঞী উইণ্ডসর ক্যাসল-এ না থাকিলে সপ্তাহে চারিদিন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে তিনি স্কটল্যাণ্ডের ব্যালমোরাল ক্যাসল অথবা (ওয়াইট দ্বীপের) অস্‌বোর্ন হাউসে বাস করেন। উইণ্ডসব ক্যাসল-এর অ্যাপার্টমেন্টগুলিতে কক্ষ আছে দশটি। ইহাদের নাম কুইনস অডিয়েন্স চেম্বার, কুইনস চেম্বার, সেন্ট জর্জেস হল, গ্র্যাণ্ড রিসেপশন রুম, ওয়াটারলু চেম্বার. গ্র্যাণ্ড ভেস্টিবিউল, স্টেট অ্যান্টি রুম, জাকুরেলি রুম, এবং ভ্যানডাইক রুম। কক্ষগুলির সিলিং-এ শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা কাহিনী-চিত্র, প্রাচীরসমূহে মূল্যবান পর্দা ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চিত্র রহিয়াছে। অডিয়েন্স চেম্বারের সিলিং-এ ক্যাথারিন অভ ব্রাগানজা, দ্বিতীয় চার্লস-এর রাণী (ব্রিটানিয়া রূপে চিত্রিত), তিনি একটি শকটে বসিয়া আছেন, রাজহাঁসেরা সেটিকে ভার্চুর মন্দিরের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সঙ্গে চলিতেছেন প্রাচীন দেবতাগণ—সিরিস, ফ্লোরা, পোমোনা ইত্যাদি। প্রাচীরে তিনটি গোবেলিন (বা গোবর্ল্যাঁ) পরদা, তাহাতে ওলড টেস্টামেণ্ট বর্ণিত এসথারের ইতিহাস চিত্রিত রহিয়াছে। দরজার উপরে মেরি, কুইন অভ স্কটস-এর পূর্ণাবয়ব চিত্র টাঙানো আছে, চিত্রের পটভূমিতে মেরির হত্যা দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। ঐই হত্যা দৃশ্যের নিচে যে ল্যাটিন লিখনটি আছে তাহার অর্থ—"রাজ্ঞী—যিনি নৃপতিদের কন্যা, সহধর্মিণী এবং মাতা, তাঁহাকে জল্লাদের কুঠারাঘাতে হত্যা করা হইয়াছে। প্রথম দুটি আঘাতে তাঁহাকে নিষ্ঠুর ভাবে আহত করা হয়, তৃতীয় আঘাতে তাঁহার শির দেহ

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই হত্যা দৃশ্যে কুইন এলিজাবেথের কমিশনার ও অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।" চিত্রের উপরের কোণে আরও একটি লিখনে বলা হইয়াছে —"মেরি, কুইন অভ স্কটল্যাণ্ড— ন্যায়তঃ ইংল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী, গ্রেট ব্রিটেনের নৃপতি জেমস্-এর মাতা, নিজের লোকদের ধর্মবিশ্বাস-বিরোধিতার ফলে উত্যক্ত এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা পরাভূত হইয়া ১৫৬৮ সনে ইংল্যাণ্ডে আসিয়াছিলেন আশ্রয় লাভের আশায়। তাঁহার আত্মীয়া কুইন এলিজাবেথের কথা বিশ্বাস করার ফলে, তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা ১৯ বৎসর কারাগারে কাটাইতে হয়, হাজার অপবাদে তাঁহার নাম কলঙ্কিত করা হয়, তাহার পর ধর্মমত-বিরোধিতার অজুহাতে ও বিরোধীদের উস্কানিতে ইংলিশ পার্লামেণ্টের নির্মম বিচারে তাঁহার চরম দণ্ড বিধান হয়, এবং তিনি হত্যাকারীদের নিকট প্রেরিত হন। ১৫৮৭ সনের ১৮ই ফেব্রুয়ারী একটি সাধারণ জল্লাদের হাতে ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার শির ছিন্ন করা হয়।" ইঁহার ইতিহাস পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

কুইন'স প্রেজেন্স চেম্বারের সিলিং-এও রূপক চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। আঁকিয়াছেন নেপ্‌লস-এর চিত্রকর আন্টোনিও ভেরিও। দ্বিতীয় চার্লস তাঁহাকে ইংল্যাণ্ডে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়াছিল। এ চিত্রেও ক্যাথারিন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছেন। একটি চন্দ্রাতপ তাঁহার মাথার উপরে, জেফির বা পশ্চিমবাহিত মধুর বাতাস তাহা শূন্যে ধরিয়া রাখিয়াছে, মহাকাল সেটিকে ওখানে বিছাইয়া দিয়াছে। ইহার নিচের চিত্রে ন্যায়-বিচার রাজদ্রোহিতা ও অন্যান্য অশুভ প্রেতদেহকে বিতাড়িত করিতেছে। প্রাচীরের গোবল্যাঁ পর্দায় এসথারের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অঙ্কিত হইয়াছে। গার্ড চেম্বারে যুদ্ধের স্মারকরূপে বহু চিত্তাকর্ষক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। ট্রাফালগার নৌ-যুদ্ধে ভিকটোরি নামক যে জাহাজটি গোলাবিদ্ধ হইয়াছিল তাহার মাস্তুলের (ফোরমাস্টের) একটি অংশ এখানে রহিয়াছে। ঐ নৌ-যুদ্ধের আর একটি স্মৃতি একটি 'বারশট', ইহা ঐ জাহাজেরই আটজন লোককে নিহত করিয়াছিল। শিখদের নিকট হইতে প্রাপ্ত দুইটি কামানও সেখানে রহিয়াছে। সেণ্ট জর্জের হলটি বেশ বড়, ২০০ ফুট দীর্ঘ এবং ৭৪ ফুট প্রস্থ। ইহার সিলিং প্রথম অর্ডার অভ দি গার্টার প্রচলনের সময় হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ শিভালরির সময় হইতে যত রকম অস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে তাহা চিত্রিত রহিয়াছে। এই 'অর্ডার' ভুক্ত যাবতীয় 'নাইট'দের নামও জানালাগুলির প্যানেলে লিখিত আছে। তৃতীয় এডওয়ার্ড ও ব্ল্যাক প্রিন্স (তৃতীয় এডওয়ার্ডের এক পুত্র) হইতে আরম্ভ করিয়া আর্ল অভ বিকনসফিল্‌ড ও মার্কুইস অভ স্যালিস্‌বেরি পর্যন্ত সবার নাম। প্রাচীরগুলিতে রাজাদের নাম—প্রথম জেম্‌স হইতে চতুর্থ জর্জ পর্যন্ত। গ্র্যাণ্ড রিসেপশন রুমটি বিশেষ ভাবে অলঙ্কৃত। প্রাচীরগুলিতে যে গোবল্যাঁ পর্দা আছে, তাহাতে জেসন ও মিডিয়ার কাহিনী চিত্রিত রহিয়াছে। ওয়াটারলু চেম্বারে রহিয়াছে ওয়াটারলু যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত যাবতীয় রাজা যোদ্ধা ও রাজনীতিক, যাঁহাদের কর্মফলে এই যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের সকলের প্রতিকৃতি। নেপোলিয়নের প্রতিকৃতি এখানে নাই, কিংবা তাঁহার অধীন যে সব ফরাসী জেনারেল খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিকৃতিও

অনুপস্থিত। গ্র্যাণ্ড ভেস্টিবিউলে সামরিক বিজয় গৌরবের বহু চিহ্ন, বর্ম প্রভৃতি রহিয়াছে। একদিকে বোয়েহ্‌ম নামক ভাস্করের নির্মিত সম্রাজ্ঞীর 'শার্প' নামক কুকুরসহ প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে। স্টেট অ্যাণ্টি রুমের সিলিং-এ পূর্বে উল্লেখিত ভেরিও নামক নেপল্‌সের শিল্পী অঙ্কিত খুব স্ফূর্তিযুক্ত দেবতাদের চিত্র রহিয়াছে। দেবতাদের এটি রাজকীয় ডিনার, খুব জাঁকপূর্ণ। সিলিং ও প্রাচীরের সংযোগস্থলের খিলানে মাছ ও মুরগীর চিত্র। ফ্লোরেন্সের শিল্পী জুকারেলির নামে যে কক্ষটি, তাহাতে এই শিল্পীব অঙ্কিত চিত্র রহিয়াছে। উল্লেখযোগ্য দুইখানি ছবি—"দি মীটিং অভ আইজার অ্যাণ্ড রেবেকা" ও "দি ফাইনডিং অভ মোজেস"। আর এক বিখ্যাত শিল্পীর নামের কক্ষে ২২ খানি প্রতিকৃতি রহিয়াছে। এটি শেষ কক্ষ—শিল্পী ভ্যানডাইক।

উইণ্ডসর ক্যাসল-এ অ্যালবার্ট মেমোরিয়াল চ্যাপেলটি উল্লেখযোগ্য। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়া তাঁহার স্বামীর স্মৃতিতে এটি নির্মাণ করিয়াছেন। ইহার মহিমা তাজকে স্মরণ করাইয়া দেয়। নির্মাণে পৃথিবীখ্যাত বহু জাতীয় মূল্যবান প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে।

প্রিন্স অ্যালবার্টকে সমাহিত করা হইয়াছে নিকটস্থ ফ্রগমোর নামক স্থানে, সেইখানে সম্রাজ্ঞীর একটি নিজস্ব ভূসম্পত্তি আছে। সম্রাজ্ঞীর অনুমতি লইয়া সেই সমাধি আমরা দেখিতে গিয়াছিলাম। সমাধি স্তম্ভটি শ্বেত মার্বল পাথরে নির্মিত। দেখিতে সুন্দর।

লং ওয়াক নামক শড়কটি দেখিলাম। এটি দৈর্ঘ্যে তিন মাইল। জানা গেল এটি শ্রেষ্ঠ অ্যাভিনিউ বা বীথি। দুই পাশে সুদৃশ্য এলম বৃক্ষশ্রেণী—সংখ্যায় ১৬০০। অতঃপর শ' পশুপালন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। এটি অ্যালবার্টের তিনটি কৃষিক্ষেত্রের অন্যতম। সম্রাজ্ঞীর নির্দেশে আমাদিগকে স্ট্রবেরি ও ক্রীম খাইতে দেওয়া হইল। স্ট্রবেরি এই জমিরই ফসল, ইংল্যাণ্ডে ইহা অপেক্ষা সুস্বাদু স্ট্রবেরি আর দেখি নাই। উইণ্ডসরের নিকটেই ইটন কলেজ, এদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া খ্যাত। এইভাবে আমরা নিকটস্থ নানা স্থান দেখিলাম, এবং ইংরেজ ভ্রাতাদের সদয় ব্যবহারের সুখস্মৃতি বহন করিয়া ফিরিলাম।

১০ই জুলাই মার্লবরো হাউসে প্রিন্স ও প্রিন্সেস অভ ওয়েল্‌স্ আমাদের জন্য একটি গার্ডেন পার্টির ব্যবস্থা করিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হইল সাড়ে চারিটা হইতে সাতটার ভিতরে। ইংরেজদের পোশাক কিভাবে বর্ণনা করিব জানি না। কোনও লেডি যদি আমার এই লেখা পড়েন, তিনি অবশ্যই ইহার মধ্যে আমার বর্ণনা খুঁজিবেন। কিন্তু তিনি নিরাশ হইবেন। কোনও লেডির সঙ্গে দেখা হইলে তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিবেন, "রাণীকে দেখিয়াছেন?" অথবা "প্রিন্সেসকে দেখিয়াছেন?"—তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেই অনুমান করা যাইবে তিনি ব্যগ্রভাবে পরবর্তী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাঁহার সজ্জা কেমন ছিল?" এ প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে আমার বর্বরতা প্রকট হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই, কারণ আমি বলিব, "সেটি ত লক্ষ্য করি নাই।" অথবা "তিনি কালো পোশাক পরিয়াছিলেন।" অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা স্বাধীনভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন, ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এরূপ উপলক্ষে আপ্যায়নকারী তাহাদের এই স্বাধীনতায় আর কোনও বাধা-নিষেধ আরোপ করেন

না, কারণ ইহাই দস্তুর। আমাদের দেশের মত নিমন্ত্রণকারী অতিথিদের ব্যক্তিগতভাবে বলেন না যে এটা খান, ওটা খান, আরও খান ইত্যাদি। প্রচুর খাদ্য ও পানীয় একস্থানে জমা করা থাকে, তাহার রক্ষকের নিকটে গিয়া যাহা প্রয়োজন চাহিয়া লইলেই হইল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাপ দিয়া খাওয়াইবার রীতি সেখানে নাই। এই জাতীয় পার্টিতে পরস্পর পরিচিত হইবার সুযোগ পাওয়া যায়। উদ্যানে রাশিয়ান ব্যাণ্ড বাজিতেছিল, এই দলে কয়েকজন বিখ্যাত রুশ গায়িকা ছিলেন। প্রাচ্য পোশাক ছিল তাঁহাদের পরিধানে, চাগা ও কোমরবন্ধ। সম্রাজ্ঞী ভিকটোরিয়াও অতিথিদের ভিতর দিয়া একসময়ে হাঁটিয়া গেলেন ও কিছুক্ষণ বাশিয়ান গায়িকাদের গান শুনিলেন। সঙ্গীত শেষে তিনি দলের প্রধানকে নিজে ধন্যবাদ জানাইলেন।

সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আমি যাহা দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতীয়রা নভেল পড়িয়া উচ্চ ইংরেজ জীবনকে বেষ্টন করিয়া যে সুসংস্কৃত রুচি সম্পন্ন ঐশ্বর্য রহিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারিবেন না। আমি নিজে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলিতেছি। আসামের বৃদ্ধ দফলা তাহার পাহাড়ে অবস্থিত গৃহ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা প্রদর্শনীতে সেই গৃহের মডেল নির্মাণের জন্য আসিবার সময় বলিয়াছিল, "আমি দেবতাদের আবাসস্থলে চলিলাম।" আমাদের পুরাণ ইত্যাদিতে যদি দেবতাদের বর্ণনা যথাযথ হইয়া থাকে, তাঁহাদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, বিলাসিতা, শক্তি-সামর্থ্য যদি নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে কোনও হিন্দু ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের উপর একবার চোখ বুলাইলেও বলিবেন, "এই ত স্বর্গ।" সমস্তটা দেশ, মাঠ-ঘাট, অরণ্য, প্রান্তর, পতিত জমি, জলাভূমি—সমস্ত ঘষিয়া মাজিয়া কাটিয়া, সমান করিয়া ছবির মত কবিযা রাখা হইয়াছে। মানুষের যত্ন এবং নৈপুণ্যে যতটা সম্ভব তাহা করা হইয়াছে। জমিতে চড়াই-উৎরাই থাকাতে সৌন্দর্য আরও বাড়িয়াছে। নয়ন-লোভন সবুজ মাঠ, তাহার ভিতর দিয়া রূপার সূতার মত ছোটখাটো স্রোতস্বিনী ছুটিতেছে, জল কানায় কানায় পূর্ণ। শস্যক্ষেত্রগুলি জ্যামিতিক নির্ভুল নক্সার ন্যায় সাজান। ফলের বাগান ফলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে চিরসবুজ অরণ্য, তাহাতে ফেজাণ্ট পাখীদের বাস। প্রাসাদতুল্য হর্ম্যরাজি দীর্ঘ বীথিকায় শোভিত। পার্কে হরিণ নিশ্চিন্ত মনে চরিতেছে। হ্রদে বন্য হাঁস সাঁতার কাটিতেছে। গ্রীণ হাউস, পাম হাউস রহিয়াছে। ছোট ছোট গ্রাম, আমাদের দেশের ছোট শহরতুল্য। শহরগুলির প্রশস্ত পথগুলি পরিচ্ছন্ন, একই চেহারার বাড়িগুলি চমৎকার সাজান। দীর্ঘ চিমনি, কারখানাসমূহ প্রাণ-চঞ্চল—এ সমস্ত তরঙ্গিত ভূমিকে সুন্দরভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। রেলে যাইবার সময় চোখের সম্মুখ দিয়া এসব দৃশ্য দ্রুত পার হইয়া যায়। প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন চলে ৫০ হইতে ৬০ মাইল বেগে। এদেশে ইহাই রেলগাড়ির সাধারণ গতি। সবুজ ক্ষেতে মেষগুলি বিন্দুবৎ মনে হয়, গোরুদের দলকে মাঠে চরিতে ও রোমন্থন করিতে দেখা যায়, ওদিকে মেষশাবকেরা লাফালাফি ছুটোছুটি করিতেছে, চাষের ঘোড়া দাঁড়াইয়া সেদিকে চাহিয়া আছে। সম্প্রতি চাষ-করা

উল্টান মাটির মধ্য হইতে কাক ও চড়ুই পাখীর দল পোকা খুঁটিয়া খাইতেছে। খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, ও দেশে কাকেরা মানুষের বসতির কাছে খুব যায় না। আগেই বলিয়াছি, একজন ভারতীয়ের ব্রিটেন, ফ্রান্স, কিংবা বেলজিয়ামের ভিতর দিয়া চলিবার সময় এসব স্থানের নিঁখুত পরিচ্ছন্নতা প্রবলভাবে চোখে না পড়িয়া পারে না। আগাছা নাই, উদ্ভিজ্জের পচা গাদা নাই, দুর্গন্ধ নোংরা খাল নাই। যে দিকে তাকান যায়, সর্বত্র সযত্ন হস্তাবলেপ ও সুরুচির চিহ্ন দেখা যায়।

উহারা দেশটিকে যেভাবে গড়িযাছে, বাড়িগুলিও তেমনি সযত্নে গড়িয়াছে। ইংরেজদের ম্যানশন বা বড় বড় হর্ম্যগুলির সঙ্গে যে সব দীর্ঘ গাছের সারি রহিয়াছে তাহা দেখিবার মত। কাছাকাছি স্থান দিয়া কুলুকুলু ধ্বনি তুলিয়া হয়ত কোনও স্রোতস্বিনী চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া এইসব হর্ম্যের পরিবেশ আরও সুন্দর হইয়া উঠে। পথ এবং ফুলের জমি সবই নানা রঙের ভাঙা পাথর বিছানো। ইহার পাশেই ফুলের জমি, নানা আকাবের, যাহা কেবল এ বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত-জ্ঞানবিশিষ্ট মালির দ্বাবাই সম্ভব। কোনও কোনও স্থানে ঘন গুল্ম স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার পাশে পাশে সাজানো বাগান আরও মনোহর দেখাইতেছে। পাহাড়ের ক্রমনিম্ন গায়ে বড় বড় গাছকেও স্বাধীনভাবে বাড়িতে দেওয়া হইয়াছে। এই সব গাছের পাতার আড়ালে কোকিল ও থ্রাশ পাখী (ছ'তারে) ডাকে। ওদেশে আমি একটিও কোকিল দেখি নাই, কিন্তু আমি অনেকবার তাহার কুহুধ্বনি শুনিয়াছি। এ ডাক আমাদের দেশের কোকিলের মত নহে। আমাদের কোকিল কুউ—কুউ—কুউ ক্রমাগত ডাকিযা চলে। ইংল্যাণ্ডের কোকিলের ডাক একটু বেশি গম্ভীর এবং মোটা, এবং তাহার কুহুধ্বনি অনেকক্ষণ পর পর শোনা যায়। পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, আমি যখন ইহা প্রথম শুনি, তখন এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এ কোন্ পাখীর ডাক? অবশ্য গান গাওয়া পাখীরা ইংল্যাণ্ডে গ্রীষ্মকালে দেখা দেয়। হ্রদের ধাবের জলে ঘন শরবন, সেখানে বুনোহাঁস বাসা বাঁধে। লাল ফুলের প্রশস্ত চক্রাকার পাতাগুলি জলের বুকে শান্তভাবে ভাসিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে স্থানে স্থানে এক-একটি ফুল তাহাদের লম্বা ডাঁটার উপর নিচের দিকে ক্লান্তভাবে মাথা নোয়াইয়া আছে। গৃহের নিকটে রহিয়াছে টেনিস খেলিবার জায়গা, এবং অন্যান্য খন্ড খন্ড সবুজ জমি, তাহার উপব ছোটরা খেলাধূলা করে, নিকটস্থ ফুলের ক্ষেতের ঝরণা ধারা হইতে যে সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে বড়রা আর একস্থানে তাহার পাশে বেঞ্চিতে বসিয়া তাহা শুনিতেছে। সমস্ত স্থানটিতে নানা মর্মর মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে—নূতন পুরাতন সব রকমই আছে। সেগুলি ইটালিয়ান অথবা গ্রীক। এখানকার গরম উদ্যান-গৃহে গ্রীষ্মমন্ডলের গাছ পালিত হয়। গরম গৃহে মাস্কাটেল ও অন্যান্য জাতীয় আঙুর প্রচুর উৎপাদিত হয়। বৎসরের সব সময়েই ফলন হয়। হর্ম্য-সংলগ্ন কাঁচের ছাদবিশিষ্ট কনজারভেটরিতে বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করা চলে। পাশে বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘর। অন্য ঘরে এক তরুণী সান্ধ্যপোশাকে বসিয়া পিয়ানো বাজাইতেছে। তাহাকে দেবকন্যার মত দেখাইতেছে, সে যেন স্বর্গীয় সঙ্গীত পৃথিবীতে নামাইয়া আনিতেছে। বসিবার ঘরে

সর্বাপেক্ষা সৌন্দর্য ও শিল্পপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। বসিবার আসনগুলি যেমন সুন্দর তেমনি আরামদায়ক। ঘরের কোণায়, তাকে, কুলুঙ্গিতে পৃথিবীর নানাস্থান হইতে সংগৃহীত, দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন কালের সুন্দর সব দ্রব্য সুরুচিসঙ্গতভাবে স্থাপিত রহিয়াছে। জানালার পরদাগুলি অদ্ভুত সুন্দর। সিলিং-এ নানা চিত্র। পায়ের নিচের কার্পেটটিও সূক্ষ্ম কাজের এক আশ্চর্য নিদর্শন। যে পিয়ানোটি বাজিতেছিল, তাহাও কাঠ ও আইভরির সহযোগে সুন্দর চেহারা পাইয়াছে। ভাস্‌সমূহ নানারঙের ফুলের ব্যুকে বা তোড়ায় সজ্জিত। ঘব সুগন্ধে ভরিয়া তুলিয়াছে। মাছের খাদ্যও আছে প্রচুর। বংশ বংশ ধরিয়া গৃহ-লাইব্রেরীটি হাজার হাজার গ্রন্থে ভরিয়া উঠিয়াছে। অতুলনীয় বহিবাবরণ সেগুলির। পারিবারিক প্রতিকৃতি চিত্র কত না! বহু শতাব্দীর পূর্বপুরুষদের চিত্র সেগুলি। কিন্তু প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জাতীয় সৌন্দর্যপ্রীতির পরিচয় বহন করিতেছে। ডাইনিং টেবলটি যে কাপড়ে ঢাকা তাহা সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক, তাহার শুভ্রতায় কোথাও একটি ক্ষুদ্র চিহ্নও নাই। তাহার উপর ফুল, পাতা ইত্যাদি সুরুচিসঙ্গত ভাবে সাজান, রূপার ডিশগুলি ঝকমক করিতেছে, তাহা অলঙ্করণ পূর্ণ, তাহা ভিন্ন চাটনি-পাত্র, পানপাত্র, ডিক্যাণ্টার ও অন্যান্য নানা আনুষঙ্গিক দ্রব্য। ইহার সঙ্গে আমাদের ভোজনরীতিব কোনও তুলনা একমাত্র উন্মাদ ভিন্ন অন্য কেহ করিবে না। ছোটখাটো ব্যাপারেও আমাদের কত ত্রুটি। নুন রাখিবার পাত্রটি কি সুন্দর, ছোট্ট রূপার চামচ এই পাত্র হইতে নুন তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর যে নুন তোলা হয় তাহার বিশুদ্ধতা ও শুভ্রতা তুলনা করিতে গেলে হল্যাণ্ড-এর শীতঋতুর তুষারের কথা মনে পড়ে। আর আমাদের দেশের নুন আর নুনের পাত্রের কথা ভাবুন। কিভাবে সে নুন তুলিয়া লই তাহাও ভাবুন। ইউরোপের লোকেরা কোনও খাদ্যদ্রব্য হাতে তুলিয়া খায় না, হাতে পরিবেশনও করে না। হাতে তুলিয়া একটি সিগারও কাহাকেও দেওয়া হয় না, উহা অশিষ্টতা। খাদ্যদ্রব্যের বেলায় দক্ষিণ ভারতে এই রীতি কিছু পরিমাণ মান্য করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ভোজের সময় কিভাবে নিমন্ত্রিতদিগের পাতে খাদ্য তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা দেখিলে অস্বস্তি বোধ হয়। মিষ্টির দোকানে অথবা কলিকাতার হোটেলের খাদ্য পরিবেশনও রুচিবিগর্হিত। ইংল্যাণ্ডে যে সব বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন খাদ্য পরিবেশন করা হয় সে পাত্রগুলিতে কত রকম ছবি! খাদ্যদ্রব্যগুলিও নানা শিল্পসঙ্গত চেহারার। আমাদের দেশে এদিক দিয়া কিছু স্থূল ধরনের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু ইউরোপে এ বিদ্যা শিল্পরুচির চরমে পৌঁছিয়াছে। আমি এই সুরুচির কথা এতটা আলোচনা করিতাম না যদি ইহা কেবলমাত্র ধনীদের সমাজেই আবদ্ধ থাকিত। পক্ষান্তরে এই রুচি উহাদের সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত। তাহাদের সকলেই, অবস্থা যাহাই হউক, তাহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা নিজেদের এবং তাহাদের পরিবেশে যাহা কিছু আছে রুচিসঙ্গত করিতে। এই বিষয়ে ইউরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য এই যে, তাহারা ইহা আন্তরিকভাবে ইচ্ছা করে, এবং ইহার জন্য সযত্ন পরিশ্রম করে। আর আমরা এ জিনিস ইচ্ছাও করি না, ইহার জন্য চেষ্টাও করি না। আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ইহাদের আরও পার্থক্য আছে। আমাদের দেশে কোনও ব্যক্তির যদি

ধোপা খরচ না জোটে তাহা হইলে সে নোংরা কাপড় পরিয়া দিন কাটায়। ইংল্যাণ্ডে এরূপ লোক নিজ হাতে পোশাক কাচিয়া পরিষ্কার করে। আমাদের দেশে সম্মান বোধ এখনও নিচু স্তরের। আমার মতে ইউরোপীয় সভ্যতার সর্বাপেক্ষা বড় কৃতিত্ব এই যে, ইহা নানা উপভোগ্য বস্তু সকল সত্যনিষ্ঠ কর্মীর ক্রয়সীমার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে, এবং শুধু তাহা ইউরোপের মানুষের নহে, পৃথিবীর সকল মানুষের।

ইংল্যাণ্ডের জীবনযাত্রার মান আমাদের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ইংবেজদের মনে আরাম ও সৌন্দর্য যুক্তভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কি করিয়া ভাল ভাবে বাঁচিতে হয় তাহা তাহারা জানে, এবং ইহার জন্য যে উপকরণ দরকার তাহা আয়ত্ত করিবার উপায়ও তাহারা জানে। তাহারা উপভোগ্য উপকরণ সমূহকে মানব জাতিকে ভুলাইয়া ফাঁদে ফেলিবার উপায় স্বরূপ মনে করে না, বরং তাহাকে উহারা কৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রহণ করে, এবং তাহা আরও কি করিয়া উন্নত ও উপভোগ্য করা যায় তাহার জন্য পরিশ্রম করে। তাহারা জলের ডুবাইবার স্বভাবকে, আগুনের পুড়াইবার স্বভাবকে, এবং গোলাপ গাছের কাঁটাকে ভয় করিয়া চলে নাই, তাহারা উহা অগ্রাহ্য করিয়া উহাদিগকে নিজের কাজের জন্য যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়াছে। বহুদিন পূর্ব হইতেই তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, বৈরাগ্য বা কৃচ্ছ্রসাধন এক জাতীয় ধর্মোন্মাদনা, মস্তিষ্ক বিকার এবং ধর্মোন্মাদনা অর্থাৎ ইনস্যানিটি। তাহাদের জীবনের দাবি—সৌন্দর্য ও আরাম উপভোগ। এবং এই সর্বজনীন দাবি মিটাইতে উহাদের মধ্যে দারুণ প্রতিযোগিতা। সেইজন্যই উহার উপকরণ সহজলভ্য হইয়াছে, এবং নিম্নস্তরের লোকেরও আয়ত্ত হইয়াছে। আমাদেব দেশে ইহার চাহিদা বহু দূরে অস্পষ্টভাবে মাত্র দেখা দিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিতে ইংরেজ জীবনের শিল্পরুচিসঙ্গত পরিবেশ মনে হয় যেন অতিমাত্রায় পরিকল্পনা ও পদ্ধতি মানিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এবং সেজন্য তাহা অত্যন্ত কঠোর এবং ক্লান্তিকর বোধ হয়। যেন সব কিছুই ইংরেজদের দৃঢ় চরিত্র ও সরল দেহের ছাপ পাইয়াছে। উহাদের শিল্প-সৌন্দর্য পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় চোখে ধাঁধা লাগায়, সবুজ পর্ণপুটের ভিতর হইতে লাজুক কুঁড়িটির মত কোমল দৃষ্টিতে বাহিরে তাকায় না। উহা আমাদের শিল্প। কিন্তু স্বদেশবাসীগণ, তোমরা ইহার জন্য গর্বিত হইও না। আমরা যে এখনও এমন শিল্প রচনা করি ইহা আমাদের দুর্ভাগ্য। কারণ ইহা সবটাই কাব্য, ইহা অন্য জগতের স্বপ্নমাখা মধুর ভাব। এই কঠিন রূঢ় ক্ষুধার্ত জগতে ইহা বেমানান, যে ক্ষুধার্ত জগৎ কুমুদ ফুলকে মন্দ হাওয়ায় জলে খেলা করিতে দেয় না, জল হইতে উপড়াইয়া লয়, নিরীহ মেষশাবককে হত্যা করে, কোমল-চাহনি-যুক্ত গেজেল হরিণকে গুলি করিয়া মারে, পর্বতের নিকটস্থ জঙ্গলে মেঘের মত মন্থর গতিতে চলাফেরা করা হস্তীযূথের গলায় ফাঁস পরায়, সে জগতে কোমলকাব্য চলে কি? এ জগতে গদ্যময় জাগরণই একমাত্র টিকিয়া থাকিবার যোগ্যতা দিতে পারে, কাব্যের ভাবে ডুবিয়া থাকা চলিবে না। বাষ্প ও যন্ত্রের আকারে গদ্য কোটি কোটি লোকের প্রভু, তাহার মধ্যে কাব্যের বাটালি দ্বারা ক্ষুধা মিটাইবার জন্য মাসে পাঁচ টাকা আর একমুষ্টি অন্ন, আর শীতে শুইবার জন্য দুআনা দামের খেজুর পাতার পাটি ভিন্ন

আর কিছু উপার্জন করা যাইবে না। আমাদের শিল্পের আয়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে, এবং তাহার মৃত্যুই এখন প্রয়োজন যদি সে মাসে দশ আনার বেশি উপার্জন করিতে না পারে। শ্রমের মূল্য বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কারুশিল্পের ধ্বংস অনিবার্য। অন্ততঃপক্ষে ব্যবসা হিসাবে ভারতীয় কারুশিল্পের সার্থকতা এদেশে খুব বেশি নাই। আধুনিক যন্ত্র আসিয়া ইহাকে ধ্বংস করিবে। সূক্ষ্ম মসলিন, অতি সূক্ষ্ম কারুযুক্ত পইসলি কাশ্মীরী শালকে ল্যাঙ্কাশিয়ার উৎখাত করিয়াছে, বার্মিংহাম এখন ধাতুশিল্পকে ধ্বংস করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। আসল নকল সবই শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইবে।

ইংরেজ জাতির জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিতে শিল্পবোধ কিরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্তরূপে আমি একখানা কার্ডের কথা উল্লেখ করিতেছি। ঔপনিবেশিকদের ও ভারতীয়দের সম্মানে লর্ড মেয়ার আমাদিগকে একটি বল-নৃত্যের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, স্থান গিল্‌ড হল, কাল ২৫শে জুন ১৮৮৬, শুক্রবার। কার্ডখানি একটি উৎকৃষ্ট চিত্র, অতএব আমি স্মৃতিচিত্র স্বরূপ ইহা বাঁধাইয়া রাখিয়াছি। নক্‌সার ভঙ্গিটি প্রাচ্যদেশীয়। কার্ডের চারিটি ধারে এমন সুন্দর পাড় আঁকা, মনে হয় তাহা যেন হারুন-অল-রশিদের প্রাসাদের কার্নিশ হইতে নকল করা। তাহার পরেই যে পাড়টি আঁকা হইয়াছে তাহাতে উপনিবেশসমূহ ও ভারতবর্ষের ৫২টি ফুলের ছবি, এবং প্রত্যেকটি ফুলের যেমন বর্ণ, ঠিক সেই সব বর্ণে রঞ্জিত। ইহাদের মধ্যে Acmena elliptica (সিডনির লিলিপিলি), Swainsona greyana (ডারলিং নদীর পয়জন পী), Coplis trifolia (কানাডার গোলড থ্রেড), Cissampelos (ওয়েস্ট ইণ্ডীজের ভেলভেট লীফ), Citrus limonum (পশ্চিম আফ্রিকার লেমন গাছ), Vitis vinifera (কেপটাউনের ব্ল্যাক গ্রেপ) এবং Viola adorata (উত্তর ভারতের বনফশা)। এই ফুলগুলি কার্ডের ফ্রেমের মত দেখাইতেছে এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে প্রত্যেক দেশের যুদ্ধাস্ত্রর নাম চিত্রিত আছে। বামে প্রথমে সাইপ্রাস, তাহার পর কানাডা, মলটা, উত্তমাশা অন্তরীপ ও ন্যাটাল। আরও নিচে একটি বন্দর—সেখানে বড় একটি জাহাজ ও মাছধরা নৌকা, তীরভূমি পাহাড়ী, দূরের আকাশে মেঘ—কেপ টাউনের ছবি। ইহার নিচে পর পর ওয়েস্ট ইণ্ডীজ, ব্রিটিশ গিয়ানা, পশ্চিম আফ্রিকা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, ফকল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ, এবং নিউগিনি। কার্ডের বাম পার্শ্ব শেষ হইল। ডান পার্শ্বে, সারাসিনিক স্থাপত্যে যাহাকে বলে "জবাব" বা রিপ্লাই—সেই ভঙ্গিতে চিত্রিত হইয়াছে সাইপ্রাসের জবাবে মরিশিয়াস। ইহার পর নিউজীল্যাণ্ড, ইহার সামরিক চিহ্নের নিচে দুইটি লোকের ছবি, একজনের হাতে তুলাদণ্ড, অন্যজনের হাতে একটি দণ্ড। ইহার পর হংকং, নিউ সাউথ ওয়েলস এবং কুইনসল্যাণ্ড। কেপটাউনের জবাবে দক্ষিণ পার্শ্বে সিডনি বন্দর, বন্দরে বড় একটি বাষ্পীয় জাহাজ, এবং বহু বৃক্ষ পরিপূর্ণ তীরভূমিতে গম্বুজ যুক্ত একটি হর্ম্য, গীর্জা ও অন্যান্য অট্টালিকা। সিডনির পরে আসিয়াছে স্ট্রেট সেটেলমেন্টস, উত্তর বোরনিও, সিংহল, ভিকটোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া এবং ফিজি। এইখানেই দক্ষিণ পার্শ্ব শেষ। উপরের প্রান্তে দক্ষিণ দিকে লণ্ডন ও বাম দিকে গিল্‌ড হল। এই দুইয়ের মাঝখানে লণ্ডনের সামরিক চিহ্ন,

এক দিকে একজন লণ্ডন রাইফল ভোলাণ্টিয়ার ও অস্ট্রেলিয়ান ভোলাণ্টিয়ার, অন্যদিকে ইংলিশ গার্ডস্‌ম্যান ও নেটিভ ইণ্ডিয়ান সৈনিক প্রহরী স্বরূপ দণ্ডায়মান। জাতীয় এবং সামরিক চিহ্নের একটি অংশ, যথা গোলাপ, ত্রিপত্র ও কাঁটা, নিচে মুদ্রিত Domine Dirige Nos, (প্রভু, আমাদের পথ দেখাও)। নিচের পাড়ে অটাওয়া শহরের ছবি। এটি বাম পার্শ্বে অবস্থিত। দক্ষিণ পার্শ্বে কলিকাতা, ও তৎসহ গভর্মেণ্ট হাউস, ময়দান, ও অকটারলোনি মনুমেণ্ট। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে শেরিফদের ও লর্ড মেয়ারের প্রতীক চিহ্ন। কেন্দ্রের পটভূমিতে একটি ভারতীয় খিলান, দুইটি স্তম্ভের উপর চিত্রিত হইয়াছে। ইহার এক পার্শ্বে অ্যামেরিকার রেড ইণ্ডিয়ান নামক এক আদিবাসী, তাহার পাশে এক ঝুড়ি আনারস সহ একজন নিগ্রো। আরও কিছু দূরে দীর্ঘকায় এক ফার্ণ গাছের নিচে পিছনের দুটি পায়ে ভর করিয়া একটি ক্যাঙারু, একটি মেষশাবক ও একটি এমু পাখী; অন্য দিকে এক অস্ট্রেলিয়ান অশ্বারোহীর কাছে একজন ভারতীয় সহিস দণ্ডায়মান। আরও পশ্চাতে একটি বাঘশিকারের দৃশ্য। ইহাতে একটি হাতী ও দুটি বাঘ রহিয়াছে। কার্ডের কেন্দ্রে নিমন্ত্রণ লিপি। কার্ডখানি ক্রোমো-লিথো পদ্ধতিতে মুদ্রিত।

বল-নৃত্যের অনুষ্ঠান ১৮৮৬ সনের ২৫শে জুন তারিখে পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। অনুষ্ঠানটি খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। ইহাতে প্রায় ছয় হাজার লোক যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই লণ্ডন সোসাইটির সেরা ব্যক্তি। অতিথিদিগকে যথারীতি লর্ড মেয়ার দি রাইট অনরেবল জন্ স্টেপলস এফ-এস-এ'র সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। নৃত্য আরম্ভ হইল নয়টার সময়। নাচ সম্পর্কে আমার কিছু বলিবার নাই, কারণ আমি ইহা জানি না, বুঝি না। আমি শুধু নাচের দিকে চাহিয়াছিলাম, এবং মাঝে মাঝে, যাঁহারা আমারই মত নাচে যোগ দেন নাই, তাঁহাদের সঙ্গে পরিচিত হইতেছিলাম। সমস্ত রাত্রি নাচ চলিয়াছিল।

ট্যালো চ্যাণ্ডলার্স হল্-এ একটি শৌখীন সম্প্রদায়ের নাটক দেখিতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। আমাদের দেশে এরূপ অভিনয় অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু লণ্ডনে যাহা দেখিলাম, তাহার সহিত সেগুলির তুলনা চলে না। বৃত্তিগত বিশেষ শিক্ষা না পাইয়াও স্ত্রীপুরুষ যেরূপ সুন্দর অভিনয় করিলেন তাহা না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। এমন কি লণ্ডনবাসীরাও যাঁহারা উৎকৃষ্ট অভিনয় দেখায় অভ্যস্ত, তাঁহারাও এই শৌখীনদের অভিনয়ে স্যাভয়, ড্রুরি লেন, অ্যাডেলফি, গ্লোব, গেইটি, প্রিনসেস, কমেডি, হে-মারকেট, স্ট্র্যাণ্ড, কভেন্ট গার্ডেন, অ্যাভিনিউ, এবং অন্যান্য থিয়েটার। প্রত্যেকটির জন্যই আমরা ফ্রী পাইয়াছিলাম। এই সব থিয়েটার বিষয়ে আমার বলিবার উপযুক্ত ভাষা নাই। ইহাদের সহিত তুলনায় আমাদের বীডন স্ট্রীটের থিয়েটারগুলি ছেলেখেলা বোধ হইবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি।

দুই দেশের থিয়েটারের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা হইতেই ইউরোপীয়দের এবং ভারতীয়দের কত ব্যবধান অনুমান করা যাইবে। ব্যবধান বিরাট। কিন্তু হায়, আমি আমার দেশবাসীর একটি সম্প্রদায়কে একথা বুঝাইতে পারি না। সীমাহীন প্রজ্ঞার অব্যর্থতা সম্পর্কে অনমনীয় বিশ্বাসই অজ্ঞতা। আফশোষের বিষয় এই যে, মাত্র একশত বৎসর পূর্বে ইউরোপীয় এবং

ভারতবাসীগণ সামাজিক অগ্রগতিতে প্রায় সমস্তরে ছিল, এবং এই সময়ের মধ্যে, বলা উচিত গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উহারা অনেক অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, আর আমরা উহাদের অপেক্ষা বহু দূরে পিছাইয়া পড়িয়াছি। আমরাও অগ্রসর হইতেছি, কিন্তু শম্বুক গতিতে। উহারা ছুটিতেছে রেলগাড়ির গতিতে। অবশ্য ইহা সম্ভব এই কারণে যে, পৃথিবীর সকল দিক হইতে ঐশ্বর্য উহাদের হাতে আসিয়া পড়িতেছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে ফ্রান্স ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের প্যারিসের ইডেন থিয়েটারের মত একটি আনন্দ উপভোগের প্রতিষ্ঠান পালন করা সম্ভব হয় কি করিয়া? অস্ট্রিয়া বিদেশ হইতে কোনও সম্পদ আহরণ করিতে পারে না, তবু কেমন করিয়া ভিয়েনাতে বুং থিয়েটারের মত প্রতিষ্ঠান পালন করে? এমন কি নিঃস্ব ইটালিও ভেনিস, ফ্লোরেন্স এবং রোমে উচ্চাঙ্গের অপেরা হাউসগুলি বাঁচাইয়া রাখে। আমাদের দেশ ইহাদের অপেক্ষা অধিক উৎপাদনকারী দেশ। ফ্রান্সের দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া, বোহেমিয়ার পাইন অরণ্যের দিকে চাহিয়া, জার্মানিব রাই ক্ষেতের দিকে চাহিয়া, দক্ষিণ ইটালির অলিভ উদ্যানগুলির দিকে চাহিয়া আমার মনে হইয়াছে তবে কেন আমরা এত দরিদ্র? অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীগণ স্মরণাতীত কাল হইতে গাছের সদ্য কাটা ডাল দিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘর তৈয়াবি করিয়া তাহাতে বাস করিতে অভ্যস্ত, শীতের দিনে ক্যাঙারুর চামড়া ভিন্ন গায়ে দিবার তাহাদের অন্য কিছু নাই, ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহারা কীট-পতঙ্গ এবং অন্যান্য কুখাদ্য খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এবং তাহাদের অধিকাংশ এখনও এইভাবেই জীবন কাটাইতেছে। অথচ ইউরোপীয়দের হাতে পড়িয়া ঐ একই দেশ এখন কত ফসল ফলাইতেছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই সব পলিনেশীয়দের মধ্যে কি এখনও কোনও অর্থনীতিবিদ্ জন্মায় নাই, যে ব্যক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সুললিত ভাষায় এমন কথা প্রচার করিতে পারে যে, তাহাদের দারিদ্র্যেব একমাত্র কারণ ইংরেজরা তাহাদের দেশের ঐশ্বর্য লুঠ করিতেছে বলিয়া? আমাদের দেশে এরকম অর্থনীতিবিদ্ আমরা সকলেই।

১১

আমি জানি, আমি বিপজ্জনক মাটিতে পা দিয়াছি, কারণ অর্থশাস্ত্রের জটিলতায় প্রবেশ করি এমন সাধ্য আমার নাই। কিন্তু একদেশদর্শী রূপে বিচার করিতে না পারা আমার দুর্ভাগ্য, স্বীকার করিতেছি। অন্য দিকটাও বিচার করা আমি অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করিতেছি। অতএব সেদিকটিতে আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা সবিনয়ে নিবেদন করি। আমার কাছে কোনও রেফারেন্স বই নাই, কিন্তু আমি স্মৃতি হইতে বলিতেছি, আমাদের দেশ হইতে সোনা এবং রূপা বাহিরে চলিয়া যাওয়া দূরে থাক, বরং প্রতিবৎসর আমরা প্রায় দশ কোটি টাকা মূল্যের সোনা ও রূপা এদেশে পাইয়া থাকি—এবং তাহা পুনরায় রপ্তানি করা হয় না। এই সোনা ও রূপা এদেশে মজুত করা হইয়া থাকে। আমি ভারতের যে অংশের বাসিন্দা, সেখানে ত্রিশ বৎসর পূর্বে সোনা দুর্লভ ছিল, এবং স্ত্রীলোকেরা শাঁখের, গালার, পিতলের অথবা খুব বেশি হইলেও, রূপার অলঙ্কার পরিয়া খুশি থাকিত। কিন্তু এখন নিম্নস্তরের স্ত্রীলোকেরাও সোনার অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছে। আমরা বৎসরে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ স্টার্লিং পাউন্ড মূল্যের সোনা ও রূপা ক্রয় করিতেছি। অবশিষ্ট ৭ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে আমরা ৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের দ্রব্য বিদেশ হইতে কিনি। অবশিষ্ট থাকে ৪ কোটি ১ লক্ষ পাউণ্ড। ইহা হইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের সূতিবস্ত্র আমদানি করি, এবং সাধারণ কর হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড মাশুল দিই। গত ছয় বৎসরের গড় মাশুলের পরিমাণ ১৯ কোটি টাকা, বাকিটা ধার করিয়া মিটাই। এই দুটি বিষয়ে আমাদের দেশের ক্ষতি। আমরা বিদেশে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ডের তুলা ও সূতা পাঠাই। এবং ২ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ডের কাপড় কিনি। তফাৎ ৭০ লক্ষের। ইহা হইতে উৎপাদন যন্ত্রের মূলধনের উপর সুদ কাটিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা ইংল্যাণ্ডকে আমাদের জন্য কাপড় তৈয়ারির মজুরি স্বরূপ বৎসরে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া থাকি। আমরা নিজেরা যদি এখানে বস্ত্র উৎপাদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে এই ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আমাদের দেশেই থাকিয়া যাইত। "হোম চার্জ" রূপে ইংরেজরা আমাদের নিকট হইতে ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড আদায় করে। ইহা ভিন্ন আরও অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে খরচ জোগাইতে হয়, যথা, সিভিল, মিলিটারি খরচ, ছুটির জন্য আলাউয়েন্স, পেনশন, ইংরেজ অফিশিয়ালগণ এদেশে যাহা জমায় তাহা, রেলপথ ও অন্যান্য জন-কল্যাণ মূলক কাজের জন্য যে টাকা তাহারা ধার দেয় তাহার সুদ দিতে হয়। এই সুদ অ্যামেরিকা ব্যতীত প্রায় সকল দেশই ইংরেজকে দিতে বাধ্য হয়। ইংরেজরা যদি সর্বত্র রেল বিস্তারের জন্য শতকরা ৪ সুদে আরও টাকা ধার দিত তাহা হইলে ভাল হইত মনে করি। সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের দেশ হইলে যে টাকাটা ইংরেজকে না দিয়া আমরা দেশেই রাখিতে

পারিতাম, তাহার পরিমাণ বৎসরে ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড হইতে কিছু বেশি। ইহার উল্টা দিকও আছে, যথা (১) ইংল্যাণ্ড চীনকে আফিং খাইতে বাধ্য করিয়া প্রায় ৮০ লক্ষ পাউণ্ড আয় করিয়াছে, যাহা আমাদের দ্বারা সম্ভব হইত না। (২) শান্তি স্থাপন, রেল বিস্তার ও ইংল্যাণ্ড এদেশের লোকদিগকে যে ব্যবসায়ের প্রেরণা দিয়াছে তাহাতে অনেক বেশি জমি চাষ হওয়াতে কাঁচা মালের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। (৩) ব্রিটিশ শক্তি আমাদের রক্ষকরূপে থাকাতে বিদেশীদের দ্বারা এদেশ আক্রমণের ভয় দূর হইয়াছে। এইসব বিবেচনা করিলে আমার মনে হয়, ইংল্যাণ্ডে এবং ভারতে অনেকে যেমন ভাবেন তেমন আর্থিক ক্ষতি আমাদের হয় নাই। আমি আমার এ মত প্রকাশ করিতেছি কিছু সঙ্কোচের সঙ্গে, কারণ এ বিষয়টি লইয়া আমি চর্চা করি নাই, তাই এ বিষয়ে আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তবু আমি মত প্রকাশ করিতেছি এজন্য যে ইংল্যাণ্ডের কোনও কৃতিত্ব আর কেহ স্বীকার করেন নাই।

আগের দিনে দেশের টাকা বৃহৎ শহরে গিয়া জমা হইত, যেমন দিল্লী এবং লখনৌতে, এবং সবই সেই সব স্থানের রাজদরবারে অতি জাঁকজমকের সঙ্গে খরচ করা হইত, লোকে ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখিয়া অবাক হইত। সে এক আজব দৃশ্য। ময়ূর সিংহাসনে মোঘল সম্রাটের সম্মুখে প্রধান মন্ত্রী সাষ্টাঙ্গ প্রণত, চারিদিকে যুক্ত করে পারিষদবর্গ দণ্ডায়মান, জল্লাদ তাহার কুঠার লইয়া বাম পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে। এই সব ঐশ্বর্য বিলাসের কথা বর্ণনা পওয়া যায়, কিন্তু ইতিহাসে তাহাদের কথা নাই কেন, যে-সব কোটি কোটি লোক জমি চাষ করিয়াছে, ফসলের বীজ বুনিয়াছে, শস্য ঘরে তুলিয়াছে, কিন্তু চিরকাল অনাহারে শীর্ণ হইয়াছে? ইংরেজরা এদেশে আসিবার পূর্বে এইসব কোটি কোটি নরনারী বেশি বস্ত্র পরিত কি না, গৃহপালিত পশু তাহাদের বেশি ছিল কি না, গায়ে বেশি সোনা পরিত কি না। আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি যে, কৃষকের খামার বাড়িতে বেশি শস্য থাকিত, কিন্তু তথাপি মুসলমান ঐতিহাসিকেরা, গত মাদ্রাজ দুর্ভিক্ষে মানুষের যে দুদর্শা হইয়াছিল এবং যে অবস্থায় তখন মৃত মানুষের মাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তেমনি বীভৎস দুর্ভিক্ষের কথা বারবার বলিয়াছেন কেন? গত শতাব্দীর ভারতীয় কৃষক জীবনের হলওয়েল, ভেরলেস্ট ও কর্তৃপক্ষের বর্ণিত চিত্র, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বাকি বাংলার সুখী মানুষদের সম্পর্কে তাঁহার বিখ্যাত প্রশংসাপূর্ণ কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আমি দেখিয়াছি। এ সব পেন্টারদের হাত ভাবাবেগে চালিত হইয়াছিল, এবং সেজন্য তাঁহাদের চিত্র অতিরঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহারা মোটামুটি একটা সচ্ছলতা দেখিয়া থাকিবেন, যাহা তাঁহাদের দেশের সর্বত্র দরিদ্রদের যে দুর্দশা দেখিয়াছেন তাহার তুলনায় অনেক ভাল মনে হইয়াছে। তবু আমি বলিতে বাধ্য যে তাঁহাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান অগভীর। অন্ততঃ সে জ্ঞান সমুদ্র উপকূলের ভূভাগেই সীমাবদ্ধ। এই সব অঞ্চলের ভূমির উর্বরতা বেশি, চাষ করিবার লোকও বেশি। উচ্চ ভূভাগে কৃষিদের রক্তশোষণকারীরা এখানে ততটা সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু তথাপি একটি মাত্র ফসলের অজন্মায় ১৭৭০ সনে যে হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া গেল তাহার একটি মাত্র

মারাত্মক আঘাতে বাংলাদেশের সমস্ত জনসংখ্যার একতৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়া গেল। এখনও প্রমাণিত হয় নাই যে, এখন অপেক্ষা আগের দিনে লোকে সুখে ছিল, এবং এখন তাহাদের শস্য-ক্রয় ক্ষমতা যত বাড়িয়াছে তাহার চেয়ে শস্য পূর্বে বেশি ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আগের দিন সম্পর্কে আমাদের নির্ভরযোগ্য কোনও লিখিত বিবরণ বা দলিল নাই। ইহাও দুর্ভাগ্যের বিষয়, উপরের শ্রেণীর কয়েকজন ব্যক্তিই যে জাতি নহে এ শিক্ষা আমাদের হয় নাই এবং আমরা ভাবিতে শিখি নাই যে, উচ্চ বা নিচ সকল স্তরের প্রত্যেকটি ব্যক্তি জাতির এক একটি একক উপকরণ। জাতীয় সম্পদ এখন পূর্বাপেক্ষা বেশি সকলের ভিতর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই ইহা আমরা এখন দেখিতে পাই না। তবু অধিকাংশ ইউরোপীয় জাতির তুলনায় আমরা এখনও অনেক বেশি দরিদ্র। এবং ইহার কারণ, যেমন বলা হইয়া থাকে ইংরেজ সরকার আমাদের সোনা রূপা দেশে লইয়া যাইতেছে বলিয়া, তাহা নহে। ইহার কারণ খুঁজিতে হইবে অধঃপতিত এবং স্থবিরত্ব-প্রাপ্ত জাতীয় চরিত্রের মধ্যে। যদি জনপ্রতি বাণিজ্যমূল্য ধার্য দ্বারা কোনও জাতির বস্তুসম্পদের মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে অন্য জাতির তুলনায় তাহা বিস্ময়কর রূপে কম। ভারতীয় গড় বাণিজ্যমূল্য জনপ্রতি মাত্র ১২ শিলিং, ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের ৩৫০ শিলিং, ফ্রান্সের ১৬৮ শিলিং, জার্মানির ১৪৫ শিলিং এবং ইউনাইটেড স্টেট্সের ১০৫ শিলিং। বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের হিসাবটা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।

পরিমাণ বৃদ্ধির উপায় এখন আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত উৎপাদনের উৎকর্ষ এবং মূল্য। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে আমাদের দেশে যেটুকু উৎপন্ন হয়, তাহা অবুদ্ধিজাত অকৌশলী শ্রমের দ্বারা সাধিত হয়, এবং ইহার সাহায্যে জাতির উপার্জন বিচার করা হয়। আগে যাহা নিপুণ হাতের শ্রম ছিল, এখন তাহা অনিপুণ হাতের শ্রমে পরিণত হইয়াছে। সভ্য দেশসমূহে বিজ্ঞান, শিক্ষণ এবং নিপুণ হাতের শ্রমকে পালন করিবার জন্য আইনের দ্বারা যে-সব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, ভারতে এখনও তাহা প্রবেশ করে নাই। আমাদের দেশে গ্রামের কামার বা ছুতোর মিস্ত্রী এবং ক্ষেতের মজুরের মধ্যে বৈষয়িক অবস্থার কোনও পার্থক্য নাই। উভয় ক্ষেত্রেই এ কাজের জন্য যেটুকু শিক্ষা দরকার তাহা অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা মাত্র, এ কাজের জন্য বিশেষ বুদ্ধিরও দরকার নাই, অর্থব্যয়েরও দরকার নাই, এবং ইহা দ্বারা যাহা উপার্জন হয় তাহা দৈহিক শ্রমের মূল্য মাত্র। আমরা যাহা চাই তাহা হইতেছে—শ্রমের যথার্থ মূল্য এবং বুদ্ধিকৌশল ও ব্যয়সাধ্য শিক্ষা দিবার আয়োজন এবং বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইলে কাজ আরম্ভ করিবার জন্য কিছু মূলধন। দেহ ও মন ও তৎসহ কিছু মূলধন ব্যবহার করিয়া কিভাবে অধিক উপার্জন করা যায় সেই শিক্ষা লাভ করা বর্তমানে আমাদের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আগে যে সব কৃত্রিম বাধা বুদ্ধি ও শিক্ষার দ্বারা লাভজনক কাজ করার পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন তাহা কার্যতঃ দূর হইয়াছে। আগে বৃত্তিগত জাতিভেদ মান্য করা হইত, এখন তাহা দ্বারা গৌরব বিচার করিবার প্রথা দূর হইবার মুখে। এখন বৃত্তি যাহাই হউক, শিক্ষা ও

ঐশ্বর্য দ্বারাই গৌরব অগৌরব বিচার হইতেছে। আমরা পরিবর্তন-বিরোধী জাতি হইলেও ক্ষমতা লাভ ও আরাম ভোগের ইচ্ছা সব সময়েই আমাদের মনে ছিল, যেমন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মনে আছে। এই ইচ্ছাই সামাজিক বিধিকে উল্‌টাইয়া দেয়, যখনই সে মানুষের প্রবৃত্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার পথে বাধা সৃষ্টি করে। ঐশ্বর্য ও ক্ষমতাকে ঘৃণা করার শিক্ষা দেওয়া ধর্ম পৃথিবীকে যেভাবে ভণ্ড বানাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে। উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত মন আমার এই মন্তব্যে হাস্য করিবেন, কিন্তু আমি বাস্তব জগতের কথা বলিতেছি, আত্মিক উচ্চস্তরের মানস বিষয় নহে, কারণ বাস্তবের উর্ধ্বে তাহার বাস। ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে শাস্ত্রের আইন কঠোর, অথচ পরশুরাম তাঁহার কুঠারের সাহায্যে একুশবার উদ্ধত যোদ্ধা জাতিকে ধ্বংস করিয়াছেন—প্রতিবাদকারী স্ত্রীলোক বা শিশু কাহাকেও বাদ রাখেন নাই। অতঃপর দ্রোণের ন্যায় এক শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণ উত্তম অন্নবস্ত্রের বিনিময়ে অন্যায়ের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম উল্লেখিত ব্যক্তিকে দেবতা পদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে হিন্দুজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ বীরের সম্মান দেওয়া হইয়াছে। কেরানির কাজ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে হীন বৃত্তি, কিন্তু আজ হাজার হাজার ব্রাহ্মণকে কি করিতে দেখিতেছি? অন্যান্য অনেক নিষিদ্ধ বৃত্তির কথা আর তুলিয়া লাভ নাই। দেখা যাইতেছে গৌরব এখন তাহার উচ্চ আসন হইতে নিচে নামিয়া আসিয়াছে, এবং লাভজনক শ্রমের জন্য বুদ্ধি, শিক্ষা এবং মূলধন নিয়োগের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এদিকে মনোযোগ এখনও অতি অল্পই দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে দেশে যে সব আন্দোলন হইতেছে তাহার অধিকাংশই স্পষ্ট উদ্দেশ্যহীন। ভারতীয় চিত্ত যাহা অপ্রাপ্য, তাহাই পাইবার জন্য মাতিয়া উঠিতে ভালবাসে। যাঁহারা বলেন পাশ্চাত্ত্য চাকচিক্যের অগভীর আবরণের নিচে প্রাচ্য মনোভাবটিই আমাদের মধ্যে প্রবল ভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে, তাঁহারা কিছু অন্যায় বলেন না। আমাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য—অব্যবহিতের উর্দ্ধে দৃষ্টিপাতের অক্ষমতা। এই অবস্থায় কোনও জীবন্ত দেহ বাঁচিতে পারে না।

আমরা লাইসিয়াম থিয়েটারে গেলাম। সেখানে তখন "ফাউস্ট" অভিনীত হইতেছিল। মিস্টার হেনরি আরভিং নামক সুবিখ্যাত অভিনেতা মেফিস্টোফিলিসের ভূমিকায় এবং খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী মিস্ এলেন টেরি মার্গারেটের ভূমিকায় অভিনয় করিতেছিলেন। থিয়েটার গৃহটি অতি সুদৃশ্য, সম্মুখের দিকে কোরিনথিয়ান ভঙ্গির স্তম্ভ শ্রেণীর উপর গম্বুজ ও ছোট ছোট স্তম্ভ শ্রেণী। ভিতরটা সুন্দর ভাবে অলঙ্কৃত, পাকা শিল্পীর হাতের কাজ। এই গৃহে প্রায় পাঁচ হাজার লোক বসিতে পারে এবং প্রতি রাত্রির অভিনয়েই পূর্ণ গৃহ, সেখানে তিল ধারণের স্থান থাকে না। রাত্রি ৮টায় অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অভিনয়েই যে দরজা দিয়া পিটে পৌঁছাইতে হয় সে পথে ভিড়ের আতিশয্যে যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। এইভাবে সন্ধ্যা ৬টা হইতে দর্শকগণ সেখানে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে। হেনরি আরভিং ও এলেন টেরি—ও তৎসহ মঞ্চে যে সব দৃশ্যাদি দেখান হয় তাহার মনোহারিত্ব প্রতি অভিনয়ে এত দর্শককে আকর্ষণ করে। দৃশ্যপটগুলি প্রকৃতই বিস্ময়কর,

বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের জয় সূচিত করে তাহা। আগে যাহা অলৌকিক শক্তি ভিন্ন সম্ভব মনে করা যাইত না, তাহা এখন লৌকিক শক্তিতে সম্ভব হইয়াছে। সহস্র শিখা আগুনের মাঝখানে মেফিস্টোফিলিস বসিয়া আছে এবং আগুনকে সে তাহার সর্বাপেক্ষা বন্ধুভাবাপন্ন ভৃত্যের ন্যায় আদর করিতেছে। শয়তানের রন্ধনশালাগুলি দেখা যাইতেছে, সেখানে অভিশপ্ত কঙ্কাল প্রেতদেহগণ ঘৃণ্য বস্তু সকল পাক করিতেছে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে শয়তানের তরবারিতে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছে। জীবন্ত অগ্নিগিরি হইতে লাভা, জ্বলন্ত দ্রব্যাদি নির্গত হইতেছে। ডেভিল-নৃত্য। অবশেষে স্বর্গ হইতে দেবকন্যাদের আবির্ভাব ও তাহাদের মৃত মার্গারেটের দেহের উপর হস্ত বিস্তাব। সব চিত্তাকর্ষক। ড্রুরি লেন থিয়েটারে আমরা "হিউম্যান নেচার" (মানবচরিত্র) অভিনীত হইতে দেখিলাম। ইহার দৃশ্যে প্রাতঃকালীন সূর্যোদয়, রাত্রিতে পূর্ণ চন্দ্র, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বজ্রবিদ্যুৎ, সুদানের পর্বত, ট্র্যাফালগার স্কয়ার খুব সুন্দর ভাবে দেখান হইল, খুব স্বাভাবিক বলিযা বোধ হইল। শোনা গেল ফাউস্ট অভিনয়ের জন্য মঞ্চে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে মিস্টার আরভিং-এর কুড়ি হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। আলহামব্রা থিয়েটারে বহু নর্তকী একসঙ্গে নাচিতে দেখা গেল। মনে হয় সংখ্যায় তাহারা এক শতের অধিক হইবে। প্রকৃত সংখ্যা ভুলিয়া গিয়াছি। এটি রূপকথার জগৎ, ভৌতিক এবং চোখ ঝলসান, এ রকম আমি আর দেখি নাই। এই সময় থিয়েটারে "মিকাডো" অভিনীত হইতেছিল। আমার মনে হয় এটি ভারতীয়, থিয়েটারে ইহার পূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশিত হয় নাই। এটি অক্সফোর্ডেও দেখিলাম। কিন্তু লণ্ডনের ন্যায় চমৎকার হয় নাই।

প্রদর্শনীতে উপস্থিত ঔপনিবেশিক ও ভারতীয়দের জন্য ডিউক অভ বেডফোর্ড অনুগ্রহ পূর্বক পল্লী-অঞ্চলের কৃষি-সম্পর্কিত যাবতীয় দর্শনীয় দেখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন! ক্রলি খামার ও উওবার্ণ-এর গবেষণাক্ষেত্র দেখিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচরাল সোসাইটির অধীনে এইখানে বহুজাতীয় পরীক্ষার কাজ চলে। আমাদের এই ভ্রমণতালিকায় ডিউকের নিজস্ব খামার অ্যাবি, এবং উওবার্নে অবস্থিত তাঁহার পার্ক ও উদ্যান-সমূহ স্থান পাইয়াছিল। ২৩ শে জুন (১৮৮৬) বুধবার ডিউকের অতিথিগণ সহ একখানি স্পেশাল ট্রেন ইউস্টন স্টেশন হইতে ছাড়িয়া রিজমণ্ট অভিমুখে চলিল। সুদৃশ্য পল্লীনিসর্গ অতিক্রম করিয়া চলিলাম আমরা। দুধারে গ্রীষ্মকালীন সবুজ শয্যায় সূর্যের স্বর্ণরৌদ্র সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সে যেন বার্লি, স্ট্রবেরি, র‍্যাম্পবেরি, আপেল ও পিয়ারের স্বপ্নে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছে কবে ইহারা পাকিবে। কি সরল। তাপমূর্ছা কাহাকে বলে জানে না, মরোক্কো হইতে আরব পর্যন্ত যে তপ্ত হাওয়া মরু বালুকার পাহাড় উড়াইয়া প্রবাহিত হয়, যাহার হাত হইতে রক্ষা পইবার জন্য ক্যারাভানের উটেরা মাটিতে বসিয়া পড়ে, সেই 'সিমুম' কাহাকে বলে তাহাও জানে না। ভারতের সমতল জমিতে যে অগ্নিতপ্ত প্রচণ্ড বায়ু-প্রবাহ বহিয়া চলিতে চলিতে জমির ঘাস এবং গাছের পাতা পুড়াইয়া দেয়,

তাহাও জানে না। আর জানে না দীর্ঘ অনাবৃষ্টির কথা, যাহার ফলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, দেশটাকে মরুভূমি করিয়া তোলে।

ডিউক তাঁহার অতিথিদের সম্মানে তাঁহার অধীন কর্মরত লোকদের সেদিনের মত কর্মবিরতি ঘোষণা করিয়াছিলেন। আমাদের গমন-পথে বিপুল হর্ষধ্বনি। আমরা যত আমাদের গন্তব্যের কাছে আসিতে লাগিলাম, জনতা ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং হর্ষধ্বনি আরও প্রবল এবং উল্লাসপূর্ণ হইতে লাগিল। আমাদের জন্য গাড়ি প্রস্তুত ছিল। আমরা ক্রলি খামারে গিয়া পৌঁছিলাম, এবং সেখান হইতে গবেষণা-ক্ষেত্রে। কৃষি রসায়নে বিশেষ খ্যাত অ্যাগ্রিকালচরাল সোসাইটির সেক্রেটারি সেখানে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া যে-সব পরীক্ষা চলিতেছে, যে-সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে এবং সে-সবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর আমরা পার্কের ভিতর দিয়া পার্ক কৃষিক্ষেত্রে আসিলাম। এখানে বহু জাতীয় গো-মেষ ইত্যাদি পশু দেখিলাম, তাহারা দেখিতে খুব চমৎকার। আমরা ইতিমধ্যে ক্ষুধার্ত হইয়া পড়িয়াছি অতএব উওবার্ন অ্যাবির পশ্চিম দিকে আমাদের নামিতে বলা হইল, এইখানে খুব উৎকৃষ্ট ভোজনেব আয়োজন করা হইল। ডিউক নিজে এই অনুষ্ঠানের পুরোধা হইলেন এবং যথারীতি ভাষণও দেওয়া হইল। লাঞ্চের পরে মারকুইস অভ ট্যাভিস্টক (ডিউকের পুত্র) আমাদিগকে সব দেখাইলেন। অ্যাবিতে পারিবারিক অনেকের প্রতিকৃতি টাঙান আছে। কয়েকজন বিখ্যাত পেন্টারের হাতের প্রতিকৃতিও আছে। আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্যানে ভ্রমণ করিলাম, এবং ফ্লিউইকে স্পেশাল ট্রেনে উঠিয়া সাড়ে ছয়টার সময় লণ্ডনের সেন্ট প্যানক্রাস স্টেশনেব দিকে যাত্রা করিলাম। উওবার্নে যেভাবে গবেষণাদি চালান হইতেছে তাহা দেখিয়া আমি কিন্তু নিরাশ হইয়াছি। নিখুঁত পদ্ধতি ইংল্যাণ্ডেই দেখিতে আশা করি। সেখানে মানুষের বুদ্ধি উদ্যম অভিজ্ঞতা সমস্তই প্রয়োগ করা হয়, এবং সর্বদা উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। কৃষিতেও তাহাই। তথাপি উওবার্নে যে-সব বর্ণনা আমি নীরবে শুনিলাম তাহাতে বোধ হইল গোড়াতেই গুরুতর ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। কৃষিকার্যে গবেষণা বা নানা জাতীয় পরীক্ষায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, অবিশ্রান্ত উদ্যোগ এবং ধৈর্য দরকার হয়, ইহা এই গবেষণার দুর্ভাগ্যই বলা চলে। কারণ একমাত্র এইসব গুণের বিচার-বিবেচনা প্রসূত প্রযুক্তি দ্বারাই ভিত্তি প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া তবে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্য কার্যফল ফলান সম্ভব হয়। কিন্তু কার্যতঃ পূর্বগঠিত মতকে প্রমাণ করিবার জন্য সব সময়েই তাড়াহুড়া করিয়া পরীক্ষা চালান হয়। প্রথমেই যে একটি নির্ভরযোগ্য ভিত্তি গড়িয়া লইতে হয়, সে কথাটা ইঁহারা ভুলিয়া যান। ইহাতে ফললাভ মনোমত হয় না, শেষে যত দোষ পড়ে আবহাওয়ার ঘাড়ে। কৃষি বিষয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা করিতে হইলে সব একসঙ্গে তালগোল না পাকাইয়া আমার মতে দুইটি স্পষ্ট এবং পৃথক কর্মধারা অনুসরণ করা উচিত। প্রাথমিক কর্তব্য, যাহাকে আমি মূল ভিত্তি বলিয়া অভিহিত

করিয়াছি, তাহা হইতেছে যে-সব ক্ষেত্রে নানাভাবে পরীক্ষা চালান হইবে সেগুলিকে আগাগোড়া একই রকম করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। জমিতে জমিতে কোনও দিক দিয়া কোনও পার্থক্য যেন না থাকে। যদি দুই একর জমিতে সাব দিতে হয়, একটিতে গোবর সার, অন্যটিতে খৈলের সার, যাহা দ্বারা দুইটি ক্ষেত্রেই গম বুনিয়া দুইটি সারের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে, তাহা হইলে এই দুই সারের পার্থক্য ব্যতীত ঐ দুইটি ক্ষেত্রে যেন অন্য কোনও দিক দিয়া অবস্থার কোনও পার্থক্য না থাকে। জমি ও পারিপার্শ্বিকের দিক দিয়া যেন দুইটি ক্ষেতই সম্পূর্ণ এক অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ দুই জাতীয় সারের ক্রিয়ার যে পার্থক্য দেখা যাইবে, সেই পার্থক্য সৃষ্টির মূলে যেন অন্য কোনও কারণ বিদ্যমান না থাকে। তাহা হইলে সারের উৎকর্ষ বিচার সম্ভব। পরীক্ষাকারীদের এ বিষয়ে স্থূল ধারণা কিছু আছে, কিন্তু জমিতে কোনও পার্থক্য ছিল না, তাহা প্রমাণ করিবাব মত ধৈর্য তাঁহাদের নাই।

আমাদের সাধারণ বিচারে জমি ও অন্যান্য অবস্থা সম্পূর্ণ এক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের হিসাবের বাহিরে থাকিয়া যায় যাহা প্রমাণ ব্যতিরেকে বুঝা যায় না, এবং তাহা করিয়া, নানাভাবে পরীক্ষাদি করিয়া তবে তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। আমি এ বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত যে, দুইটি জমি সম্পূর্ণ এক হইলেও বিনা সাবে তাহাতে শস্য ফলাইলে তথাপি দুই ফসলের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকিবে। দুই বকম সাবেব তুলনামূলক গুণ বুঝিতে হইলে সার দিবার পূর্বে ঐ দুই জমির উৎপাদনে যে পার্থক্য দেখা দিবে তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া তবে সারের পরীক্ষা করিতে হইবে। এবং কয়েক বৎসব ধরিয়া, আবহাওয়ার নানা প্রভাব হইতে জমিকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে হইবে। জমিতে শস্য কিছুদূর পর্যন্ত বাড়িবার এক সপ্তাহ আগে বা পরে এক পশলা বৃষ্টি হইলে ফসলের পরিমাণে অনেক পার্থক্য ঘটে। ইংল্যাণ্ডের লোকদের পক্ষে বিজ্ঞানের পূর্ণ সাহায্য পাওযা সম্ভব, সেখানে তাহাদের হাতে অনেক উপায় আছে, ইচ্ছা আছে, সেখানে তাহারা কাঁচ-ঘরে অ্যারিকা পাম জন্মাইতে পারে, সুতরাং তাহাদের পক্ষে সেখানে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া পরীক্ষার জমিতে একই উত্তাপ ও আর্দ্রতা বজায় রাখা অসম্ভব নহে। এ সব বিষয়ে যাঁহারা আমার অপেক্ষা অনেক বেশি জ্ঞানী তাঁহাদের কাজের সমালোচনা করা আমার পক্ষে অবশ্যই দুঃসাহস সন্দেহ নাই, কিন্তু উওবার্নের পরীক্ষার ফলাফল দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, পরীক্ষার প্রাথমিক শর্ত পালন করা হয় নাই। খোসাছাড়ানো কটন-কেক ও মেইজ-মীলের সারের তুলনামূলক পরীক্ষা সেজন্য ঠিকমত হয় নাই। অজ্ঞ চাষীরা জানে, মেইজ-মীলের সারের অপেক্ষা কটন-কেকের সার অনেক উৎকৃষ্ট। প্রথমটির দাম প্রতি টন এক পাউণ্ড পাঁচ শিলিং এক পেনি, দ্বিতীয়টির দাম প্রতি টন পাঁচ পাউণ্ড তেরো শিলিং। অতএব যে দুটি ক্ষেতে দুই রকম সার ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ফলে কটন-কেক ব্যবহৃত ক্ষেতে অনেক ভাল ফসল উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল। পরীক্ষা নয় বৎসর ধরিয়া চলিয়াছে—১৮৭০ হইতে ১৮৮৫ সন পর্যন্ত। উদ্দেশ্য ছিল কটন-কেকের উৎকর্ষ প্রমাণ

করা। কিন্তু এতদিন পরীক্ষা চালাইয়াও তাহা প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই। পরীক্ষাকারীগণ ইহাতে বিস্মিত। ইহার পর তাঁহারা ইহার কারণ জানিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বলেন, “এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণ খুঁজিতে গিয়া অনুমান করা হইল, এবং অনুমান করিবার যথেষ্ট প্রমাণও মিলিল যে, জমিতে সারের পরিমাণ অতিরিক্ত হওয়াতে এবং ইহার ফলে নাইট্রোজেন অধিক জমিয়া যাওয়াতে সর্বোচ্চ পরিমাণ যে ফসল পাওয়া গিয়াছে তা মেইল-মীলের সারের দরুন অথবা কৃত্রিম বিকল্প সারের দরুন, অতএব অধিক শক্তিসম্পন্ন কটন-কেকের সার তাহার শ্রেষ্ঠতা দেখাইতে পারে নাই।” অতএব দেখা যাইতেছে দুই জাতীয় সারের তুলনামূলক বিচার হইতে ইহাদের কার কি মূল্য তা যদি ঠিকমত জানা না হয়, তাহা হইলে উওবার্ন খামারের গবেষণা হইতে কি সিদ্ধান্ত করা যাইবে? এই অস্বাভাবিক এবং ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত যে, মেইজমীল সার কোনো মতেই কটন-কেক সার হইতে হীন নহে, যদি নয় বৎসরের পরীক্ষার পরে করা হয়, এবং তাহা ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচরাল সোসাইটির অধীন পরিচালিত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে প্রশংসা করা চলে না। আবার, সার দেওয়া হয় নাই এমন জমিতে বৎসরের পর বৎসর চাষ করিয়া যে গম পাওয়া গেল, তাহা হইতেও প্রমাণ করা যায় যে আবহাওয়ার বদল নিয়ন্ত্রণ না করিলে বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। দেখা যাইতেছে এক একর বিনা সারী জমিতে ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ পর্যন্ত এইরূপ ফসল ফলিয়াছিল ঃ ১৮৭৭—২২.৫ বুশেল। ১৮৭৮—১৫.৮ বুশেল। ১৮৭৯—১০.১ বুশেল। ১৮৮০—৯.৬ বুশেল। ১৮৮১—২৫.৭ বুশেল। ১৮৮২—১২ বুশেল। ১৮৮৩—১৬ বুশেল। ১৮৮৪—২৩ বুশেল। ১৮৮৫—২১.২ বুশেল। ১৮৭৭ হইতে ১৮৮০ পর্যন্ত পরিমাণ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কারণ বুঝা যাইতেছে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অবিরাম চাষে ক্রমে কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহার পর ফসলের পরিমাণ একলাফে হঠাৎ বাড়িয়া গেল, এবং তাহার পর হ্রাসবৃদ্ধি অনিয়মিত। শস্যও ক্রমে পরিপুষ্টি হারাইয়াছে। প্রথম বৎসরে বুশেল প্রতি ৬১.৮ পাউণ্ড দানা পাওয়া গিয়াছে। এবং যদিও এই পরিমাণ পরে খুব কমিয়াছে বা বাড়িয়াছে, কিন্তু কখনও প্রথম বৎসরের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। ১৮৮৫ সনে ইহার পরিমাণ ছিল ৫২.২ পাউণ্ড। এই হ্রাসবৃদ্ধি কি আহবাওয়া পরিবর্তনে ঘটিয়াছে? তাহা হইলে বলি যে, ফলন যদি অন্য শক্তিশালী অথচ নিয়ন্ত্রণের বাহিরের কারণের উপর নির্ভরশীল হইয়া থাকে তাহা হইলে যাহা নিয়ন্ত্রণাধীন তাহার ঔৎকর্ষ প্রমাণ করা যাইবে কিরূপে? আমার পক্ষে বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাতের গবেষণা বিষয়ে এরূপ সমালোচনা করিতে আমি বেদনাবোধ করিতেছি, বিশেষ করিয়া আমি যখন ইঁহাদের নিমন্ত্রিত অতিথি। আমাদের দেশেও কৃষি গবেষণা হইয়া থাকে, এবং আশা করি তাহা শিক্ষা ও সুযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে করা হইবে, এবং ইহার মূল্যও সবাই ক্রমে অধিক উপলব্ধি করিবেন। অতএব ঐ গবেষণায় যেসব অসঙ্গতি ঘটিয়াছে তাহা দেখাইয়া দেওয়া আমি কর্তব্য মনে করিতেছি। যাহা হউক, বহু ত্রুটি সত্ত্বেও উওবার্ন ক্ষেত্রের গবেষণা হইতে অনেক কিছু জানিতে পারা

গিয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কৃত্রিম সার সম্পর্কে মূল্যবান অনেক তথ্য জানিতে পারা গিয়াছে। বিশেষ করিয়া অ্যামোনিয়াম সল্‌টগুলি বিষয়ে। ডিউক অভ বেডফোর্ড এইসব পরীক্ষার জন্য রয়্যাল অ্যাগ্রিকালচরাল সোসাইটির হাতে ১২৭ একর জমি ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমি এই পরীক্ষার ত্রুটি উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের অনেক সুবিধা আছে। যে পরীক্ষা যেখানে আরম্ভ হয়, পরবর্তী পুরুষও তাহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া চলে, কারণ প্রকৃতি তাহার যেসব তথ্য গোপন রাখিয়াছে তাহা উদ্‌ঘাটন কবা একটি জীবনে সম্ভব হইতে পারে না। এইরকম একজন উত্তর পুরুষ সার জন বেনেট লইস। তিনি কৃষি গবেষণার জনক। তাঁহার রটহ্যামস্টেডের পরীক্ষা-ক্ষেত্র আমি দেখি নাই। 'মার্কলেন এক্সপ্রেস'-এর মিস্টার ফোর্ড একবার আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আমি সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই।

বহু বিজ্ঞান-সেবীর নিকট কৃষির উন্নতি একটি "হবি" বা শৌখিন পেশা। সাধারণ মানুষ ইহা হাস্যকর মনে করিতে পারে, কিন্তু হবি সাধারণ মানুষের জন্য নহে। সাধারণ লোকের কোনও বিষয়ে টান বা আকর্ষণ থাকে, পছন্দ থাকে। ইউরোপ ও অ্যামেরিকা 'হবি' হইতে মহামূল্য সব আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাকে কেউ ইচ্ছা করিলে বিশেষ বৃত্তি বলিতে পারেন কিন্তু হবি ইহা হইতে পৃথক, এবং বড় জিনিস। ইহা কোনও বিষয়ে আন্তরিক এবং অক্লান্ত নিষ্ঠা এবং সেই বিষয়ে অতৃপ্তিকর আনন্দ উপভোগের ক্ষমতা, এবং ইহা এমন একটি অনুভূতি যাহা মস্তিষ্ক-বিকারের সীমা স্পর্শ করিয়া চলে, এবং ইহা হইতেই এমন সব আশ্চর্য আবিষ্কার হইয়াছে, আধুনিক অগ্রগতি যাহার কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী। আমাদের দেশে এমন "হবি" কোথাও দেখা যায় না। এবং তাহার প্রধান কারণ আমরা আপাততঃ মাঝারি শ্রেণীর মানুষ। আমাদের কোনও আবিষ্কার নাই, কোনও উদ্ভাবন নাই, পৃথিবী জোড়া কোনও খ্যাতি নাই। আমাদের "হবি"—ধর্ম। কখনও বা ইহা হবির চেয়েও অধিক, ইহা মস্তিষ্ক-বিকার। সুখের বিষয় সমাজ ধর্মীয় উন্মাদনাকে পূজা করে। আমরা দুর্বলজাতি বলিয়াই কি ধর্ম আমাদের "হবি"? কারণ, দেখা যায় প্রত্যেকটি দেশেই স্ত্রীজাতি, রুগ্ন, এবং পঙ্গু, ইহারা সর্বদাই খুব ধর্মীয় ভাবাপন্ন। প্রকৃতির এই ধাবা অনুসরণ করিয়া, প্রত্যেক দেশের এবং কালের শক্তিশালী ব্যক্তিগণ ধর্মীয় ভাবাপন্ন হইবার জন্য নিজদিগকে কৃত্রিম উপায়ে—অনশনে, অনুশোচনায়, দুর্বল করিয়া লইয়াছে। দৈহিক দুর্বলতা এবং মানসিক দুর্বলতা, দুইই ধর্মীয়ভাব লালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। স্বজনহারা ব্যক্তি, হতাশ ব্যক্তি, অত্যাচারিত ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম একটি সান্ত্বনাদানকারী আশ্রয়। বন্দী মণ্টি ক্রিস্টোর ক্ষত-হৃদয়ে ইহা সন্তাপনিবারণী প্রলেপের কাজ করিয়াছে সন্দেহ নাই, অথবা ভেনিসে ডোজদের (ডোজ = প্রধান বিচারক) প্রাসাদের ভূনিম্নস্থ কক্ষগুলির ভিতর দিয়া লইয়া যাইবার সময় গাইড যে মুমূর্ষু অনুতপ্ত হতভাগ্যের কাহিনী শুনাইতেছিল তাহার পক্ষে ধর্ম সান্ত্বনার কারণ। আমাদের দেশের বহু ব্যক্তি এইরূপ দেহমন ক্ষীণ করিয়া মনে ধর্মের প্রলেপ পুরা উপভোগের জন্য প্রস্তুত হয়। ইহাই তাহাদের হবি, ইহা ভিন্ন অন্য হবি তাহাদের

নাই। অধিকাংশই সংসারের চাপে অস্থির, অতএব ইহা ভিন্ন হবির কথা তাহাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব। ঈশ্বরের দিকে মন দেওয়া ভাল কাজ। কিন্তু বিকৃত রহস্যবাদের দিক হইতেই হউক অথবা উদ্দাম উন্মাদনার দিক হইতেই হউক—উভয় দিক হইতেই ধর্ম মস্তিষ্ক-বিকারে পরিণত হয়। এই দুই জাতীয় মস্তিষ্ক-বিকারের মধ্যে শেষেরটি আমার পছন্দ।

কাউণ্টেস অভ রোজবেরি, ফরেন অফিসের নিকটস্থ তাঁহার লণ্ডনস্থ গৃহে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য নিমন্ত্রণকারী—ডাচেস অভ ওয়েস্টমিনস্টার তাঁহার হাইড পার্ক সন্নিহিত গৃহে। মার্কুইস অভ হ্যাটফিল্ড ও ডিউক নর্দামবারল্যাণ্ড—সাইয়ন হাউসে, গার্ডেন পার্টিতে। ১৮৭৪ সন পর্যন্ত ডিউকের লণ্ডন বাস ছিল স্ট্রাণ্ডে নর্দামবারল্যাণ্ড হাউসে। পথ নূতনভাবে প্রস্তুতের জন্য ঐ গৃহটি ভাঙিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তিনি সাইয়ন হাউসে বাস করিতে থাকেন। এটি কিউ গার্ডেনস-এর কাছে, লণ্ডনের কাছেই কয়েক মাইল পশ্চিমে। নর্দামবারল্যাণ্ড হাউসের মাথায় একটি প্রস্তর-নির্মিত সিংহ ছিল, তাহা এক্ষণে সাইয়ন হাউসের মাথায় আনিয়া বসান হইয়াছে। এই সিংহ সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে, ইহা হইতে বুঝা যায় অন্ধবিশ্বাসী মানুষ পৃথিবীর সব স্থানেই আছে। একদা একটি লোক প্রচার করিয়াছিল, সে এই সিংহের ল্যাজ নাড়িতে দেখিয়াছে। শুনিবামাত্র সিংহের চতুর্দিকে বিরাট ভিড় হইল, সিংহ কখন আবার ল্যাজ নাড়ে তাহা দেখিবে। দূর-দূরান্তর হইতে লোক আসিয়াছিল। সমস্ত দিন ধরিয়া রাস্তায় এমন ভিড় জমিয়াছিল যে যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ গঠিত জন্তুটি সকলকেই সেদিন নিরাশ করিল। এমন কি বহু অপেরা গ্লাস এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের প্রভাবেও সে ল্যাজ একচুল নড়িল না। সাইয়ন হাউসের একটি ইতিহাস আছে। পূর্বে এটি পঞ্চম হেনরি প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ ছিল—ইহা সাইয়নের সেন্ট সেভিয়র ও সেন্ট ব্রিজেটের নামে উৎসর্গীকৃত ছিল। অষ্টম হেনরি এই সম্পত্তির অভিভাবকত্ব সমারসেটকে দান করেন, এবং তিনি ইহাকে প্রাসাদে পরিণত করেন। পরে এটি ডিউক অভ নর্দামবারল্যাণ্ডের অধীনে আসে। ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে এই স্থান হইতে লেডি জেন গ্রে টাওয়ার অভ লণ্ডনে গিয়া ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে তাঁহার দাবি পেশ করেন। এবং এই স্থান হইতেই, প্রথম চার্লস-এর শিরশ্ছেদের পূর্বে তাঁহার সন্তানদের সেন্ট জেমস প্যালেসে পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়।

এক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠান দেখিতে ক্যামব্রিজে গিয়াছিলাম। অনুষ্ঠানটি সার জর্জ বার্ডউড, সার এডওয়ার্ড বাক ও নরসিংগড়ের মহারাজাকে এল্‌এল্‌-ডি উপাধিদান উপলক্ষে। যাত্রার জন্য স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখানে পৌঁছানোর পর অভ্যর্থনা সমিতি আমাদের তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন। এই সমিতি টাউন কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ দ্বারা যুগ্মভাবে গঠিত হইয়াছিল। নানা দর্শনীয় দেখিবার পর আমরা ক্লান্ত বোধ করিলে আমাদিগকে গিল্‌ড হলে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে আমাদের সম্মানর্থে খুব চমৎকার ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল।

বিশ্ববিদালয়ের অনুষ্ঠান সেনেট হাউসে অপবাহ্নে আরম্ভ হইল। হাউসটি দেখিতে খুব সুন্দর, করিন্থিয়ান স্টাইলে নির্মিত স্তম্ভগুলির শীর্ষ বা ক্যাপিট্যাল রোমের জুপিটার মন্দিরের স্তম্ভশীর্ষ-এর অনুসরণে নির্মিত। সিলিং খুব উচ্চাঙ্গের অলঙ্করণে সজ্জিত এবং মেঝে কালো ও সাদা মার্বলে নির্মিত। মঞ্চে ভাইস চ্যানসেলর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যন্য সভ্যগণ উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা এই মঞ্চের পাশে আসন দখল করিলাম। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের সংখ্যা কয়েক শত হইবে, তাহারা উপরের গালারিতে বসিয়াছিল। এবং সেই উচ্চ স্থান হইতে তাহারা মঞ্চে উপবিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক মণ্ডলীর উদ্দেশে নানা রকম রসিকতা নিক্ষেপ করিতেছিল। এ সবই স্ফূর্তি ও কৌতুকের পরিচায়ক। উদ্দিষ্ট সকলেই ইহা সম-কৌতুকের সঙ্গেই গ্রহণ করিলেন। আমরা অনুষ্ঠানের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা এইটিই বেশি উপভোগ করিয়াছিলাম। প্রথমে ভাইস চ্যানসেলরের ভাষণ দ্বারা অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। তাহার পর যাঁহারা ডিগ্রী গ্রহণ করিবেন তাঁহারা একে একে মঞ্চে আনীত হইলেন। একজন প্রোফেসর ল্যাটিন ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন। ছাত্ররা মাঝেমাঝে নানা মন্তব্য করিয়া বাধা সৃষ্টি করিতেছিল, প্রোফেসরটিও হাসিমুখে তাহার জবাব দিতেছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতেই কৌশলে মুখ ফিরাইয়া জবাব দিতেছিলেন। যাহা শুনিলাম তাহার সব কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, মোটামুটি ভাবার্থটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বক্তৃতা শেষ হইলে সম্মানসূচক আচ্ছাদনে নূতন ডিগ্রীপ্রাপ্ত ডক্টরকে সজ্জিত করা হইল। অতঃপর তাঁহার স্থান দ্বিতীয় জন গ্রহণ করিলেন। তারপর তৃতীয় জন। এইভাবে অনুষ্ঠান শেষ হইল। কিন্তু ছাত্ররা এখনও তৃপ্ত নহে, তাহাদের ইচ্ছা আরও বক্তৃতা চলুক, কিন্তু সে ইচ্ছা তাহাদের পূরণ হইল না।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার দেখিতে গেলাম। এখানে চার লক্ষ ছয় হাজারের উপর গ্রন্থ আছে, উপরন্তু বহু পাণ্ডুলিপিও রক্ষিত হইয়াছে। ইহার পর কিং'স কলেজে গেলাম। ১৪৪১ সনে ষষ্ঠ হেনরি কর্তৃক এই কলেজটি স্থাপিত হয়। এখান হইতে আমরা একটি সুন্দর চ্যাপেলে গেলাম, তাহার সকল অংশের সকল বৈশিষ্ট্যগুলি শ্রদ্ধেয় গাইডগণ আমাদের দেখাইলেন। আমার সর্বাপেক্ষা ভাল লাগিল রঙীন কাঁচের জানালাগুলি, এগুলির উপর বাইবেলের কাহিনী চিত্রিত ছিল। এই চিত্রগুলি ১৫১৫ হইতে ১৫৩১ সনের মধ্যে নির্মিত। কিং'স কলেজ দেখিবার পর আমরা আরও দুইটি কলেজ পরিদর্শন করিলাম। ইহাদের একটির অঙ্গনের একটি গাছের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইল। শুনিলাম ইহা মিলটন কর্তৃক রোপিত হইয়াছিল। এই গাছ হইতে একটি পাতা ছিঁড়িয়া লইলাম।

মেসার্স র‍্যান্সম্‌স সিম্‌স অ্যাণ্ড জেফ্রিস আমাদিগকে ইপসউইচে অবস্থিত অরওয়েল কারখানা দেখিতে নিমন্ত্রণ জানাইলেন। এইখানে প্রতি বৎসর বহু কৃষি যন্ত্রাদি নির্মিত হয়, এবং এখান হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে রপ্তানি করা হয়। গ্রেট ইষ্টার্ণ রেলওয়ে আমাদের জন্য একখানা স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই ট্রেনে আমরা ইপসউইচের বিপরীত দিকে জিপিং নদীর তীরে অবস্থিত একটি স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অরওয়েল

ওয়ার্ক-এর একটি স্টীমারে আমরা নদী পার হইলাম। স্টীমারের ডেকে দাঁড়াইয়া আমরা ইপসউইচের অদূরে জার্মান সমুদ্র দেখিতে পাইতেছিলাম, সেখান হইতে সমুদ্র বারো মাইল দূরে। এখানে নানা দর্শনীয় স্থান দেখিলাম, ইপসউইচের এইসব বৈশিষ্ট্য বিষয়ে শহরের লোকেদের খুব গর্ব। গ্রেট ব্রিটেনের যেখানেই গিয়াছি, সেখানেই স্থানীয় লোকদের নিজ নিজ শহর বিষয়ে গর্বিত হইতে দেখিয়াছি। আমাদের কাছে তাহারা জিজ্ঞাসা করিয়াছে "শহরটি কেমন লাগিল?" ইহাতে অন্যায় কিছু নাই, কারণ নিজ নিজ স্থানের উন্নতির জন্য সে-সব স্থানের অধিবাসীরা নিজেদের ব্যক্তিগত কলহ থাকিলেও তাহা ভুলিয়া এক যোগে কাজ করে। টাউন হল, লাইব্রেরী, মিউজীয়াম এবং অন্যান্য স্থায়ী সর্বজনীন ব্যবহার্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য মোটা অর্থ দান করে। এমন কি ইপসউইচের ন্যায় ছোট শহরেও রেনেসাঁস ভঙ্গিতে নির্মিত একটি টাউন হল আছে, একটি মিউজীয়াম আছে। বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় আছে, একটি কর্ণ হল আছে, পাবলিক হল আছে। আর্ট গ্যালারি আছে, গবেষণার জন্য বৃক্ষোদ্যান আছে, যাত্রীদের জন্য ইনসটিট্যুট আছে, কর্মরত লোকদের জন্য কলেজ আছে। অন্যান্য দর্শনীয়ের মধ্যে Sparrowe's House নামক একটি প্রাচীন স্থাপত্য ভঙ্গির অট্টালিকা দেখিলাম। উর্সটারের যুদ্ধের পর দ্বিতীয় চার্লস এইখানে লুকাইয়া ছিলেন এবং এখানকার পাবলিক হাউস (মদের দোকান) ডিকেন্স-এর সৃষ্ট বিখ্যাত চরিত্র মিস্টার পিকউইকের নৈশ অভিযানের স্থান রূপে খ্যাত হইয়া রহিয়াছে। অতঃপর আমরা অরওয়েল কারখানা দেখিতে চলিলাম। অরওয়েল নদীর নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে। এখানে একটি ফাউনড্রি বা ঢালাইয়ের কারখানা আছে। এই কারখানাটি ওদেশের সর্ববৃহৎ আলো হাওয়ার ব্যবস্থাযুক্ত কারখানা। এখানে অবিরাম গলিত ধাতু পাত্রে বাহিত হইয়া ছাঁচে ঢালাই হইতেছে। প্রতি বৎসর এখানে লক্ষ লক্ষ লাঙলের ফলা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফাউনড্রি হইতে আমরা কামারের কারখানায় গেলাম। এখানে বহুসংখ্যক চুল্লি আছে, সেখানে লৌহ দণ্ড উত্তপ্ত করিয়া তাহা হইতে নানা হাতিয়ার নির্মিত হইতেছে। বাষ্প পরিচালিত শস্য মাড়াইয়ের যন্ত্র দেখিলাম, ইহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে খুব উপযোগী। কারখানার প্রতিনিধিগণ আমাদের জন্য উত্তম লাঞ্চের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা কে আমাদের বেশি খাতির করিবেন তাহা লইয়া প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন। মিস্টার জেফ্রিস, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানগণ বিশেষ ভাবে আমাদিগকে যত্ন করিতেছিলেন। কাশ্মীর রাজ্যের একজন বড় অফিসার তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিতেন, তাঁহার নাম মিস্টার আর. বি. মুখার্জি। কাশ্মীরের মহারাজা তাঁহাকে ওখানে পাঠাইয়াছিলেন কৃষি ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উদ্দেশ্যে। সবাই তাঁহার খুবই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং জেফ্রিস দম্পতি ও সন্তানগণ মিস্টার মুখার্জিকে তাঁহাদের শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদের ছোট্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার কথা তাঁহাকে কি জানাইব? সে বলিল, "Give my love to Mr. Mukherji."

গ্রেট ব্রিটেনের সকল বড় শহরই আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া কে কত বেশি আতিথেয়তা দেখাইতে পারে তাহার জন্য প্রতিযোগিতা চালাইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে ম্যানচেস্টারের আয়োজনকে অন্যতম সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণ এবং সুন্দর বলা চলে। এই নানা জাতীয় লক্ষ কর্মীর ভিড়ওয়ালা শহরের উৎপন্ন বস্ত্র পৃথিবীর নানা দেশে ব্যবহৃত হয়। অত্যাচারিত নাপিত রিচার্ড আর্করাইট (পরে সার রিচার্ড আর্করাইট) কিংবা ঘড়িনির্মাতা জন কে, কিংবা তন্তুবায় জেমস হারগ্রীভস কি কখনও ভাবিয়াছিলেন যে ওয়াটার ফ্রেম অথবা স্পিনিং জেনি একদিন পৃথিবীর তন্তুশিল্পে বিপ্লব আনিবে? এবং তাহার সাহায্যে ইংল্যাণ্ড অপরিমিত উপার্জন করিবে, এবং পৃথিবীর অনেক অংশে ইহা যুদ্ধেব, সম্পত্তি লাভের এবং ট্যাক্সের গৌণ কারণ হইবে? অথবা তাঁহারা কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহাদের ঐ সব আবিষ্কার, যাহা প্রথমে ভুল বোঝার ফলে লোকের নিকট আমল পায় নাই, তাহা হইতে পরে আনুষঙ্গিক অনক বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে, বিরাট বিরাট এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, যন্ত্রের কারখানা, বিস্তৃত ব্লীচিং প্রতিষ্ঠান এবং আরও কত অনুরূপ শিল্প উৎপাদন এজেন্সি গড়িয়া উঠিবে? অথচ এ সমস্তই সম্ভব হইয়াছে। আমি ত কখনও রিচার্ড আর্করাইট, অথবা জন কে অথবা হারগ্রীভ্‌স-এর মত ব্যক্তি দ্বিতীয় আর দেখি নাই। কিংবা তাঁহাদেরই মত অত্যাচারিত, তাঁহাদের একই পথের পথিক পূর্ববর্তীগণ—জন ওয়াইয়াট, লুই পল এবং টমাস হাইজ-এর মত ব্যক্তিও আর দেখি নাই। ইঁহাদের পরবর্তী শব্দহীন সূতাকাটা যন্ত্রের উদ্ভাবক ক্রম্পটন, কার্ডি মেশীনের উদ্ভাবক—ডায়ার, বাষ্পচালিত তাঁতের উদ্ভাবক ও উন্নত সংস্করণের প্রবর্তক—কার্টরাইট, শার্প রবার্টস এবং হরক্‌স, ড্রেসিং মেশীনের উদ্ভাবক জনসন ও র‍্যাডক্লিফ, অথবা কুমিং মেশীনের উদ্ভাবক জোশুয়া হাইলম্যান—ইঁহাদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। আমাদের ম্যানচেস্টারের নিমন্ত্রণকারী আমাদিগকে সর্বোৎকৃষ্ট হোটেলে রাজকীয় সম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন এবং কাপড়ের কলের সমস্ত বিভাগ দেখাইয়া আমাদরে মানসিক অনন্দ দান করিলেন।

এইভাবে একশত কুড়ি বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ ভূমিতে যে বীজ বপন করা হইয়াছিল তাহা ভিতরের দিকে দ্রুত মূল চালনা করিয়া বৃক্ষের পুষ্টি ও ফল ফলাইবার কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। ইহাতে ম্যানচেস্টার, ল্যাঙ্কাশিয়র এবং সমগ্র ব্রিটেনের পরম উপকার হইয়াছে, এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে পৃথিবীরও উপকার হইয়াছে। এই একই জাতি ঐ একই বীজ ভারতের জমিতেও বপন করিয়াছে, কিন্তু স্ট্রবেরির বীজ সাহারা মরুতে বপন করিলে যাহা হয়, ভারতেও তাহাই হইয়াছে। কেননা দুই দেশের জাতীয় চরিত্রে পার্থক্য রহিয়াছে। দশ হাজার স্পিণ্ডল বা টাকু যুক্ত কাপড়ের কল ও গ্রাম্য তাঁতে যে

পার্থক্য, প্রায় সেই পার্থক্য রেলওয়ে ট্রেন ও গোরুর গাড়ীতে। ইহা অতিশয়োক্তি হইতে পারে, তবু ইহা হইতে ব্রিটিশ ও ভারতীয় জাতির চরিত্রের মধ্যে যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহা মোটের উপর বুঝা যাইবে। স্বীকার করা আমার পক্ষে নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে তবু বলি, আজ যদি জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা চালিত সরকার গঠিত হয়, তাহা ব্রিটিশ জাতির সরকারের ন্যায় সফল হইবে ইহাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। নির্বাচনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে কি ধরনের লোককে তাহারা নির্বাচিত করিবে তাহাই ভাবি। যাহাই হউক, দেশের যে অবস্থা চলিতেছে, তাহা হইতে আমি অনুমান করি, বর্তমানে দেশের লোকের যে চরিত্র বা মনোভাব তাহাতে এই লোকদের ভিতর হইতে যাহাদিগকে ছাঁকিয়া আনিয়া নির্বাচিত করা হইবে, তাহারা ক্ষমতা হাতে পাইবামাত্র প্রথমেই গোহত্যা সমস্যা বিষয়ে প্রশ্ন তুলিবে।

গোহত্যা নিবারণ খুবই উত্তম কাজ সন্দেহ নাই। এবং ইহার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলিবারও নাই। পক্ষান্তরে একজন হিন্দুরূপে এবং ব্রাহ্মণরূপে, এবং বিশেষভাবে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের মনোভাবের প্রতি সম্মানবশতঃ, গোহত্যা নিবারিত হইলে আমি আনন্দিতই হইব, আরও আনন্দিত হইব, যদি মানুষের দ্বারা বা অন্য প্রাণী দ্বারা সকল প্রাণীহত্যা নিবারিত হয়, এবং সমস্ত বিশ্ব শান্তি, প্রীতি এবং শুভ ইচ্ছায় পূর্ণ হইয়া উঠে—কোথাও ঈর্ষা, যুদ্ধ, বেদনা, ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকে। কিন্তু ইহা ত জগৎকে আমার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইবার ইচ্ছা। বিচিত্র সার্থক, প্রশ্নের অতীত, সমালোচনার অতীত করিয়া মিলাইয়া দিবার উপযুক্ত কোনও কাটাছাঁটা পরিকল্পনা আমার নাই। সেজন্য আমি বিনীত ভাবে চিন্তা করিতেছি—এই গোরক্ষা আন্দোলন মাত্র আংশিকভাবে সফল হইতে পারে একমাত্র নীলগিরির সংখ্যালঘু টোডাদের মধ্যে। নীলগিরির টোডাদের প্রতি গোষ্ঠীপতির মৃত্যুতে তাহার বিদায়ী আত্মার সঙ্গে তাহারা বহুসংখ্যক মহিষ হত্যা করিয়া থাকে। এই প্রথার বিরুদ্ধে নীলগিরির কলেক্টর ব্যবস্থা অবলম্বন করাতে উহারা কিছু সংযত হইয়াছে, বলি দিবার জন্য মহিষের সংখ্যা কমাইয়াছে। অথবা যে জাতির মধ্যে এত চারণ ভূমি আছে যে গোরুর সংখ্যা সীমাহীন বৃদ্ধি পাইলেও কোনও অসুবিধা হইবে না, তাহাদের মধ্যে গোরক্ষা আন্দোলন সফল হইতে পারে। বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত হিন্দুজাতি চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়াইতেছে। এই হিন্দুজাতি তিন সহস্র বৎসর পূর্বের শৈশবে যাহা পাইবার জন্য কাঁদিত, সেই জাতি বৃদ্ধ হইয়াও সেই সব তুচ্ছ খেলনার জন্য কাঁদিতেছে, এ দৃশ্য কৌতুককর। কিন্তু তরুণ ভারতের পক্ষে সমকালের উপযুক্ত জিনিস চাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বর্তমান অবস্থায় আরও একটি জিনিস প্রয়োজন। অর্থাৎ সমস্ত দাবি এমন খোলাখুলি এক প্রকাশ্য ভিত্তির উপর স্থাপন করিতে হইবে যাহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিও বুঝিতে পারে যে, ইহার মধ্যে কোনও বিচারণ অথবা অসাধুতা প্রচ্ছন্ন নাই। গোরক্ষা আন্দোলন যে অর্থনৈতিক আবরণে ঢাকা হইয়াছে, যাহার সূতার দৈর্ঘ্য অনেক কিন্তু বয়ন ও বিন্যাস দৃঢ়তাহীন। গোরক্ষা প্রশ্নের গোড়াতেই একথা অনুমান করা অসম্ভব যে, সীমাহীন সংখ্যক গোরুর

জন্য সীমাহীন পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা চলিবে। পশুখাদ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, যে হারে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা না ভাবিয়া এবং যে হারে চাষের জমি কমিয়া যাইতেছে সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অরণ্য সম্পদ রক্ষার জন্য যেরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা হইতেছে তাহা বিবেচনা না করিয়াও একথা ভাবা যায় না, যে যত গোরু, তত খাদ্য মিলিবে। ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত মানুষকে বিদায় করিয়া সমস্ত মহাদেশটিকে শুধুমাত্র গোরুতে পূর্ণ করিয়া তুলিলেও যত গোরু, তত খাদ্য মিলিবে কল্পনা করা অসম্ভব। সম্ভবতঃ এ অসুবিধা দূর করা সম্ভব হইবে এই অনুমান করা হইয়াছে, কারণ দিনে দিনে অল্পাহারের দরুন কয়েক পুরুষের মধ্যেই জাপানীদের খেলনা-উদ্যানের গাছের মত গোরু ছাগলের চেহারা পাইবে এবং ছোটনাগপুরের উচ্চভূমিতে পাথরের মধ্যে খাদ্য সন্ধানরত বামনাকার পশুর ন্যায় ছোট হইয়া যাইবে। এই জাতীয় মোক্ষম যুক্তির সাহায্যে পশুখাদ্যের সামান্য অসুবিধার মীমাংসা করা হইয়া থাকিবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থা আরও তুচ্ছ কয়েকটি বিবেচনার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ঐ যুক্তির সাহায্যে দূর করা যাইতেছে না। যথা—গোরক্ষকদের যুক্তি অনুসারে অর্থনৈতিক দিক হইতে দুধের জন্য গোরু পালন করা অনেক বেশি লাভজনক, এবং ইহা তাঁহারা অঙ্ক কষিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যে ব্যক্তি কশাইখানায় গোরু বিক্রির জন্য লোকেদের উপর চাপ দেয়, তাহাকে কোন্ আইনে নিরস্ত করা যাইবে, সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। যদি বেশি লাভের জন্য দুধের গোরু রাখিতে হয়, তাহা হইলে যাহারা কম লাভে গোরু কশাইদের কাছে বিক্রি করে তাহারা অবশ্যই তাহা কাহারও চাপে পড়িয়া করে। নানা কারণে আগের অপেক্ষা গোরুর চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, তাহার স্থলে মহিষের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গোহত্যা আন্দোলন নিছক ধর্মীয় আন্দোলন, এবং ইহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করিতে হইবে। যে সব গ্রন্থে আমাদের পূর্বপুরুষদের গো হত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণের কথা আছে, সেই গ্রন্থের সেই অংশ বাদ দিতে হইবে, ব্যাখ্যার তোড়ে ভাসাইয়া দিতে হইবে, অথবা মিথ্যা অর্থ আরোপ করিতে হইবে, তাহার পর আমাদের গোমাংস বর্জিত ধর্মে, পৃথিবীর ১৩০ কোটি মানুষ—যাহারা এই মাংসকে বিধিসঙ্গতরূপে খাদ্য বলিয়া জানে, তাহাদিগকে দীক্ষা দিতে হইবে। যে আইনের পিছনে আশি হাজার ব্রিটিশ বেয়নেটের সমর্থন রহিয়াছে, ধর্মের নামে একটি খাদ্যাভ্যাসকে নিষিদ্ধ করিবার জন্য সেই আইনের সাহায্য প্রার্থনা করা বিপজ্জনক। ভিন্ন ধর্মীয় কোটি কোটি মানুষের কাছে গোমাংস অতৃপ্তিকর নহে। তাহাদেরও অনেক বিষয়ে দৃঢ় মত আছে। আমাদিগকে যাঁহারা শাসন করিতেছেন, তাঁহারা মূর্তিপূজাকে পাপ বলিয়া গণ্য করেন। এক ধর্মের মতে আত্মিক জগতের অতি গ্রীষ্ম মণ্ডলে প্রবেশ করিবার ছাড়পত্র ধূমপান। আবার এক ধর্মের মতে তেল চকচকে হৃষ্টপুষ্ট ব্রাহ্মণের হাতে একটি টাকা গুঁজিয়া দিলে স্বর্গে যাইবার পরিচয় পত্র মিলে। যদি অন্যের আচরিত প্রথা তোমার নিকট পাপ বলিয়া গণ্য হয় তবে তাহা আইনের সাহায্যে জোর করিয়া বন্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত কর, তাহা হইলে তোমার কোনও

আচরিত প্রথাকে তাহাদের কাছে পাপ মনে হইলে তাহারা যদি তাহা বন্ধ করিতে চাহে, তাহা হইলে তুমি আপত্তি করিবে কি? এই গোরক্ষা আন্দোলন বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই গত শতাব্দীতে দিল্লীর সাম্রাজ্য যখন ভিত্তিসমেত কাঁপিতেছিল, ভাঙিয়া পড়িবার দেরি নাই, তখনও সম্রাট বাহাদুর শাহ উদয়পুরের রাণা অজিত সিংহের বিরুদ্ধে যে সব কারণে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এই গোহত্যার বিষয় তাহার অন্যতম।

জাতীয় মন কোন্ দিকে বহিতেছে সেই দিকটি দেখাইবার জন্যই এই সব প্রসঙ্গের অবতারণা করিলাম। আমাদের দেশের লোকদের যদি নিজেদের পরিচালনাধীন ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে চীনারা তাহাদের রেলওয়ে লইয়া যাহা করিয়াছিল, তাহারাও যদি তাহাই করে তবে আমি বিস্মিত হইব না। আমাদের শিক্ষিত দেশপ্রেমীরা আমাকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, "রেলওয়ে টেলিগ্রাফ না থাকিলেও আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি সুখে ছিলেন না?" আসল কথা আমরা অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞ, অথবা অতীতকে ভুলিয়া গিয়াছি, বর্তমান সম্বন্ধে অসতর্ক এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অন্ধ। কেহ আমাকে বুঝাইয়া দিবেন কি যে, আমরা যে মাটির উপর বাস করিতেছি, যে বাতাস নাকে টানিতেছি, যে আহার আমরা গ্রহণ করিতেছি, যে জল আমরা পান করিতেছি, তাহার প্রত্যেকটিতে কি পরিমাণ মরফিয়া মিশান আছে? কারণ আমরা যে এই পৃথিবীকে একটি স্বপ্ন জগৎ করিয়া লইয়া তাহাতে ছায়ামূর্তির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। মানুষের অগ্রগতির গ্রন্থে আমরা যদি আধুনিকের স্থান লাভ করিতে চাহি, তাহা হইলে প্রথমেই আমাদের জাতীয় চরিত্র বদলাইতে হইবে। ইহার উন্নতিসাধন করিতে হইবে। তাহা যদি না করিতে পারি, তবে একটি গভর্মেন্ট আমাদের জাতি অপেক্ষা অন্ততঃ এক শত বৎসর অগ্রসর হইয়া আছে, তাহার সংস্কার সাধনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তাই আমি আশা করিতেছি আমাদের জাতীয় কংগ্রেস, আমাদের জাতিকে অজ্ঞতা, হীনতা, কুসংস্কার ও অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রথাগুলি হইতে উদ্ধার করিবার কাজে গভর্মেন্টকে সাহায্য করিবে। ব্রিটিশ জাতির সংস্পর্শে আসিবার ভাগ্য আমাদের দৈবাৎ ঘটিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে জাতিভেদ প্রথার জঘন্যতম রূপটি দেখিয়াছি। যদি অতীত ইতিহাসের উপর আরও স্পষ্ট আলো নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, বাহিরের একটার পর একটা আক্রমণের ফলে বংশের পর বংশ হীনচরিত্র হইয়া পড়িয়াছে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোটি কোটি মানুষকে কয়েকজন মাত্র উন্নত জাতির মানুষ শাসন করিতেছে, উন্নত উপায়ে, ন্যায়ের দ্বারা, বলপ্রয়োগের দ্বারা নহে, ইহা সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম, এবং ইহা ব্রিটিশগণ ভারতে সম্ভব করিয়াছে। এই উদার নীতি হইতেই কংগ্রেসের জন্ম হইয়াছে এবং স্বাভাবিক কারণেই। এবং সময় যখন আসিয়াছে, তখন ইহা "ন্যাশন্যাল কংগ্রেস" বা অন্য নামে টিকিয়া থাকিবে। ব্রিটিশ জাতির মধ্যে অবশ্য একটি সম্প্রদায় আছে, সে সম্প্রদায়ের লোকেরা ইংল্যাণ্ডকে স্পেন যেমন ছিল তেমন দেখিতে চাহেন। তাঁহারা ভারতকে ব্রিটিশের পদানত দেখিতে চাহেন। ইহার ক্ষতির দিকটি সম্পর্কে তাঁহারা অন্ধ। তাঁহাদের ইচ্ছা পূরণ হইবে না।

ম্যানচেষ্টার হইতে আমরা লিভারপুলে গেলাম। বাণিজ্যিক দিক হইতে লিভারপুল ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শহর। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, যখন ঔরংজেব দক্ষিণ ভারতে মারহাট্টাদের সঙ্গে সর্বনাশা যুদ্ধে রত, সে সময় লিভারপুল মাত্র একটি জেলেদের গ্রাম ছিল। এখন সেখান হইতে বৎসরে কুড়ি হাজার জাহাজ ছাড়িয়া পৃথিবীর নানা স্থানে যায়। ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আটলান্টিক পাড়ি দিয়া যে সব বাষ্পীয় পোত অ্যামেরিকায় যায়। এই জাহাজগুলির মালিক প্রধানতঃ 'কুনার্ড', 'ইনম্যান', হোয়াইটস্টার', 'ন্যাশন্যাল', 'গ্যিয়ন', 'অ্যাংকর', এবং 'অ্যালান' পরিবহন প্রতিষ্ঠান। যেসব স্থান আমরা পরিদর্শন করিলাম তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কোরিনথিয়ান স্থাপত্য স্টাইলের সেন্ট জর্জেস হল, ইহার কক্ষগুলি সুন্দরভাবে গ্র্যানিট, পোরফিরি এবং অন্যান্য দামী প্রস্তরে অলঙ্কৃত। ইহার গ্র্যান্ড হল্‌-এ আড়াই হাজার লোকের বসিবার স্থান আছে, একটি বৃহৎ অরগ্যান আছে তাহার পাইপের সংখ্যা আট হাজার। আমরা টাউন হল এবং এক্সচেঞ্জ বিলডিং-এও গিয়াছিলাম। লিভারপুলে একটি বড় লাইব্রেরি আছে, বিনা মাশুলে সকলেই এখানকার গ্রন্থ পাঠ করিতে পারে। একটি মিউজীয়াম আছে, ব্যক্তিগত দানে এটি গড়িয়া উঠিয়াছে। লাইব্রেরিতে দেড় লক্ষের বেশি বই আছে।

লিভারপুল হইতে আমরা বার্কেনহেডে উপস্থিত হইলাম। এই শহরটি মারসি নদীর অপর পারে। এই শতাব্দীর আরম্ভে এটি একশো জন অধিবাসীর একটি গ্রাম মাত্র ছিল, এখন এটি মস্ত বড় এক শহর। এখানে এখন বিস্তৃত ডকইয়ার্ডসমূহ নির্মিত হইয়াছে, বড় বড় জাহাজ প্রস্তুত হয় এখানে। ইহার বর্তমান লোকসংখ্যা সত্তর হাজার। শহরে এখন একটি মার্কেট হল, একটি মিউজিক হল, একটি ফ্রী লাইব্রেরি, একটি আর্ট স্কুল এবং একটি বড় পার্ক রহিয়াছে। লিভারপুল ও বার্কেনহেডের মধ্যে অবিরাম ফেরি স্টীমার যাতায়াত করে। আমরা অবশ্য সাম্প্রতিক নদীর নিম্নভাগ দিয়া নির্মিত টানেল পথে রেলগাড়িতে গিয়াছিলাম। আমার স্বদেশবাসী অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি টেমস নদীর সুরঙ্গ-পথ দেখিয়াছি কি না। পূর্বের দিনে ইহা লণ্ডনের অবশ্যই একটি দর্শনীয় জিনিস ছিল, কিন্তু এখন আর তাহা নাই, কারণ এখন ইহা অপেক্ষা অনেক বড় টানেল অধিকতর এঞ্জিনিয়ারিং নৈপুণ্যে গঠিত হইয়াছে। মারসি নদীর টানেল কত দীর্ঘ তাহা ঠিক বলিতে পারিব না, কিন্তু পার হইতে যতটা সময় লাগিয়াছিল তাহাতে মনে হয় এটি তিন হইতে চারি মাইল দীর্ঘ। নদীটি এইখানে খুব গভীর বলিয়া বোধ হয়, কারণ যেখানে রেল পাতা হইয়াছে, সেই স্তরে পৌঁছতে আমাদের লিফটটা কয়েক শত ফুট নিচে নামিয়াছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যদি টানেল নির্মাণের অধিকার পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেটি অন্য সব টানেলের গৌরব ম্লান করিতে পারিত। এখান হইতে পুনরায় লিভারপুল, তাহার পর চেস্টার, সেখানে ডিউক অভ ওয়েস্টমিনস্টারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ।

আমাদের শেষ দর্শনীয় স্থান—ব্রিস্টল, বাথ এবং ওয়েল্‌স। ব্রিস্টল লণ্ডন হইতে একশো আঠারো মাইল দূরে এবং রেলপথে মাত্র তিন ঘণ্টায় পৌঁছান যায়। আমরা ১৮৮৬

সনের ৬ই জুন ব্রিস্টলে আসিলাম। মেয়ার এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। অপরাহ্নে মার্চ্যান্টস হল-এ লাঞ্চ। নিমন্ত্রণকারী—মার্চ্যান্ট ভেনচারার্স। এই সমিতি মধ্যযুগের বণিক সমিতিগুলির অন্যতম। এগুলি এককালে ব্রিস্টলে স্থাপিত হইয়াছিল। কখন হইয়াছিল তাহা ঠিক জানা যায় না, কিন্তু যে সব রেকর্ড আছে তাহা হইতে দেখা যায় ১৪৬৭ সনে এই সমিতিটি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত এবং ১৫০০ সনে ইহার কার্যধারা ও পরিচালনা বিধি রচিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ ধনসম্পদ বৃদ্ধির মূলে এই সব সমিতি। কারণ ইহারাই সবকিছু হারাইবার ঝুঁকি লইয়া বিদেশে রপ্তানি বাণিজ্য চালাইয়াছিল। এবং সেই জন্যই ইহারা "ভেনচারার্স"। আমাদের দেশের সঙ্গেও ইহাদের পরিচয় আছে, কারণ তাহারা পূর্ব দেশে বাণিজ্য বিস্তারের জন্য আসিয়াছিল। ব্রিস্টলের "মার্চ্যান্ট ভেনচারার্স"-ও নিষ্ক্রিয় ছিল না। দলিল হইতে জানা যায়, ইহারা অবিরাম বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বিদেশ যাত্রা করিয়াছে। ইহারা ভার্জিনিয়া এবং নিউ ইংল্যাণ্ডে উপনিবেশ গড়িয়াছে। এই সমিতিই উত্তরপশ্চিম পথে ভারতে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ব্রিস্টলের বন্দরগুলি ইহারাই স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের জনক। অতিথিদের আপ্যায়ণ করা হইল ম্যানসন হল-এ। ব্রিস্টলের মেয়ার-পত্নী ক্লিফটনের ভিকটোরিয়া রুমস্-এ বল-নাচের আয়োজন করিয়াছিলেন। ম্যাড্রিগ্যাল কনসার্টেই আমরা খুব বেশি আনন্দ পাইয়াছিলাম। ইহা ব্রিস্টল ম্যাড্রিগ্যাল সোসাইটি কর্তৃক ব্রিস্টলে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ম্যাড্রিগ্যালের অর্থ প্রেমসঙ্গীত। ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র ইহার খ্যাতি আছে। লণ্ডন ম্যাড্রিগ্যাল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ১৮৪৩ সনে বলিয়াছিলেন, "If you want to know what a madrigal is, go to Bristol" ইহার পর নানা স্থান পরিদর্শন করিলাম, তন্মধ্যে উইলিস কম্পানির তামাকের কারখানা উল্লেখযোগ্য। সবই কলে হইতেছে, তামাক কাটা সিগারেট তৈয়ারি—সব। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে পাতা আনিয়া ইহারা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুত করিয়া লয়। দেখিয়া দুঃখ হইল যে, ইহারা ভারতবর্ষ হইতে কোনো তামাক পাতা লয় না।

প্রত্যেক ভারতীয়ের পক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা একটি ধর্মীয় কর্তব্য। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেদিন সেই ১৮৮৬ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর, আমি সেই সমাধির পাদদেশে জানু পাতিয়া বসিয়া প্রার্থনা জানাইলাম—'ঈশ্বর আমাদিগকে সত্যের পথ দেখাও, এবং আমি যাঁহার সমাধিক্ষেত্রে বসিয়া আছি, তিনি জীবনে যেরূপ করিয়াছেন তেমনি আমাদিগকে শক্তি দাও, মনের বল দাও যাহাতে তাঁহার ন্যায় সমস্ত জীবন সত্য পথে চলিতে পারি।" আমি ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা জানাইলাম, "যেন আমি কখনও ভীরু না হই।" আরও আমার মনে তখন যে-সব ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা আমি প্রকাশ করিতে পারিব না, আমার স্বদেশবাসীগণ তাহা অনুমান করিয়া লইবেন। আমি যখন এই ভাবে চিন্তামগ্ন ছিলাম, সেই সময় আমার নিকট এক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, তিনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষভাবে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন—রামমোহন রায়ের মৃত্যু বিষয়ে যাবতীয় দলিল তিনি আমাকে দেখাইবেন।

বর্তমান সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার দেহ লইয়া আসিবার বিবরণও তাহাতে দেখা যাইবে। আমি সে সব দেখিলাম। কিন্তু সেগুলির বিবরণ দেওয়া এখানে অনাবশ্যক, কারণ তাহা বাংলা বা ইংরেজী অনেক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমি ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম; শুধু বেদনাপূর্ণ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলাম, রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর আমরা আমাদের সমাজের বহু আবর্জনা দূর করিতে কতটুকু চেষ্টা করিয়াছি!

ব্রিস্টলে দুইজন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—তাঁহাদের নাম মিস্টার আর সি দত্ত এবং মিস্টার বি এল গুপ্ত। তাঁহারা সম্প্রতি নরওয়ে ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংল্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহারা নরওয়েতে ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা সেখানে দীর্ঘকাল অন্তহীন সূর্য দেখিয়াছেন। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার কৃষক সম্প্রদায় তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে আপ্যায়ণ করিয়াছেন; আতিথেয়তা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সে কথা সপ্রশংস ভাষায় বর্ণনা করিলেন।

একমাত্র ব্রিস্টলের অভ্যর্থনাতেই আমরা বাঙালী দেখিতে পাইলাম, অন্যত্র দেখি নাই। সরকারী গন্ধ যাহাতে আছে, অথবা রক্ষণশীলতার স্পর্শ আছে এমন অনুষ্ঠানাদি হইতে তাঁহারা দূরে থাকেন। নর্থব্রুক ইণ্ডিয়ান ক্লাবেও তাঁহাদের ভিড় করিতে দেখি নাই, অথচ ইংল্যাণ্ড প্রবাসী ভারতীয় এবং যাঁহারা পূর্বে ভারতে বাস করিয়াছেন তাঁহাদের জন্য ইহা স্থাপিত। ইংল্যাণ্ডের বাঙালীরা উদারপন্থীদের ক্লাবে যোগ দিয়া থাকেন। ইঁহারা উদারপন্থীদের দিকে ঝুঁকিয়াছেন কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। বাঙালী পাশ্চাত্ত্য জীবনধারা ও নীতি মোটামুটি আত্মস্থ করিয়াছে, সেজন্য শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য তাহার কাছে অরুচিকর। অতএব যাহারা বিশেষ শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাহার সুবিধাগুলি ভোগ করিতে চাহে, তাহাদের সে এড়াইয়া চলে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ফলে, স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু সমাজের যে উচ্চ বর্ণকে সে পূজা করিয়াছে, তাহাকে সে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, তাহার স্থলে অন্য পূজনীয়কে বসাইবার গরজও তাহার নাই। তাহার জিজ্ঞাসা, ভারতীয়রা ব্রিটিশ প্রজারূপে জন্ম-স্বাধীন কিনা? ব্রিটিশ নাগরিকের ন্যায় তাহাদের সমস্ত বিষয়ে অধিকার আছে কিনা? এ জন্য তাহাকে কেহ পছন্দ করে না। তাহাকে নিন্দা করা হয় এ কারণে যে, সে তাহার স্বাধীনতা ও মাসিক আট টাকা উপার্জনের বিনিময়ে কেন মাসিক সাত টাকা বেতনে বাহিরে যুদ্ধ করিবার জন্য সেনা হইতে চাহে না? আরও অনেক সত্য মিথ্যা কারণে সে নিন্দিত হয়, ইহাতে ব্রিটিশদের সুনাম আমাদের দেশে নষ্ট হইয়া থাকে। তাহার অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই, এবং সে দোষ ভারতীয় চরিত্রের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে, এবং এ দোষ অন্য নানা কারণে এবং পরিবেশের জন্য সমূলে দূর করা সম্ভব নহে। তথাপি বাঙালীকে ভারতের স্কটম্যান বলা হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা তাহাকে প্রশংসাই করা হয়। এ বিশেষণ তাহার নহে, কারণ স্কটম্যান যাহা করিবে ভাবে, তাহা সে করে। বাঙালী তাহার মত স্থিরবুদ্ধি এবং সকল কাজে দৃঢ়সঙ্কল্প নহে। স্কটম্যান চিন্তায় গুরুত্ব অর্পণ করে, কাজে গুরুত্ব অর্পণ করে। বাঙালী অনেক সময়েই গুরু চিন্তা করে, কিন্তু কাজ করে লঘু ভাবে।

সে আবেগ-সর্বস্ব এবং খেয়ালি। সে ভারতের শিশু ফ্রেঞ্চম্যান। সে সর্তক নহে, বিচক্ষণ নহে। কিন্তু সমস্ত দোষ সত্ত্বেও ভারতে উদার নীতি ও বাঙালীত্ব সমার্থক হইয়া দাঁড়াইতেছে। সে ইংল্যাণ্ডে যায় এই উদ্দেশ্যে যে, সেখানে তাহার উচ্চাকাঙক্ষা সমর্থক পাইবে। সেইজন্য ইংল্যাণ্ডে গিয়া এক দলের সঙ্গে মেশে, অন্য দলকে খুশি রাখিবার চেষ্টা করে না।

ব্রিস্টল হইতে আমরা বাথ নামক শহরে পৌঁছিলাম। খুব প্রাচীন ঐতিহ্য ও কাহিনী রচিত হইয়াছে ইহাকে ঘিরিয়া। অবশ্য ইহার প্রতিষ্ঠাতার নামের সঙ্গে কোনও দেবতার নাম যুক্ত হয় নাই, এবং স্বর্গের কোনও স্থপতিও আসিয়া নির্মাণ করিয়া যায় নাই, কারণ স্বর্গের স্থপতি বিশেষ অনুগ্রহভাজনের প্রতি কৃপাবশতঃ পৃথিবীতে অনেক নগর নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। একটি রাজপুত্র—নাম তাহার ব্রেডাড—কুষ্ঠাক্রান্ত হইয়া দুঃখে হতাশায় নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে আসিয়া পড়ে, এবং স্থানীয় এক কৃষিজীবীর শূকর পালনের কাজে নিযুক্ত হয়। শূকরদলও রাজপুত্রের নিকট হইতে এই মারাত্মক ব্যাধির স্পর্শ পায় এবং কুষ্ঠগ্রস্ত হইযা পড়ে। মালিকের ক্রোধের ভয়ে রাজপুত্র শূকরপালকে একটি সুন্দর উপত্যকায় চরাইতে লইয়া যায়। এখানে বহু উষ্ণ প্রস্রবণ একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমির সৃষ্টি করিয়াছিল। এই জলাভূমি দেখিয়া শূকরপাল তাহার ঈষদুষ্ণ জলে গিয়া গড়াইতে লাগিল। এবং রাজপুত্র সবিস্ময়ে দেখিল—শূকরদের কুষ্ঠ অল্পদিনের মধ্যেই মিলাইয়া গিয়াছে। বাজপুত্র আথেন্স শহরে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিল, অতএব তাহার মন ছিল যুক্তিপ্রিয়। সে গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিল, এই উষ্ণ প্রস্রবণের জল যদি শূকরের উপকারী হয়, তবে তাহা মানুষের পক্ষেও উপকারী হইবে। তাহার ভুল হয় নাই, কারণ সেও ইহাতে আরোগ্য লাভ করিল, এবং দেশে ফিরিয়া গেল। যথাসময়ে সে তাহার পিতার সিংহাসন লাভ করিল। পিতা ছিলেন ব্রিটেনের নৃপতি। রাজা হইয়া সে ঐ স্থানের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ সেইখানে একটি নগর নির্মাণ করিল। এই স্থানের অনেকগুলি বাথ বা স্নানাগারের মধ্যে কিংস বাথ কিং ব্রেডাড নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজার একটি মূর্তিও সেখানে আছে। তাহার সঙ্গে একটি লিপি খোদিত আছে—তাহাতে খ্রীষ্টপূর্ব ৮৬৩ বৎসর পূর্বে এই সকল স্নানাগার ঐ রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রোমানগণও এই স্থানের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অনেকগুলি মূল্যবান বাথ নির্মাণ করিয়াছিল। আমাদের ঐখানে যাইবার কিছু পূর্বে ৩৬ ফুট x ৫৫ ফুট আকারের একটি বাথ সমেত বৃহৎ হল খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছিল। গত শতাব্দীতে বাথ একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল। এখন ধনী সম্প্রদায় ইউরোপের মিনারাল ওয়াটার খনিজ লবণ পূর্ণ জলের প্রতি অধিক আকৃষ্ট। বাথের উষ্ণ প্রস্রবণ বর্তমান টাউন কর্পোরেশনের সম্পত্তি, এই কর্পোরেশন একটি গ্র্যাণ্ড পাম্প রুম নির্মাণ করিয়াছে, খরচ হইয়াছে, দশ হাজার পাউন্ড। এখানকার প্রস্রবণগুলি দৈনিক ৩৮৫০০০ গ্যালন জল দিয়া থাকে। তাপমাত্রা ১১৭° হইতে ১২০° ফারেনহাইট। এই জল গাউট, রিউম্যাটিজম, সায়াটিকা, নিউর‍্যালজিয়া, প্যারালিসিস, স্নায়ু দুর্বলতা ও চর্মরোগের পক্ষে

উপকারী। এই জল বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় ১১,০০০,০০ ভাগে ক্যালসিয়াম ৩৭৭, ম্যাগনেশিয়াম ৪৭.৪, পটাশিয়াম ৩৯.৫, সোডিয়াম ১২৯, লিথিয়াম নামমাত্র, আয়রণ ৫.১, সালফিউরিক অ্যাসিড ৮৬৯, কারবনিক অ্যাসিড (যুক্তভাবে) ৮৬, ক্লোরিন ২৮০, সিলিকা ৩০, স্ট্রনাশিয়াম নামমাত্র, অ্যালকালাইন সালফাইডস নামমাত্র, কারবনিক অ্যাসিড গ্যাস স্বাভাবিক তাপ ও চাপে —(প্রতি লিটারে কিউবিক সেন্টিমিটার) ৬৫.৩। মোট কঠিন পদার্থ এক লক্ষে ১৮৬৪ ভাগ। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ১.০০১৫। আমি এতটা বিস্তারিত ভাবে বলিতেছি এই উদ্দেশ্যে যে, যদি আমাদের দেশের কেহ ভারতীয় উষ্ণ প্রস্রবণগুলিকে জনপ্রিয় স্বাস্থ্যনিবাসের স্থানরূপে গড়িয়া তুলিতে চাহেন, তাহা হইলে এই তথ্যগুলি তাঁহার কাজে লাগিতে পারে। কারণ বাথের প্রস্রবণে প্রতি স্নানের জন্য ৬ পেনি হইতে ৩ শিলিং পর্যন্ত মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে। পানীয় রূপে এই জল প্রতি সপ্তাহে জনপ্রতি ১ শিলিং ৬ পেনি বিক্রয় করা হয়।

১৮৮৬ সনের আগষ্ট মাসে আমি স্কটল্যাণ্ডে গিয়াছিলাম সমুদ্রপথে, ফিরিলাম রেলপথে। লণ্ডন হইতে এডিনবরা ৩৯৭ মাইল দূরে অবস্থিত, রেলপথে নয় ঘণ্টা সময় লাগে। ২৫ শে আগষ্ট সেন্ট ক্যাথারিন নামক জাহাজঘাট হইতে 'পেংগুইন' জাহাজ ছাড়িয়া টেমস নদীর ঘোলা জল হইতে নর্থ সী-র নীল জলে গা ভাসাইল। সেখান হইতে সোজা লীথ অভিমুখে চলিল। বহুক্ষণ ধরিয়া আমরা স্থলভাগ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। শাদা রঙের খাড়া পাহাড়গুলি ঢেউ-এর অবিশ্রান্ত আঘাতে আঘাতে ভাঙিয়া গিয়াছে, কোথাও মসৃণ হইয়াছে, কোথাও দূর হইতে সবুজ ক্ষেত নামিয়া সমুদ্রের নীল জলের সঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে, গ্রাম ও শহর তাহাদের বাড়িঘরের উপরিভাগ ও গীর্জার চূড়াগুলি সমেত ছবির মত দেখাইতেছে। তরঙ্গিত ক্ষেতের উচ্চভূমি সমূহে শ্বেত বিন্দুবৎ গবাদি পশু চরিতেছে। সূর্যালোক উজ্জ্বল থাকাতে এসব দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। এই রৌদ্র ঢেউ-এর সঙ্গে খেলা করিতেছিল ও জাহাজের চালকযন্ত্রে অবিরাম শীকর উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহার উপর রৌদ্রালোক পড়িয়া রামধনুর পর রামধনু গড়িয়া চলিতেছিল। চন্দ্রালোক শোভিত রাত্রি পার হইয়া পরদিন দ্বিপ্রহরে আমরা ফার্থ অভ ফোর্থ অর্থাৎ ফোর্থ নদীর মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। নর্থ বেচউইকের কয়েকটি পাহাড়ী দ্বীপ অতিক্রম করিয়া গেলাম। একটি দ্বীপে পূর্বে এক সন্ন্যাসীর বাস ছিল। সে যুগে স্কটল্যাণ্ডে সন্ন্যাসীদের দেখা মিলিত। দ্বীপটির সবখানিই পাথর। এখানে শস্য জন্মাইবার উপায় নাই, তাই আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সন্ন্যাসীর আহার কি ছিল? প্রশ্নটি অবশ্যই অবান্তর, কারণ ধর্মীয় লোকেরা কি না করিতে পারে। ভারতীয় সন্ন্যাসীরা পাতা খাইয়া এবং গায়ে ভস্ম মাখিয়া জীবন ধারণ করিতে পারেন, শরশয্যায় আরামে নিদ্রা যান। সম্ভবতঃ স্কটল্যাণ্ডের এই সন্ন্যাসীটি সঙ্গে একজোড়া ছাগল আনিয়াছিলেন। লীথে যখন পৌঁছিলাম তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। স্থানটি এডিনবরা হইতে দুই মাইল দূরে। লীথ এডিনবরার বন্দর, এক্ষণে শহরের অংশ।

স্কটল্যাণ্ডবাসীদের পক্ষে এডিনবরা শহর বিষয়ে গর্বিত হওয়া স্বাভাবিক। অনেকগুলি শিলাময় পাহাড়ের সমন্বয় দিয়া আরম্ভ—

"Whose ridgy back heaves to the sky
Piled deep and massy, close and high"—

ক্রমে ঢালু হইতে হইতে উদ্ভিদপূর্ণ প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়া ফোর্থ নদীর মুখে নীল জলের সঙ্গে মিলিয়াছে, ইহাতে এডিনবরা শহরটি মানুষের হাতে গড়া শ্রেষ্ঠ চিত্রবৎ শহরগুলির অন্যতম হইয়াছে সন্দেহ নাই। কাস্‌ল পাহাড় অথবা সল্‌সবেরির খাড়া পাহাড় অথবা কার্লটন পাহাড়— যেখান হইতে দেখা যাউক না কেন, ইহার এমন একটি মোহময় সৌন্দর্য চোখে পড়িবে যা জীবনে ভুলিবার নহে। এডিনবরার অধিকাংশ দ্রষ্টব্য স্থান আমি দেখিলাম। প্রিন্সেস স্ট্রীটের আগাগোড়া ঘুরিলাম, প্রিন্সেস স্ট্রীট গার্ডেনস্‌-এর চারিপাশেও ঘুরিলাম। কাস্‌ল-ফিরিবার পথে সেন্ট জাইল্‌জের গথিক ক্যাথিড্রালটি দেখিলাম। নিকটেই কাউন্টি স্কয়ার, সেখানে পেভমেন্টের উপর পাথর বসাইয়া একটি চিত্রের হৃৎপিণ্ডের চেহারা দেওয়া হইয়াছে, সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে "হার্ট অভ মিডলোথিয়ান"। কাস্‌ল-এর ভিতরে আমাকে কুইন মেরির কক্ষ দেখান হইল, সেইখানে চতুর্থ জেমস্‌ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এইখান হইতে শিশু পুত্রটিকে ঝুড়িতে করিয়া খাড়া নিচে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, স্টার্লিং-এ পৌঁছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে। ক্রাউন রুমে রাজচিহ্নসমূহ রক্ষিত আছে। একটি প্রাচীন কামান আছে কাস্‌ল-এ, উহার নাম মন্‌জ মেগ, ৪৮৬ সনে ঢালাই করা। এইখান হইতে হাই স্ট্রীটের পথে হোলিরুডে আসিয়া পৌঁছিলাম।

রাজা প্রথম ডেভিড কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হোলিরুড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভাগ্যহীনা কুইন মেরির জীবনের ঘটনার সঙ্গে ইহা সম্পর্কিত বলিয়া ইহার পৃথক একটি মূল্য আছে। ১৫৬১ সনে ফ্রান্স হইতে ফিরিয়া তিনি এখানে বাস করিয়াছিলেন। লর্ড ডার্ণলির সঙ্গে এইখানে তাঁহার বিবাহ হয়। এইখানে ইটালীর রিৎসিও আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার গাউন চাপিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে নিহত হয়। কুখ্যাত বথওয়েলের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের পর এইখানে উৎসব পালিত হয়। এবং এইখানে তিনি তাঁহার নিজের প্রজাগণ কর্তৃক লকলেভেন কাস্‌ল-এ নীত হইবার পূর্বে বন্দী হন। সেই সব কক্ষ দেখিলাম যেখানে ডার্ণলি কুইন মেরিকে কাঁদাইয়াছিলেন, যেখানে রুথডেন রিৎসিওকে ছোরা মারিয়াছিলেন, এবং গাইড আমাকে এই স্থানে রক্তের চিহ্ন আছে তাহা দেখিতে বলিলেন। আমার দৃষ্টিশক্তি অবশ্য অতটা তীক্ষ্ণ ছিল না, তাই তিনশত বৎসর পূর্বেকার রক্তচিহ্ন আবিষ্কার করিতে পারিলাম না। ঐ সব রক্তাক্ত দিনের কথা শুনিতে শুনিতে মন অসুস্থ হইয়া পড়ে। আমার স্বদেশবাসীগণ ইউরোপীয়দের পাশবিকতা ও রক্তক্ষুধার নিন্দা করে। সন্দেহ নাই ন্যায় বিষয়ে বোধ ভারতীয়দের মনে বেশি আছে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার, বিজয়ক্ষুধা যে জাতির আছে, তাহাদের রক্তক্ষুধাও আছে। আমাদের মনের এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রশংসনীয় হইত যদি তাহার সঙ্গে আমাদের চরিত্রের অন্য দিকে মারাত্মক হীনতা না থাকিত।

আমাদের মনের ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি আমাদের দৈহিক দুবর্লতা প্রসূত। এবং মনের উচ্চ ভাবের জন্য দৈহিক দুর্বলতা ঘটে নাই। পূর্ণাঙ্গ মানুষের দেহ ও মন একই সঙ্গে পূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। তাহার হিংস্র বা অত্যাচারী হইবার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তাহার আত্মরক্ষার ক্ষমতা থাকা চাই। পৃথিবীতে সকলেই সৎ নহে। একজন বড় মানবতার শিক্ষক পৃথিবীকে এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, দক্ষিণ গণ্ডদেশে কেহ আঘাত করিলে তাহার দিকে বাম গণ্ডদেশটি ফিরাইবে। আমাদের শাস্ত্রও ক্ষমা সকল ধর্মের সার বলিয়াছেন। এসব উক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তবু সবিনয়ে আমার স্বদেশবাসীকে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণের হিন্দুদিগকে বলি, যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাদের মনের সকল স্বাধীনতা চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ চূর্ণ করিয়াছে, সমস্ত আত্মসম্মান বোধ চূর্ণ করিয়াছে, তাহাদিগের নিকট হইতে প্রত্যেকটি আঘাত যেন প্রত্যাঘাতের সাহায্যে তাহাদিগকে দেয়, উচ্চবর্ণের কোনও আঘাত যেন তাহারা নীরবে সহ্য না করে। এবং সে প্রত্যাঘাত দুর্বল হইলেও যেন দেওয়া হয়, তাহার পরিণাম গুরুতর হইলেও যেন দেওয়া হয়। বর্তমান পৃথিবীর যে অবস্থা তাহাতে পূর্ণ ক্ষমার নীতি অচল। ইহা পাপ, বিশেষ করিয়া ইহা যখন অন্যায়কারীর লোভ আরও বাড়াইয়া দেয়, এবং তাহাতে সমস্ত মানবতার ক্ষতি হয়। অতএব যাহাকে ইউরোপের পশুশক্তি বলা হয়, তাহা পৃথিবীর সুশাসনের জন্য যে গুণ আবশ্যক তাহারই একটি উন্মত্ত বিস্ফোরণ মাত্র। এই উন্মত্ত বিস্ফোরণ যখনই এবং যেখানেই ঘটুক তাহা দুঃখজনক, কিন্তু ইহার মূলে যে গুণ নিহিত আছে তাহা দুঃখজনক নহে।

হোলিরুডে মেরি কুইন অভ স্কটস এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যাবতীয় দর্শনীয় জিনিস ও কক্ষ সমূহ দেখিলাম। এডিনবরাতে যে সব জিনিস দেখিলাম তাহার মধ্যে সার ওয়ালটার স্কটের সম্মানে নির্মিত মনুমেন্টটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এডিনবরা হইতে আমি পার্থ-এ পৌঁছিলাম। রেলস্টেশনে ডক্টর ওয়াটের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সঙ্গে আরও দুইজন স্থানীয় ভদ্রলোক ছিলেন—মিস্টার ডান্‌সমোর ও মিস্টার হানি। মিস্টার ডান্‌সমোরের অতিথি হইয়া থাকিব এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। খুব খাতির যত্ন পাইলাম, ডান্‌সমোরের মাতা অন্য বাড়িতে থাকেন, তিনি আমাকে পৃথকভাবে আপ্যায়িত করিলেন। তিনি আগে কখনও ভারতীয় দেখেন নাই। আমাদের মতই ব্যবহার, কারণ তাঁহার ওখানে কিছু না খাইয়া তিনি আমাকে আসিতে দিলেন না। স্কচেরা বেশ মিশুক, সহজে অপরকে আত্মীয় করিয়া লইতে পারে।

পরদিন পূর্বে উল্লেখিত তিনজন ভদ্রলোক আমাকে লক লেভেনে লইয়া গেলেন। পার্থ হইতে কয়েক মাইল দূরে স্থানটি। সেখানে যাইবার উদ্দেশ্য মাছ ধরা, ট্রাউট মাছ। পরে মিস্টার ডান্‌সমোর নানা রকমের ছোট ছোট ঘটনার কথা শুনাইলেন। একটি উচ্চ ভূমির শীর্ষ দেশের দিকে দেখাইয়া বলিলেন, যখন তিনি আট দশ বৎসরের বালক, ঐ পাহাড়ের মাথায় একজন বিরাট পুরুষ বাস করিতেন, তাঁহার মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি। পঞ্জাব যুদ্ধের

একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার তিনি। ঐ উচ্চস্থানে তিনি তাঁহার ঘর বাঁধিয়াছিলেন। সেটি একটি প্রশস্ত বাংলো। চারিপাশের পাহাড় ও ছোট্ট নদীসমূহের তিনিই মালিক বলিয়া দাবি করিতেন। একদিন মিস্টার ডান্‌সমোর এবং এক বন্ধু, —বন্ধুটি তাঁহার সমবয়সী,—সেই পঞ্জাবের অফিসারের দাবি করা স্থানের একটি ছোট্ট নদীতে সামন মাছ ধরিবার জন্য গিয়াছিলেন। মাছ ধরায় মন দিয়াছেন এমন সময় বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "পাজি ছোকরারা, এইবার তোমাদের ধরিয়াছি, এবারে তোমাদের পুলিসের হাতে সমর্পণ করিব।" তিনি এই ধ্বনি শুনিয়া পিছনে চাহিয়া দেখেন লাল্‌প পর্বত এলাকায় যেমন বিরাট তুষার স্তূপ ধসিয়া পড়ে তেমনি প্রবল বেগে এক প্রকাণ্ড পাগড়ি পরা দৈত্য ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি ইহা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলেন, এবং কি করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার বন্ধু কিছু দূরে বসিয়াছিলেন, তিনি চকিতে সব বুঝিতে পারিয়া ছিপ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিলেন, "কি ব্যাপার, বব? লোকটি তোমাকে কি বলে?" বলিতে বলিতে আরও কাছে আসিয়া কোট খুলিয়া ফেলিল এবং আস্তিন গুটাইয়া বিশাল লোকটিকে লড়াই করিবার জন্য আহ্বান জানাইল। প্রবীণ ভদ্রলোক ইহাতে খুব কৌতুক অনুভব করিলেন, এবং অট্টহাস্যে ফাটিয়া পড়িলেন। তাহার পর দুটি লিলিপুশিয়ানকে বলিলেন, তোমাদের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়াছি, তোমরা এখন যাইতে পার। আমরা আমাদের দেশে এমন দুষ্টামি করি না, কারণ আমরা সুবোধ বালক। প্যারীচরণ সরকার, তাঁহার একখানি ছোটদের জন্য লেখা বইতে (Second Book of Reading) বলিয়াছেন, "A good boy never fight" —ভাল ছেলে কখনও লড়াই করে না। তাহার সঙ্গে আমি কি এই কথাটি যোগ করিতে পারি—"but sneaks away when a bad boy beats him?" —"এবং মন্দ ছেলে প্রহার করিলে কাপুরুষের মত পলাইয়া যায়।"

এইভাবে আমরা স্কুলের ছেলের মত চলিতে লাগিলাম। প্রশস্ত পথ, আমরা একখানি বোট লইয়া পাহাড় ডিঙাইয়া হ্রদের ধারে গিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে আমরা একখানি বোট লইয়া হ্রদের এক ধার হইতে আর এক ধার পর্যন্ত ট্রাউট মাছের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। লম্বা সূতার ছিপ ধরিয়া থাকা খুব সহজ ছিল না। মাছ ধরিবার অনেকগুলি কৌশল আছে, তাহা জানা ছিল না। অতএব আমি শান্তভাবে নৌকায় বসিয়া সঙ্গীর মাছ ধরা দেখিতে লাগিলাম। এবং ঐ সঙ্গে চপল লহরীর খেলা। ছোট ছোট তরঙ্গের প্রত্যেকটিতে ছোট ছোট একটি করিয়া সূর্য প্রতিবিম্বিত। নীল জলের বুকে সে দৃশ্য অপূর্ব সুন্দর। আমরা অবশেষে কয়েকটি ট্রাউট লইয়া ফিরিলাম। কুইন মেরি যে দ্বীপে বন্দী ছিলেন, তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল।

পরদিন রবিবার। মিস্টার ডান্‌সমোর আমাকে একা ফেলিয়া না রাখিয়া আমাকে তাঁহার সঙ্গে গীর্জায় লইয়া গেলেন। পথে একটি ছোট্ট প্রাচীন অট্টালিকা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, ঐখানে "ফেয়ার মেইড অভ পার্থ" বাস করিত। চার্চ হইতে ফিরিবার পথে আমরা কিন্‌নৌল পাহাড়ে গেলাম এবং যাইবার পথে ব্ল্যাকবেরি পাড়িতে পাড়িতে গেলাম।

"উইক্‌স অভ বেইগলি" নামক একটি স্থান হইতে পার্থ সুন্দর দেখায়। একটি লোক-প্রবাদ পার্থ শহর দুই ইঞ্চির মাঝখানে অবস্থিত। ইহার অর্থ—টে নদীর সংলগ্ন পার্থের দুটি ধারে নর্থ ইঞ্চ ও সাউথ ইঞ্চ নামক দুইটি ছোট উপভোগের স্থান আছে। নর্থ ইঞ্চ নামক স্থানটিই স্কটের "ফেয়ার মেইড অভ পার্থ" নামক উপন্যাসে বর্ণিত বিখ্যাত যুদ্ধের স্থান।

পার্থ হইতে পিটলরক্রিতে পৌঁছিলাম, হাইল্যাণ্ড রেলওয়ের একটি ছোট স্টেশন। এখান হইতে বিখ্যাত কিলি-ক্র্যাংকি নামক গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ব্লেয়ার অ্যাঠোল-এ গেলাম পদব্রজে, পর পর বহু বহু সঙ্কীর্ণ উপত্যকা, অরণ্য, গভীর গিরিখাত, নদী পার হইয়া যাইতে হইল। পর্বত-দৃশ্যকে এই সব জিনিস এক অপূর্ব বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

ব্লেয়ার অ্যাঠোলে তিনজন ভদ্রলোক গ্লেন টিল্‌টের পারে পদব্রজে ব্রিমারে লইয়া যাইবেন অনুরোধ জানাইলেন। আমি তাঁহাদের এই অনুরোধ ধন্যবাদের সহিত পালন করিলাম। কয়েক মাইল পথ গাড়ি চলার উপযুক্ত, আমরা এ পথের সুযোগ গ্রহণ করিলাম। পথের মাঝখানে দুইদিকে দুই পর্বতশ্রেণী, তাহার মধ্যবর্তী একটি সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় টিল্‌ট নদী। ও দেশে এটিকে "গ্লেন" বলা হয়। নদীর পাশ বরাবর একটি পায়ে চলার পথ আছে। পথের এই অংশটি প্রায় ১৬ মাইল দীর্ঘ, আমরা পায়ে হাঁটিয়া অতিক্রম করিলাম। আবহাওয়া অনুকূলে ছিল আমি যতদিন স্কটল্যাণ্ডে ছিলাম, আকাশ মেঘহীন ছিল। মাত্র এই দিনটিতে মেঘ ছিল, যদিও বৃষ্টি হয় নাই। আমরা স্ফূর্তির সঙ্গে পথ চলিতেছিলাম। পর্বত-গাত্রে ভারতীয় কারপেটের মতো মৃদু বর্ণে বিছান গুল্মরাজি হইতে সুগন্ধ উত্থিত হইয়া আমাদের আনন্দ আরও বাড়াইয়া দিতেছিল। আর তাহার সঙ্গে যোগ দিয়াছিল টিল্‌ট নদীর মর্মর ধ্বনি। মাঝে মাঝে প্রস্তরখণ্ডের ধাক্কা খাইয়া স্রোত গর্জন করিয়া উঠিতেছিল। ক্লান্ত বোধ করিলে আমরা কোনও একটা পাথরের উপর বসিয়া সঙ্গে আনীত আহার্যের সদ্ব্যবহার করিতেছিলাম। টিল্‌ট নদীর নির্মল শীতল জল পান করিয়া বড়ই তৃপ্ত বোধ করিয়াছিলাম। যে অঞ্চল দিয়া চলিতেছিলাম, তাহা প্রায় বসতিহীন। পূর্বে যে হাইল্যাণ্ডবাসীরা ছিল তাহারা সবাই অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে চলিয়া গিয়াছে। দুর্দান্ত সাহসী সম্প্রদায় ছিল ইহারা। স্কটল্যাণ্ডের ওয়ালটার স্কট ইহাদের বিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পাহাড়ের গভীর খাদ-প্রবাহিত ডী নদীর স্রোতের ধ্বনি আমরা শুনিতে পাইলাম। ডীর সেতুর উপর দাঁড়াইবার সময় গোধূলি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া দিক দিগন্ত আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। এইখানে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম, কেমন করিয়া দুই পাশের পাহাড়ের পাথর নদীটিকে দুই পাশ হইতে চাপিয়া ধরিয়াছে, এবং তাহারা পরস্পর এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছে যে একটি ছোট ছেলেও একলাফে তাহা পার হইয়া যাইতে পারে। অবশেষে প্রস্তরের বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া নিম্নে পাথরের খোলা বুকের উপর আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এবং যেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্যই সেখানে এমন গভীর গহ্বর সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পাতাল পথের অন্ধকারের মতই কালো। এইখানে কবি বায়রন প্রায় মারা যাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনীতে মুর বলিয়াছেন—

"ঢালু পথে তিনি (বায়রন) কোনও রকমে নিচের দিকে নামিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ গুল্মজাতীয় হীদারে তাঁহার খোঁড়া পা আটকাইয়া যায়, এবং তিনি সেই ঢালু পাহাড়ের গায়ে গড়াইতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার সঙ্গী তাঁহাকে যথাসময়ে ধরিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া দেন।" এইখানে আমাদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করিতেছিল, সেই গাড়িতে আমরা ব্রিমারে গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে হোটেলে আমাদের জায়গা হইল না, সব হোটেলেই স্থানাভাব। আমাদের দুইজনকে হাইল্যাণ্ড কুটিরে আশ্রয় লইতে হইল। পরদিন সকালে আমি যখন কুটিরের বাইরে পাহাড়ের ধারে, একটি ছোট ছেলে সেখানে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে। বলিলাম, আমি ইণ্ডিয়া হইতে আসিয়াছি। সে বলি, আমার বাবাও ইণ্ডিয়ান। তোমার বাবার নাম কি? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, স্মীটন। তাঁহার নাম কি ডক্টর ডী স্মীটন? এবং তিনি কি বর্মায় আছেন? এ কথায় সে দৌড়াইয়া বাড়ি চলিয়া গেল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল আমার অনুমান ঠিক। তাহা হইলে এই বালক আরথার সত্যই ভারতীয়। ইউরোপে থাকিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মাত্রকেই ভারতীয় মনে হইত। ছেলেটি আমার আশে-পাশে খেলিয়া বেড়াইল, এবং চলিয়া আসিবার সময় তাহার নিকট হইতে স্নেহপূর্ণ বিদায় গ্রহণ করিলাম। ব্রিমারে স্থানীয় প্রধানগণ, আর্ল অভ ফাইফ এবং কর্ণেল ফার্কুহারসন প্রতি বৎসর তাঁহাদের প্রজাবর্গকে লইয়া একটি সম্মেলনের আয়োজন করেন। এটি হয় সম্পূর্ণ হাইল্যাণ্ড ভঙ্গিতে। এক-একটি গোষ্ঠী তাহাদের মোড়লকে পুরোভাগে রাখিয়া মার্চ করিতে থাকে। পরিধানে হাইল্যাণ্ডারদের বিশেষ পোশাক, হাতে ক্লেমোর তরবারি অথবা লক্ এবার কুঠার—দুইই তাহাদের নিজস্ব অস্ত্র, তৎসহ পতাকা ও ব্যাগ পাইপ। সম্রাজ্ঞী ও প্রিন্স অভ ওয়েল্স্ এই হাইল্যাণ্ড গোষ্ঠীর সম্মেলনে যোগ দিয়া থাকেন। কিন্তু গেলিক ভাষা ও হাইল্যাণ্ড কিল্ট ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে।

ব্রিমারে আমার বন্ধুদের রাখিয়া আমি একা ব্যালাটার অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের কোচ প্রায় দুই মাইল যাইবার পর এক সহযাত্রী আমাকে বিশেষ কয়েকটি স্থান চিনাইয়া দিতে লাগিলেন। প্রথমে সম্রাজ্ঞীর হাইল্যাণ্ড নিবাস ব্যালমোরাল দেখিলাম। তাহার পর ফার্কুহারসনের পারিবারিক বাসস্থান ইনভারকল্ড দেখিলাম। তাহার পর প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর অ্যাবারগেলডি এস্টেট দেখিলাম। তাহার পর বায়রন কর্তৃক খ্যাতি প্রাপ্ত তুষারাবৃত লকনেগারের চূড়া দেখিলাম। আমার নূতন বন্ধু মিস্টার নিউল্যাণ্ড আমাকে ব্যালাটার ছাড়িবার আগে আশে পাশে পাহাড়গুলি না দেখাইয়া ছাড়িবেন না। তিনি একটি সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য, গ্রীষ্মকালে হাইল্যাণ্ডে যেসব যাত্রী পায়ে চলা পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সব পথ জমির মালিকেরা যাহাতে বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে দখল করিয়া না লইতে পারে তাহা পর্যবেক্ষণ করা। এইসব পথ কোথায় কি পরিমাণ আছে তাহার হিসাব লইবার জন্য মিস্টার নিউল্যাণ্ড প্রেরিত হইয়াছিলেন। পূর্বে এই জাতীয় যেসব পথ বন্ধ করা হইয়াছিল তাহা পুনরায় ছাড়িয়া দিতে জমিদারদিগকে

বাধ্য করা হইয়াছে। পল্লীর সবার ব্যবহার্য স্থান বা পথ যদি জমিদার দখল করিয়া লয় তাহা হইলে সে জমিদার যত ক্ষমতাশালী হউক না কেন, সবাই মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া তাহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া স্বত্ব নিষ্পত্তি করা হয়।

আমাদের গ্রামে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জমিদারগণ যে সব গোচারণ ভূমি স্মরণাতীত কাল হইতে সকলের গবাদি পশুর জন্য ব্যবহৃত হইত তাহা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, এবং আমি যত দূর জানি, কেউ ইহার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ জানায় নাই, গ্রামবাসীরাও নহে, সভাসমিতির বক্তারাও নহে, গভর্মেণ্টও নহে। অথচ গোপ্রেমী সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর প্রতিবাদের বিষয় আর কি হইতে পারে? "আপনার নিকট আবেদনকারীগণ বিনীতভাবে এই প্রার্থনা জানায় যে, আইন করিয়া গোহত্যা বন্ধ করিতে আজ্ঞা হয়, এবং কৃষিবিভাগে নিযুক্ত ইংরেজ অফিসারগণকে তাঁহাদের এদেশে পশুখাদ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া সর্ববিষয়ে সর্দারি করিবার অপরাধে গ্রেফতার করিতে আজ্ঞা হয়, এবং আবেদনকারীগণকে তাহাদের গোজাতিকে শনৈঃ শনৈঃ অল্পাহারে মারিবার নবলব্ধ অধিকারকে স্বাধীনভাবে ভোগ করিবার অধিকার দিতে আজ্ঞা হয়,"—বর্তমানে এদেশে গোজাতির দুর্দশা দেখিলে এইরূপ একটি·আবেদনই গভর্মেণ্টের নিকট পাঠাইবার জন্য বলিতে ইচ্ছা হইবে। আমাদের ত্রুটি কোথায় তাহা সাহসের সঙ্গে প্রকাশের শিক্ষা করিতে হইবে, অবশ্য যদি আমাদের শত্রুদের চোখেও আমরা সম্মানিত হইতে চাহি।

মিস্টার নিউল্যাণ্ড এবং আমি ব্যালমোরাল এস্টেট পার হইয়া গেলাম। নিকটস্থ অনেক খামার বাড়িও দেখিলাম এবং পুরাতন বাসিন্দাদের দেখিলেই আমার সঙ্গী পায়ে চলার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। যেখানেই যাই, সেখানকার লোকেরাই আমাদিগকে হুইসকি ও চা দিতে লাগিল, আমাদের দেশে যেমন মাননীয় অতিথি আসিলে কিছু মিষ্টি, জল ও পান দেওয়া হয়, এও তেমনি। এক স্থানে আমরা অনেকগুলি গৃহহীন স্ত্রী-পুরুষ ভবঘুরের সাক্ষাৎ পাইলাম। ইহাদের কোনও নির্দিষ্ট বাসস্থান অথবা বৃত্তি নাই, ইহারা ঘুরিয়া ভিক্ষা করে। সুযোগ পাইলে চুরিও করে। ভারতের ফকির জীবন তুলনীয়। শুধু ইহাদের ধর্মের বহিরাবরণটি নাই। আমরা আমাদের দেশে ধর্মীয় ব্যক্তিদের ভিক্ষা করিয়া বেড়ান দেখিতে অভ্যস্ত, তাই ইংল্যাণ্ডের মত অপ্রচুর খাদ্যের এবং প্রচুর শীত, সম্বৎসর বৃষ্টি এবং শীতকালের তুষারপাতের দেশে, ভবঘুরে জীবনে ইহারা কি সুখ পায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এমন দেশে, যেখানে লোকে সদর দরজা বন্ধ রাখে, যে দেশে বহুদিনের অভ্যাসে লোকেরা ভবঘুরে বিরোধী হইয়াছে, যেখানে বাগানে মানুষধরা প্রহরী ও বুলডগ রাত্রিতে পাহারা দেয়, 'ছত্র'-এর মত উন্মুক্ত দ্বার কোথাও নাই, জমি ঘেরা থাকে, এবং অনধিকার প্রবেশের দায়ে বহু লোকের বিচার হয়, সেখানে ইহাদের অস্তিত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এই কারণে জিপসিদের এখন আর ইংল্যাণ্ডে খুব দেখা যায় না। যে অল্পসংখ্যক জিপসি আছে, তারা ভাঙা ফুটা পাত্র মেরামতের কাজ করিয়া থাকে। কিলি-ক্র্যাংকি গিরিসঙ্কটে আমরা জিপসিদের ছোট একটি আড্ডা দেখিতে পাইলাম।

ব্যালাটারে সার উইলিয়াম মুইয়র-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে ইহার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন। আমিও এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলাম, ইহা দূর করিতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু ভারতে ইংরেজ চালিত কয়েকখানি প্রভাবশালী সংবাদপত্র যদি ভারতীয়দের প্রতি সহানুভূতিশীল না হয়, তাহা হইলে সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। দলীয় ধর্ম বজায় রাখিয়া সংবাদপত্র পরিচালনা ভারতের পক্ষে অনুপযুক্ত, এবং শুধু তাহাই নহে, ইহা ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের পক্ষে বিপজ্জনক শিক্ষা। সন্দেহ নাই যে এরূপ ভুল বোঝাবুঝির জন্য দায়ী পরস্পরের সম্পর্কে অজ্ঞতা। মুসলমান রাজত্বেও এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। আবুল ফজল রাজ্‌ম নামার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "সম্রাট আকবর, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পরস্পর অজ্ঞতাই প্রধানতঃ ভুল বোঝার কারণ ইহা নিশ্চিত হৃদয়ঙ্গম করিয়া হিন্দুদের গ্রন্থ মুসলমানদের মধ্যে প্রচারের জন্য অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মহাভারত অনুবাদ করাইবার জন্য নির্বাচিত করিয়াছিলেন।" আমার মনে হয় তিনশত বৎসর পূর্বে শাসক ও শাসিত বর্তমান অপেক্ষা পরস্পর অধিক পরিচিত ছিলেন। অবশ্য ইংরেজী সংবাদপত্র যেমন ভারতীয়দের বোঝে না, দেশী সংবাদপত্রও তেমনি ইংরেজ গভর্মেন্টকে সমালোচনা করিয়া থাকে। দুইদিকেই কড়া ভাষা ব্যবহৃত হয়। তাহাতে সাংবাদিকতার স্তর নিচে নামিয়া যায়।

ব্যালাটার হইতে আমি রেলপথে অ্যাবারডীনে আসিলাম। আমার এই ভ্রমণ সময়ে যত স্থানে গিয়াছি তাহার সকলগুলির বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। অ্যাবারডীন শহরটি সমুদ্রের উপকূলে, লোকসংখ্যা এক লক্ষ দশ হাজার। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, একটি সুন্দর চিত্রশালা আছে, শিল্প বিষয়ক মিউজীয়াম আছে, একটি যন্ত্রকুশলীদের ইনস্টিট্যুট আছে, এবং একটি আর্ট স্কুল আছে। এই শেষেরটি ব্যক্তিগত দানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দানের পরিমাণ ছয় হাজার পাউণ্ড। শহরে দুইখানি দৈনিক সংবাদপত্র, একটি সান্ধ্য সংস্করণ ও দুই খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনে শিক্ষা কত দূর অগ্রসর ইহা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ভারতের পক্ষে পুনর্জীবন লাভ করিতে হইলে সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন শিক্ষা, সর্বজনীন শিক্ষা, বাধ্যতামূলক শিক্ষা এবং সম্ভব হইলে অবৈতনিক শিক্ষা। জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুমুসলমান, ইংরেজ এবং ভারতীয়গণকে একত্র হইয়া আমাদের দেশে সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রশ্ন—টাকা আসিবে কোথা হইতে? পল্লীগ্রামের স্কুলের জন্য আমরা বিবাহের উপর কর ধার্য করিয়াছি। এই প্রথাটি সরকার কর্তৃক বিধিবদ্ধ হওয়া উচিত। তাহা ব্যতীত এদেশে যে সব সোনা ও রূপা আমদানি করা হয় তাহার উপর কর ধার্য করা উচিত। যে কোনও জিনিসের উপর কর ধার্য করা হউক আপত্তি নাই, কিন্তু আমরা শিক্ষা চাই। পশুর জীবন যাপন করা অপেক্ষা অনাহারে মৃত্যু শ্রেয়।

অ্যাবারডীনে একদিন আমি ঐ শহরের প্রান্তে অবস্থিত সমুদ্র-উপকূলে আসিয়া দেখিলাম, বড় বড় নৌকা হেরিং মাছে বোঝাই হইয়া তীরে আসিয়া ভিড়িয়াছে। ওখানে স্টীমারে করিয়াও খোলা সমুদ্রে মাছ ধরা হইয়া থাকে। হেরিং অনেকটা আমাদের ইলিশ মাছের মত অত সুমিষ্ট নহে। ইংল্যাণ্ডের সেরা মাছ সামন (Salmon salar, Linn; salmonidac)। মেরু সাগরের সর্বত্র ইহা প্রচুর পাওয়া যায়। বসন্তকালে ইহারা ডিম ছাড়িবার জন্য নদীতে প্রবেশ করে। উজান স্রোতে যাইবার পথে কোনো বাধা পাইলে তাহা লাফাইয়া পার হইয়া যায়। জলস্রোত যেখানে খাড়া নিচে পড়িতেছে সেখানেও উহারা লাফাইয়া পার হয়। সোল মাছও উহাদের খুব প্রিয়। চ্যাপটা লবণাক্ত জলের মাছ, ইহার দুটি চক্ষুই এক পাশে। বালিতে গা ঢাকিয়া নিদ্রা যায়। টেবিলে অন্য যেসব মাছের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তাহারা হইতেছেঃ স্টার্জন, পাইক, রোচ, হ্যাডক, কড, টেঞ্চ, টার্বট, প্লেইস, ঈল (বাইন), ম্যাকেরেল, ল্যাম্প্রি, লক, হোয়াইটবেইট ইত্যাদি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হইতে আনীত গ্রীণ টার্টল (Chelonia Midas) উহাদের একটি প্রিয় খাদ্য। টার্টল কচ্ছপ। কিন্তু উহাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় অয়েস্টার বা ঝিনুকের শাঁস, এবং ইহার একটি মাত্র প্রজাতি খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় —Ostrea edulis। লণ্ডনে অনেক দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা আছে "নেটিভস"। অবশ্য সেখানে ভারতীয় কাহাকেও বিক্রয়ের জন্য রাখা হয় না। উহার অর্থ, সেখানে উৎকৃষ্ট অয়েস্টার —যাহা কেবল ইংল্যাণ্ডের উপকূলে ধরা হয়, বিদেশ হইতে আমদানি করা নহে, অর্থাৎ "নেটিভ" অয়েস্টারের দোকান। খুব বড় আকারের চিংড়ি ক্রে মাছ ও কাঁকড়া ওদেশে পাওয়া যায়।

ডাণ্ডীর পথ দিয়া আমি অ্যাবারডীন হইতে পার্থে ফিরিয়া আসিলাম, এবং আসিয়াই হাইল্যাণ্ডে অবস্থিত অ্যাবারফেলডিতে গেলাম। ওখান হইতে কিলিন পিয়ারে গেলাম, লক টে ছোট স্টীমারে পার হইয়া। এখানকার দৃশ্য অবর্ণনীয়রূপে সুন্দর। নীল হ্রদের বুকে স্টীমারে সঙ্গীত বাজিতেছিল, সবুজ ঘাসে ঢাকা ঢালু তীরভূমি, উচ্চ ভূমিতে ঘন গাছের জঙ্গল, পাতাঝরা গাছের হেমন্ত কালীন হলুদ রঙের ঝরা পাতা, এবং সর্বোপরি দৈত্যের মত মাথা তোলা বহুশির পর্বত—এই সব মিলিয়া দৃশ্যটি রূপকথা জগতের দৃশ্যের মত বোধ হইতেছিল। আমি কাশ্মীর দেখি নাই, তাই কাশ্মীরের সৌন্দর্য স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারে কি না আমি বলিতে পারিলাম না। কিন্তু আমি ভারতের বহু স্থান—পর্বতসঙ্কুল অথবা সমভূমি—দেখিয়াছি, তাই আমি এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, স্কটল্যাণ্ডের মত অপূর্ব সুন্দর দেশ আমি আর দেখি নাই। হিমালয় বড়ই উদ্দাম এবং অতি মহান। মনে উহা ভয়মিশ্রিত বিস্ময় সৃষ্টি করে, কিন্তু মনকে শান্ত করিয়া তোলে না, মনকে মোহগ্রস্ত করে না। নীলগিরিতে হ্রদ থাকিলে স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে সৌন্দর্য তুলিত হইতে পারিত।

লক টে-তে একটি ছোট্ট দ্বীপ আছে, তাহার উপরে ভগ্নদশা-প্রাপ্ত একটি প্রাচীন ক্যাসল-এর কঙ্কাল মাত্র আছে। একদা ম্যাকগ্রেগরেরা এই কাস্‌ল-এর রক্ষকদিগকে পরাভূত

করিয়াছিল। তাহার পর হইতে এ সব স্থানের কত না পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এ সবের উপরে রোমাঞ্চের রশ্মি নিক্ষেপ করিবার জন্য ইহারা সার ওয়ালটার স্কটের যাদুদণ্ডের অপেক্ষায় ছিল। অদূরে বেনমোর, তাহার ৩৮৪৩ ফুট উচ্চ শিখর লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, সে এখানকার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ দেখিয়াছে, যে যুদ্ধে ক্ল্যান ম্যাকন্যাদের জমি বেহাত হইয়া গেল, শুধু তাহাদের জন্য থাকিল কিলিনের সমাধিক্ষেত্র। সেইখানে আমি ভারী মন লইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া ছিলাম। ট্রেন আসিল। আমরা ড্যালরি নামক ছোট্ট গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম। ১৩০৬ সনে, এইখানে ব্রুস, লরনের ম্যাগডুগালের অনুচরদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পরে আসিলাম টিনড্রামে, তাহার পর ড্যালম্যানি, এটি ব্রেডালবেন ক্যাম্পবেল অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত। ইহার পাশে বেন ক্রুয়াঙ্কন, এবং অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য বেন, গ্লেন অর্খি, গ্লেন স্ট্রী এবং আর কত সুন্দর উপত্যকা। ইহারা সকলেই বিতাড়িত ম্যাকগ্রেগর গোষ্ঠীর দূরাগত ক্রন্দন বার বার শ্রবণ করিয়াছে—

> Glen-Orchy's proud mountains, Kilchurn
> and the towers
> Glen-Strae and Glen Lyon no longer are ours,
> We're landless, landless Grigalach!
> Landless, landless, landless!

পাহাড় পথ উপত্যকাপথ এবং এখানকার সমস্ত পরিবেশই ভালবাসা ও লড়াই, গৌরবময় বীরত্ব এবং জঘন্যতম লুঠতরাজ-এর কাহিনী দ্বারা স্মরণীয় হইয়া আছে, সেই সব পথ অতিক্রম করিয়া স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ওব্যানে গিয়া পৌঁছিলাম। ডালম্যালি হইতে কিলচার্ণে আসিয়াছিলাম। রেলওয়ে 'অ' হ্রদের পাশ দিয়া কিছুদূর পর্যন্ত গিয়াছে। এই হ্রদকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে আমরা প্রথম লক এটি'র দৃশ্য দেখিতে পাইলাম, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই আক-না-ক্লইক নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এই স্থান হইতে লক এটিভহেড পর্যন্ত ছোট একটি স্টীমার যাতায়াত করে। এখান হইতে গ্লেনকো এবং ব্যালাচুলিশ যাইবার কোচ মেলে। ইহার পর কোনেল ফেরি স্টেশনে পৌঁছিলাম। এবং এখান হইতে লক নেল। লক নেল হইতে ফোর্ট উইলিয়াম ও বেন নেভিসের দৃশ্য অতি মনেরম। ওব্যানে বাস করিবার পর সেখান হইতে স্টীমারে গ্ল্যাসগো পৌঁছিলাম।

গ্ল্যাসগো গত শতাব্দীতে বারো হাজার অধিবাসী সম্বলিত একটি মাছের ব্যবসায়ের শহর ছিল, এখন সে পৃথিবীর মধ্যে একটি বৃহত্তম শহর। এখন এখানকার জনসংখ্যা অন্তত পাঁচ লক্ষ হইবে। স্কটল্যাণ্ড-বাসীদের অক্লান্ত শ্রম এবং প্রখর বাণিজ্য-বুদ্ধিতে গ্ল্যাসগোর এই উন্নতি। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া ক্লাউড নামক একটি ছোট নদীকে ইহারা প্রশস্ত করিয়াছে, জাহাজ ভিড়িবার উপযুক্ত বন্দর বানাইয়াছে, ডক নির্মাণ করিয়াছে—সে এক বিরাট ব্যাপার। শত শত জাহাজ এখানে আসা যাওয়া করিতেছে। জাহাজ এখান হইতে পৃথিবীর

সর্বত্র যায়, বিশেষ করিয়া ভারতে এবং অ্যামেরিকায়। গ্ল্যাসগোর পথের নগ্নপদ ছোকরারা অশ্বেত রোদে-পোড়া নাবিকদের চেহারার সঙ্গে পরিচিত নহে, কিংবা শুল্কহীন দেশ হইতে যে সব সিগারেট লুকাইয়া আনে তাহাও তাহারা দেখে নাই, নারিকেলও অপরিচিত। নাবিকেরা এই সব জিনিস ছোকরাদের মাঝে মাঝে দিয়া তাহাদের সহিত ভাব জমায়। সেজন্য পাগড়ি মাথায় আমাকে দেখিয়া একদল ছোকরা আমাকে অনুসরণ করিতে লাগিল— এবং বলিতে লাগিল —"Johny give us a cigarette, Johny Give us a cocoa-nut" —অর্থাৎ "একটা সিগারেট, কিংবা একটা নারিকেল দাও না গো!" নদীতে অনেকগুলি সেতু আছে, শহরের ভিতর চমৎকার সব পথ, দুপাশে বহু উচ্চ অট্টালিকা। শহরের প্রধান পথ আরগাইল ষ্ট্রীট, সর্বদাই জনবহুল। ট্রাম ও কোচ সব দিকে চলিতেছে। এই পথ এক স্থানে ষ্ট্রীটকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "বেল" ও "ব্রী"তে গিয়া পৌঁছিয়াছে, এইখানে স্কটিশ বীর উইলিয়াম ওয়ালেস ইংরেজদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। বুকানন ষ্ট্রীট ফ্যাশ অঞ্চল। নিকটেই জর্জ স্কয়ার। অনেক খ্যাত ব্যক্তির মর্মর মূর্তি আছে এখানে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সার ওয়ালটার স্কটের বৃহৎ মূর্তি ডারক স্তম্ভে স্থাপিত। এখানকার নিউ ইউনিভার্সিটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত। অনেক ভারতীয় এখান হইতে ডিগ্রী লইয়া ফিরিয়াছে। এইখানে অল্পদিনের মধ্যেই (১৮৮৮তে) একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী খোলার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ভারতীয় হস্তশিল্পও অবশ্যই এখানে স্থান পাইবে। ইউনিভার্সিটির গৃহে বড় একটি গ্রন্থাগার আছে, ইহার মিউজীয়ামে বিখ্যাত হান্টারিয়ান সংগ্রহগুলি স্থান পাইয়াছে। গ্ল্যাসগোর ক্যাথিড্রালই সম্ভবত এখানকার প্রাচীনতম স্থাপত্য। এটি দ্বাদশ শতাব্দীতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত। গ্ল্যাসগোর নিকট দুইটি উল্লেখযোগ্য স্থান আছে, পেইসলি ও গ্রীনক। কাশ্মীরের শালের অনুকরণে পূর্বে এই পেইসলিতে শাল প্রস্তুত হইত, ফলে কাশ্মীরের শালের কারবার এবং নকল শালের কারবার দুইই ধ্বংস হইয়াছে। নিকটস্থ হ্রদগুলির দৃশ্য অপূর্ব। আমরা লক লমণ্ড এবং লক ফাইন দেখিয়া আরও অনেকগুলি হ্রদ ও মনোহর দৃশ্যপূর্ণ স্থান দেখিলাম। গ্ল্যাসগোতে থাকিবার সময় পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ "দি গ্রেট ইষ্টার্ণ" গ্রীনকের অদূরে অবস্থান করিতেছিল। আমি তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। ইহা যাত্রী বহন অথবা মাল বহন দুইয়েরই অনুপযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় ইহার মালিক ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।

মিস্টার জন মুইয়র (ডীনস্টন হাউস, ডুন) আমাকে স্কটের 'লেডি অভ দি লেক' -খ্যাত ট্রোসাক্স-এ লইয়া গেলেন।

"Where the rude Trosach's dread defile
Opens on Katrine's lake and isle"

ডুন হইতে আমরা রেলপথে যে স্থানে গিয়া পৌঁছিলাম সেখানে ক্যালাণ্ডারের খাড়া মাথাগুলি, অন্যান্য পর্বতচূড়াদের সহিত ভুতুড়ে অঞ্চলগুলি পাহারা দিতেছে। যেখানে রোডেরিক বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল এবং যেখানে এলেনের হৃদয় ভালবাসার মধুর বেদনায়

স্পন্দিত হইয়াছিল। কিন্তু কবি স্কটের কাব্যে যেখানকার পাহাড় পর্বত হ্রদ ও উপত্যকাসমূহ পবিত্র রূপ ধরিয়াছে, সেখানকার শোভা বর্ণনা করিবার দুঃসাহস আমার নাই। অতএব আমি সবিনয়ে ইহা হইতে বিরত হইলাম। আমরা ক্যালাণ্ডার হইতে কোচ লইয়া ট্রোসাকস-এর অভিমুখে যাত্রা করিলাম। লক ভেনাচারের পাশ দিয়া পথ কিয়দ্দূর পর্যন্ত গিয়াছে। উপকূল অল্পবিস্তর ঘন অরণ্যে পূর্ণ, অনেক স্রোতস্বিনী ইহার ভিতর দিয়া আসিয়া হ্রদের জলে পড়িতেছে। আমরা কয়েলানটোগল ফোর্ড পার হইলাম। এইখানে রোডেরিক স্নোডনের নাইটের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিল। অতঃপর আমরা উড অভ ওয়েইলিং বা বিলাপ অরণ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। ইহার সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে এই যে, এখানকার জলদৈত্যে অনেকগুলি শিশুকে খাইয়া ফেলিয়াছে। এক দিন ছেলেরা এখানে খেলা করিতেছিল, এমন সময় একটি সুন্দর ঘোড়া জল হইতে উঠিয়া আসিল, তখন তাহার চমৎকার চেহারা দেখিয়া একটি সাহসী ছেলে তাহার পিঠে গিয়া চড়িয়া বসিল। অন্য ছেলেরাও তাহা দেখিয়া তাহাকে অনুকরণ করিল, সবাই একসঙ্গে সেই ঘোড়ার পিঠে চড়িল। ঘোড়াটি সকলের জন্য জায়গা করিবার উদ্দেশ্যে পিঠটাকে আরও লম্বা করিয়া দিল। সবাই যখন চড়িয়া বসিল তখন ঘোড়াটি সহসা ছেলেদের লইয়া হ্রদের জলে ডুবিয়া গেল। জলের নীচে তাহার একটি গুহা ছিল, সেখানে গিয়া সে একটি বাদে অন্য সব ছেলেকে খাইয়া ফেলিল। একটিতে খাইতে পারে নাই, কারণ সে ওখান হইতে পলাইয়া চলিয়া আসিয়া এই কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছে। ঐ জলদৈত্যটা ওয়াটার কেল্‌পি নামে পরিচিত। এই কেল্‌পি বাংলার পুকুরের জটাবুড়ি, বীরভূম নদীর পাথুরে ভূত এবং গণ্ডক নদীর পাণ্ডুবার সমগোত্রীয়। নাইল নদীর কুমীরের মত ঐ কেল্‌পির অসাধারণ ধৈর্য, শিকারের জন্য সে বহুকাল অপেক্ষা করিতে পারে। তাহার উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবার আর একটি মাত্র কাহিনী আছে। সার ওয়ালটার স্কটের মতে সে একটি মৃতদেহ বহনকারী দলকে ধরিয়া উদরস্থ করিয়াছিল। ইহার পর আমরা লক আক্‌রে ও পরে ব্রিজ অভ টার্ক-এ আসিলাম। এটি ছোট একটি স্রোতস্বিনীর উপরের সেতু, ইহা রূপকথায় স্থান পাইয়াছে। আমরা লক আক্রে পিছনে ফেলিয়া চলিলাম, তাহার পর ট্রোসাক্‌স-এর গিরিসঙ্কটের ভিতর প্রবেশ করিলাম। ইহার দক্ষিণ পাশে বেন অ্যালাম, ও বাম পাশে বেন ভেনু। দুটিই খাড়া পাহাড়। ইহাদের গায়ে ঘন অরণ্য,নানা জাতীয় গাছ—রোয়ান, বার্চ, হথর্ণ, ওক এবং অন্যান্য। সমস্ত দৃশ্যটাই হিমালয়ের গর্জ বা গিরিসঙ্কটের ন্যায়। ট্রোসাক্‌স-এর অন্য সীমায় লক ক্যাট্‌রিল। পূর্বে এই হ্রদে ট্রোসাক্‌স হইতে সহজে আসা যাইত না। আসিতে হইলে বিপদসঙ্কুল এবং দুর্গম পথ মাত্র সম্বল ছিল। ইহাকে "ল্যাডার্স" বলা হইত। মৈ-পথ বলা চলে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে ধাপ কাটা, এবং ইহার উপর দিয়া গাছের ডালের সঙ্গে দড়ি বাঁধা ছিল। সাহসী যাত্রীর ইহাই একমাত্র অবলম্বন। বর্তমানে প্রশস্ত এবং সহজ পথ নির্মিত হইয়াছে, এই পথে আমাদের কোচ হ্রদের ধার পর্যন্ত যাইতে সক্ষম হইল। রব রয় নামক একটি ছোট স্টীমার আমাদিগকে হ্রদের ওপারে লইয়া গেল। আমরা এলেন দ্বীপ ছাড়াইয়া গেলাম। এই

এলেন ডগলাস স্নোডনের নাইটকে বহন করিয়া আনিয়াছিল। একখানি বোট আসিয়া স্টীমার হইতে আমাদিগকে কুইনস কটেজে লইয়া গেল। এটি একটি সুরঙ্গ-মুখে অবস্থিত। এই সুরঙ্গ-পথে ক্যাটরিন হ্রদ হইতে আটচল্লিশ মাইল দূরে গ্ল্যাসগোতে জল লইয়া যাওয়া হয়। গ্ল্যাসগোর এক ম্যাজিস্ট্রেট কুইনস কটেজের অতিথি রূপে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। তিনি অতঃপর একটি বোটে করিয়া হ্রদের আর এক প্রান্তে লইয়া গেলেন। স্থানটি বড়ই জনশূন্য, প্রাণহীন। পাহাড়গুলিতে শুধু ভাঙা পাথর আর বড় বড় পাথরের চাঁই। এ সব স্থান পূর্বে ম্যাকগ্রিগর গোষ্ঠির সম্পত্তি ছিল। ইহা হ্রদের ধারে একটি পাহাড় ঘেরা স্থান, বহু টুকরো পাথর চতুর্দিকে ছড়ান। শোনা গেল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ম্যাকগ্রিগর সম্প্রতি ঈজিপ্‌টে মারা গিয়াছেন, তাঁহার দেহ এইখানে তখন আনিবার চেষ্টা করা হইতেছিল। ম্যাকগ্রিগরদের সব বৃত্তান্ত জানিতে হইলে পাঠকদিগকে স্কটের "লেডি অভ দি লেক" পড়িতে অনুরোধ করি।

১৩

১৮৮৬ সনের অক্টোবরে আমি অক্সফোর্ডে যাই এবং সেখানে সার মোনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌-এর অধীনে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিট্যুটে কাজ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে তিনি এটি গঠন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, সার মোনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌ ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। প্রাচ্য বিষয়ের পণ্ডিত মাত্রেরই মনে এই সহানুভূতি বিদ্যমান। তিনি উচ্চস্তরের ইংরেজ জেনটলম্যান্‌দের এই শিক্ষাটি দিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহারা যেন স্মরণ রাখেন, ভারতীয়গণ প্রাচীন কাল হইতেই এমন একটি সুগভীর চিন্তাশীল মন ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন যাহা আধুনিক ইউরোপীয়গণও অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এই শিক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে, ব্রিটিশ জাতি অ্যামেরিকা, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়াবাসীদের সংস্পর্শে আসিয়া যাহারা ইউরোপীয় নহে তাহাদের সম্পর্কে এমন একটি ধারণা গড়িয়া লইয়াছে যাহা ভারতীয়দের পক্ষে আদৌ গৌরবজনক অথবা কল্যাণকর নহে। ইউরোপীয়গণ যতই শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথে অগ্রসর হইতেছে ততই তাহাদের ও অপেক্ষাকৃত শ্লথগামী ভারতীয়দের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া যাইতেছে। জ্ঞান ও শক্তি মানুষকে যে পরিমাণ পশুত্বের স্তর হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, তাহা সেই পরিমাণে বর্বর মানুষ হইতে সভ্য মানুষকে দূরে লইয়া যাইতেছে। দুইয়ের মধ্যে যাহা পার্থক্য তাহা শুধু মাত্রার। ক্ষমতার চেতনা ইউরোপীয়দের মনে একটা নিরাপত্তাবোধ জাগাইয়া তুলিতেছে, আর এইজন্যই ইউরোপীয়েতর জাতির নিকট হইতে তাহাদের সম্পত্তি কাড়িয়া লইবার সময় তাহারা যাবতীয় নীতি ও ন্যায়বোধ বিসর্জন দিয়া তাহাদের নরহত্যাক্ষম বন্দুক ও মেশিন-গানের উপর ষোল আনা নির্ভর করিয়া থাকে। এই অস্ত্র লইয়া তাহারা অ্যাফ্রিকায় নেগাসদের জমির উপর যেমন তেমনি তাহারা পূর্ব এশিয়ায় আনামীদের উপরেও ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। বিস্মৃতিবশতঃ ভাববিলাসীগণ যে পুরাকালকে স্বর্ণযুগ বলিয়া মনে করে, এবং যাহাকে আমরা নিষ্ঠুর হত্যা ও শঠতাময় প্রস্তর যুগ অথবা ব্রঞ্জ যুগ বলিয়া মনে করি, তাহা আর নাই, এবং আশা করি তাহা চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইবে। রেলওয়ে কিংবা টেলিগ্রাফে মানুষকে পশু হইতে পৃথক করে না। দয়া, করুণা, উদারতা, ন্যায়, ক্ষমা ইহাই মানুষকে পশু হইতে পৃথক করে। এবং ইউরোপীয়গণ এ-কথা ভুলিয়া যায় যে আছে বল দুর্বলেরও—এবং যাহারা অশ্বেত এবং অর্ধউলঙ্গ থাকা সত্ত্বেও একদা যাহাদের মনে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা বহুপূর্বে জ্ঞানের আলো উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিতেছিল, তাহারাও ন্যায়ধর্ম উপেক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে তাহাদের দুর্বল হাত তুলিতে পারে। ইংল্যাণ্ড হইতে যাহারা ভারতবাসীদের মধ্যে আসে, তাহারা যদি মনে করে,

ইহারা কৃষ্ণাঙ্গ অথবা অর্ধউলঙ্গ, অতএব ইহাদিগকে অসভ্য বুশম্যান অথবা পাপুয়ান তুল্য মনে করিতে হইবে, তাহা হইলে তাহা উভয়ের পক্ষেই মহা অনিষ্টের কারণ হইবে।

পুরাকালে মানুষ যখন অনুন্নত ছিল, তখন মানুষের মনে আত্মত্যাগের স্থান ছিল না। ইহা এক্ষণে সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়াছে।

আমাদের সমুদ্র-উপকূলগুলি পোর্টুগীজ শাসনের তিক্ত স্বাদ পাইয়াছে, স্প্যানিশদের অ্যামেরিকা শাসন হইতে তাহার পার্থক্য বিশেষ নাই। ইংরেজগণ আমাদের জন্য যাহা করিয়াছে তাহার জন্য আমরা সহযোগিতা দান করিয়াছি। মেটকাফগণ ও মেকলেদের আমরা নিরাশ করি নাই। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের উন্নতি তাহাদের লক্ষ্য, সাম্রাজ্য সেই লক্ষ্যের উপর। তবু ব্রিটিশদের এই সম্পর্কে ভুল হইলে ভারতীয়গণ নীচের স্তরে নামিয়া যাইবে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে আমাদের আত্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা দিতে ইংরেজগণ অবিরাম অস্বীকার করিতেছে। ভারতীয়গণ কি গৃহপালিত পশুর স্তরে থাকিয়া যাইবে? ভারতবর্ষকে হারাইলে ইংল্যাণ্ডের খুব ক্ষতি হইবে না, কিন্তু তাহা হইলে আমাদের স্তর নীচেই থাকিয়া যাইবে। আমাদের সামরিক শিক্ষা দিতে হইবে, ইহাতে ইংরেজের কোনও বিপদ্ হইবে না। ইহাতে সাম্রাজ্যেরই শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

সার মোনিয়েরে উইমিয়াম্স্ ব্রিটিশ ছাত্রদের মনে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্পর্কে সত্য অবস্থার কথা গাঁথিয়া দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এবং এজন্য তাঁহাকে দুই জাতির পক্ষ হইতেই কল্যাণকামী মনে করা উচিত। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভ করিয়া ভারতীয় মনে তাহার নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে চেতনা জাগিতেছে। একদিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দরুণ মানুষের সম অধিকারের বোধ, অন্যদিকে ক্ষমতার ও প্রভুত্বের চাপ—আমরা বর্তমান এই দুইয়ের সংঘর্ষের মধ্যে পড়িয়াছি। এই সংঘর্ষ যিনি রোধ করিতে পারিবেন, তিনি উভয় জাতিরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন। সার মোনিয়েরে এই চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহার স্ত্রীও তাঁহার এই মহৎ চেষ্টায় সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার সাহায্য হাতে-কলমে। প্রথমদিন যখন আমি সার মোনিয়েরে উইলিয়াম্স্-এর নিকট যাই, তিনি আমাকে বলিলেন, "আপনি আমার 'অভ্যাগত'।" সংস্কৃত অভ্যাগত শব্দটি উচ্চারণ করিলেন। সার মোনিয়েরে সংস্কৃতে পণ্ডিত সুতরাং তিনি ঐ শব্দে আমরা যে অতিথিকে পবিত্র জ্ঞান করি তাহাই বুঝাইতে চাহিলেন। অক্সফোর্ডে আমি যতদিন ছিলাম, ততদিন তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমার প্রতি "অভ্যাগত"-এর ব্যবহার করিয়াছিলেন।

অক্সফোর্ডের কলেজগুলি দেখিলাম। ক্রাইস্ট কলেজ ও সংলগ্ন ডাইওসিসান ক্যাথীড্রাল, ওরিয়েল, ব্যালিওল, কুইন্স্ ও ম্যাগ্ডালেন কলেজ। ইহার টাওয়ার, ক্লইস্টার ও ছায়াবীথি স্মরণ করাইয়া দিল অতীতে যুগে ওয়ালশ, অ্যাডিসন এবং জন্ হ্যাম্পডেন্ এই পথে তাঁহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য আরও অনেকগুলি কলেজ দেখিলাম, কলেজের রান্নাঘরে বহু ছাত্রের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিরূপ রান্না হয় তাহা দেখিলাম। পরীক্ষার হল্ দেখিলাম। নানা স্থানের নানা রঙের পাথর বসান হল্‌টি চমৎকার। বডলিয়ান্ ও

র‍্যাডক্লিফ গ্রন্থশালা দেখিলাম। ইউনিভার্সিটি মিউজীয়াম ও মানমন্দির দেখিলাম। এই প্রাচীন নগরীতে এত দ্রষ্টব্য রহিয়াছে যাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।

অক্সফোর্ডে সার উইলিয়াম হান্টারের জ্যেষ্ঠপুত্র ব্রাউটন শেরিডান হান্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে যখন ছয়-সাত বৎসরের বালক তখন তাহার সহিত আমার খুব ভাব হইয়াছিল। ইংল্যাণ্ডে যাইবার পর হইতে তাহার কথা অনেককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কেহ বলিয়াছে সে জার্মানিতে আছে, তাহা শুনিয়া মনে হইয়াছিল যেখানে গিয়া তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল সেখানে গিয়া তাহার সহিত দেখা করি। হঠাৎ শুনিলাম সে অক্সফোর্ডে আছে। লেডি মোনিয়ের উইলিয়াম্‌স্‌ আমাকে এই সংবাদটি দিলেন। তাহাকে অবাক্‌ করিয়া দিবার জন্য একদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাকে না জানাইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। সে আমাকে দেখিয়া সত্যই অবাক্‌ হইল। পাগড়িপরা, ঢিলা পোশাকে সজ্জিত এক অশ্বেতাঙ্গকে দেখিবে সে কল্পনাও করে নাই। সে আমতা আমতা করিয়া কহিল, আমি নিশ্চয় ভুল করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছি। সে আরও বিস্মিত হইল যখন বলিলাম, আমি ভুল করি নাই। তাহার স্ত্রী এতক্ষণ মজা দেখিতেছিল। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত সবই প্রকাশ হইয়া পড়িল। ব্রাউটন মহা খুশী। প্রত্যেকেই খুব খুশী হইল। সেদিন হইতে অক্সফোর্ডে আরও অনেকগুলি সন্ধ্যা আমরা আনন্দে একত্র কাটাইয়াছিলাম।

অক্সফোর্ডে যে হোটেলে ছিলাম সেটি সম্পূর্ণভাবে এক যুবতী স্ত্রীলোকের পরিচালনাধীন ছিল। হোটেলটি একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং ইহার সঙ্গে অনেক প্রাচীন স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। শুধু এখানেই নহে, অন্যত্রও যেখানেই গিয়াছি দেখিয়াছি, মেয়েরা সেখানেই হোটেলে, দোকানে, পানগৃহে, ডাকঘরে, কল-কারখানায় দায়িত্বপূর্ণভাবে কাজ করিতেছে। তাহারা যে পরিমাণ কাজ করে আমাদের লোক হয়ত তাহা বিশ্বাস করিতেই চাহিবেন না। গ্লাসগোতে একটি বড় হোটেলে এক মেয়ে কেরানিকে দেখিলাম, তাহাকে সকাল নয়টা হইতে মধ্যরাত্রি পার হইয়া রাত্রি একটা পর্যন্ত মোট ষোল ঘণ্টা কাজ করিতে হয়। লণ্ডনের অনেক রেস্টোরেন্টে মেয়েরা সকাল সাড়ে সাতটা হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কাজ করে। এবং যাহা করে তাহা সহজ কাজ নহে। আমাদের দেশের মেয়েরা এত কাজ করায় অভ্যস্ত নহে। ইহারা সুন্দর পরিমার্জিত পোশাকে, পরিচ্ছন্ন আচরণে সহজেই আমাদের সহানুভূতি দাবি করিতে পারে। পুরুষেরা একটু স্বাধীনতাপ্রিয়, কিন্তু ওদেশের স্ত্রী স্বামীকে কোনও স্বাধীনতা দিতে নারাজ। আমাদের দেশের স্ত্রী তাহার স্বামীর খেয়াল-খুশিতে চলে, কি ওদেশের স্বামী স্ত্রীর খেয়াল-খুশিতে চলে? ইহার উত্তর দিয়া বিপন্ন হইতে চাহি না। ওদেশের জীবনযাত্রার মান উচ্চ, পরিবার প্রতিপালন করা তাই অনেকের পক্ষে দুঃসাধ্য, সেজন্য অনেক পুরুষ অবিবাহিত থাকে। উপরন্তু উহাদের মেয়ের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যা হইতে অধিক, সেজন্য অনেক মেয়েকেও অবিবাহিত থাকিতে হয়। আমাদের দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান যদি উন্নত হইত এবং গাত্রবর্ণ ও জাতি-বৈষম্যবোধ ভারতীয় ইউরোপীয়দের কম হইত, তাহা হইলে আমি আমাদের দেশের যে-সব পুরুষ পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয়

করিয়া স্ত্রী লাভ করিয়া থাকে তাহাদিগকে ইউরোপীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে বলিতাম। ব্রাহ্মণেরাও জুতা বিক্রয়, মদ বিক্রয় এবং টিনের গো ও শূকর মাংস বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে, তখন ভারতের জাতিভেদ প্রথার আর এক পয়সাও মূল্য নাই। যাহা হউক, শ্বেত ও অশ্বেত জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন আপাততঃ সম্ভব হইবে না। ইংল্যাণ্ডের এইসব দোকানের মেয়েদের মধ্যে একটি সততা আমি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। সমস্ত দিন ধরিয়া কত পয়সা তাহাদের হাতে আসে, কিন্তু চুরির অভ্যাসের সঙ্গে তাহাদের পরিচয় নাই। শুধু মেয়েরা নহে, ছেলেরা বা দোকানের কর্মচারীরা সাধারণতঃ সততায় অভ্যস্ত। কোনও প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত হইলে, কিংবা দূরদেশে—আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে অথবা অ্যাফ্রিকার হীরক-ক্ষেত্রে এজেন্টরূপে প্রেরিত হইলে—সর্বত্রই তাহারা সততার সঙ্গে কর্তব্য সমাপন করিবে। এজন্য ব্রিটিশ বাণিজ্যের উন্নতি হয়, আর এই জন্যই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সাম্রাজ্য লাভ করে।

পূর্বে আমি একস্থানে আশা প্রকাশ করিয়াছি যে পাইকারি হাবে হত্যাকাণ্ড, নিষ্ঠুর প্রতারণা, একটা সম্পূর্ণ জাতিকে দাসে পরিণত কবা, ধরাপৃষ্ঠ হইতে লোপ পাইয়াছে। সংবাদপত্রে যাহা পড়িতেছি তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কিছুই লুপ্ত হয় নাই। এ-ঘটনা দূর পশ্চিমে ব্রাজিলে ঘটিতেছে। বলা হইয়াছে সেখানে খ্রীস্টানগণ—সভ্য ইউরোপীয়গণ অসহায় ইণ্ডিয়ানদের জমি দখল করিবার জন্য তাহাদিগকে স্ট্রিকনিন এবং পারদ দ্বারা নির্মমভাবে হত্যা করিতেছে। আমাদের বন্ধু খ্রীস্টান স্পেনবাসীগণ তাহাদের কূপের ভিতর, শস্যের গোলায় এবং তাহাদের রক্ষিত মাংসে বিষ মিশাইয়া দিতেছে এবং ইহার কার্যফল দেখিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া তাহারা গিয়া দেখিতেছে নর-নারী-শিশু শত শত—সহস্র সহস্র প্রবলভাবে আক্ষেপিত দেহে মরিয়া শক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিয়া তাহাদের কি তৃপ্তি! হা ঈশ্বর! এই বীভৎস কাণ্ডে সমস্ত ইউরোপ কেমন চুপ করিয়া আছে! বালগোরিয়াতে মুসলমানদের কুকার্যে তাহারা যে অশ্রুপাত করিয়াছে তাহাতেই বোধ করি তাহাদের সকল অশ্রু শেষ হইয়া গিয়াছে। কিংবা ধর্ম এবং বিজ্ঞান ব্রাজিলের ঐসব ইণ্ডিয়ান কীটদের ধ্বংস করিবার অধিকার দিতেছে? ইংল্যাণ্ডও এ-বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিতেছে না, ইহাতে আমি বিস্ময় বোধ করিতেছি। অথবা ইউরোপীয়গণ কিছু করিলে অন্যায় হয় না, অ-ইউরোপীয়ান কোনও অন্যায় করিলে তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। দুইজন পরহিতব্রতী ইংরেজ ভদ্রলোক সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে নিম্নশ্রেণীর লোকদের দ্বারা বসন্তরোগের দেবতার নিকট মহিষ ও ছাগ বলি দিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে লিখিয়াছেন— And these (low castes) are the brethren of the men whom a slight veneer of English education presumptuously leads to National Congress and demands for Native Parliaments. অর্থাৎ এরা (এই নিম্নশ্রেণীর লোকেরা) তাহাদেরই আত্মীয় যাহারা গায়ে ইংরেজী শিক্ষার একটুখানি পালিশ লাগাইয়া ন্যাশন্যাল কংগ্রেসে নেটিভ পার্লামেন্টের দাবী করে। এই দুই ভদ্রলোক বড়ই দয়ালু এবং ব্রাহ্মণ, রাজপুত, শিখ, জৈন, শেখ এবং

সৈয়দদের লইয়া যে পঁচিশ কোটি ভারতবাসী—তাহারা সকলেই নরখাদক। খ্রীস্টানদের মিশন এদেশে বৎসরে যত টাকা খরচ করিয়া থাকে, তাহা আমাদিগকে দিলে, আমরা মৌখিক প্রচার ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদের মধ্যে যে খ্রীস্টানী হিতাকাঙক্ষা স্বভাবতঃই আছে তাহা ইউরোপের জাতিগুলির উপকারে লাগাইতে পারি।

১৮৮৬ সনের নভেম্বর মাসে আমার বন্ধু মিস্টার টমাস ওয়ার্ড্‌ল আমাকে তাঁহার লীকে অবস্থিত গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। লীক স্ট্যাফোর্ডশিয়িরে অবস্থিত। তথাকার নিকলসন ইন্‌স্টিট্যুটের মেম্বারগণ আমাকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে বলিলেন। কি করিয়া বক্তৃতা দিতে হয় তাহা আমি জানিতাম না, তবে মোটামুটিভাবে বলিয়াছিলাম, আমাদের স্বার্থ অভিন্ন। আমি বলিয়াছিলাম, আমরা এখন যাহা উপার্জন করি, তাহা অপেক্ষা অধিক উপার্জন কি করিয়া করিতে হয়, ইংরেজদের উচিত তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। ভয়ের কারণ নাই, সেই বেশী উপার্জনের অনেকখানি অংশ ইংল্যাণ্ডেই ফিরিয়া আসিবে, যখন আমরা তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য কিনিব। ইংল্যাণ্ড বর্তমানে অন্য সব দেশ হইতে যে-সব কাঁচামাল কিনিতেছে, তাহার অনেকখানি অংশ ভারতবর্ষ হইতে কিনিতে পারে। কেন সে তুরস্ক হইতে ৩,৪৮,০০০ পাউণ্ড মূল্যের আফিঙ ক্রয় করে? বিদেশ হইতে সে বৎসরে ৩,৪৮,০০০ পাউণ্ড মূল্যের যে উদ্ভিজ্জ রঞ্জক সার আমদানি করে সেগুলি কি বস্তু? আসল কথা, ভারতের বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখিবার কেহ নাই—ইংল্যাণ্ডেও না, বাহিরেও না। অথচ ছোট্ট দেশ বেলজিয়াম—তাহারও বাণিজ্য-দূত পৃথিবীর সকল স্থানে রহিয়াছে। আমি বলিলাম ইংল্যাণ্ডের উচিত ভারতীয়দিগকে তাহাদের গ্রাম্য বেষ্টনীর বাহিরে কি করিয়া দৃষ্টি দিতে হয় তাহা শিক্ষা দেওয়া। ভারতের কাঁচামাল কেমন করিয়া সোনায় পরিণত করিতে হয় তাহা তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। বহু জাতীয় কাঁচামাল অকারণে অরণ্যে পড়িয়া নষ্ট হইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান সেগুলিকে কাজে লাগাইবার কৌশল আয়ত্ত করিয়াছে। আরও ছোটখাটো জিনিস, যাহা ভারতকে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়, তাহা তাহাকে প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইংল্যাণ্ড বর্তমানে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্স হইতে বৎসরে দশ লক্ষ পাউণ্ডের অধিক মূল্যের লেস্‌ আমদানি করে, এই লেস্‌ কি আমরা ইংল্যাণ্ডের জন্য প্রস্তুত করিতে পারি না? এইসব বলিবার পর মঞ্চ হইতে নামিবার সময় একটি ছোট্ট সুন্দরী বালিকা আমার নিকট হিন্দুস্থানীতে আলাপ করিল। এ-রকম স্থানে এই ভাষা অপ্রত্যাশিতভাবে শুনিয়া ভাল লাগিল। মেয়েটি গ্রেট ঈস্টার্ণ হোটেলের সেক্রেটারি মিস্টার লংলির কন্যা।

শেষ কয়েকটি দিন আমি লণ্ডনের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের নানা দৃশ্য ও দর্শনীয় বস্তু দেখিয়া বেড়াইলাম। দুইবার পার্লামেন্টে গিয়াছি, এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের চিরন্তন সমস্যা লইয়া বিতর্ক শুনিয়াছি। দূর হইতে পার্লামেন্টের নাম শুনিলে যেমন সম্ভ্রম জাগে, ঐখানে ভিজিটর্স্‌ গ্যালারিতে বসিয়া সমস্ত দেখিয়া এবং শুনিয়া সে সম্ভ্রম কিছু বৃদ্ধি পাইল না। ঐখানে যে সব কথা উচ্চারিত হইতেছিল তাহা যে কোনও জাতির ভাগ্য নির্ণয় করিতে

পারে ইহা বোধ হইল না। মনে হইল যে বয়স্ক বালকদের এটি একটি ডিবেটিং ক্লাব। পার্লামেণ্ট গৃহগুলিও মনে খুব ছাপ আঁকে না। যেন একটা প্রকাণ্ড শেড, গথিক ভঙ্গিতে নির্মিত, ভিতরে বহুসংখ্যক বিচার-সভা কক্ষ এবং অন্ধকার অনেকগুলি যোগাযোগের পথ। সৌধটি ১৮৪০ হইতে ১৮৫৭ সনের মধ্যে নির্মিত। পূর্বে এখানে ওয়েস্টমিনস্টার প্রাসাদ ও সেণ্ট স্টিফেনের চ্যাপেল ছিল। বাহিরে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় কুক টাওয়ার। উচ্চতায় ৩২০ ফুট, প্রকাণ্ড ঘড়ি তাহার সঙ্গে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘড়ি বলিয়া খ্যাত। দৈনিক ৪ সেকেণ্ডের বেশি তফাৎ চলে না। সপ্তাহে দুইবার দম দিতে হয়, এবং যে অংশ বাজে, তাহাতে দম দিতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে। যে ঘণ্টাটি বাজে তাহার নাম বিগ বেন। এই বিগ বেনের কাজ পূর্বে করিত "গ্রেট টম অভ ওয়েস্টমিনস্টার", এটিকে ১৬৯৯ সনে তৃতীয় উইলিয়াম-এর অনুমতিক্রমে সেণ্ট পল্‌স ক্যাথীড্রালে স্থানান্তরিত করা হয়। উইলিয়াম ও মেরির রাজত্বকালে গ্রেট টম একবার একটি মজার ভুল করিয়াছিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে একদিন বারোটার স্থলে তেরোটা ঘণ্টা বাজিয়াছিল। ইহা ধরা পড়ে কয়েক মাইল দূরবর্তী উইণ্ডসর কাস্‌লের প্রহরীর নিকট। উইণ্ডসর কাস্‌লের এক টেরাসের উপর কর্তব্যরত কালে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এই অপরাধে সামরিক আইনে তাহার বিচার হয় এবং দণ্ডাদেশ হয়। কিন্তু সে বলে সে নিরপরাধ, কারণ তাহাকে গ্রেট টম বিভ্রান্ত করিয়াছে, মধ্যরাত্রিতে সে ১৩টা বাজাইয়াছে। বিচারকগণ তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু দ্বিপ্রহরে সব প্রকাশ হইয়া পড়িল, অপর কয়েকজন ব্যক্তি আসিয়া সাক্ষ্য দিল, প্রহরীর কথা সত্য। প্রহরীকে ক্ষমা করা হইল।

পার্লামেণ্ট হাউসগুলির নিকট বিখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি। এইখানে ইংল্যাণ্ডের রাজাদিগের রাজ্যাভিষেক হয়, মাথায় মুকুট পরান হয়। ইংল্যাণ্ডে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভস্ম এইখানে রক্ষিত আছে। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি এমন একটি মনুমেণ্ট ও চ্যাপেল প্রভৃতির জটিল স্তূপ যে ইহার বর্ণনা এখানে অসম্ভব। শুধু রাজা রাণীদের সমাধি ও স্মৃতিফলক নহে, বহু অখ্যাত ব্যক্তির সমাধি ও স্মৃতিফলকও এখানে আছে। এই কারণেই গোল্‌ডস্মিথ তাঁহার চীনা দার্শনিকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—ঐটি আমার মনে হইতেছে কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির সমাধি। কি চমৎকার অলঙ্করণ, কি সুন্দর কারুকার্য, মনে হইতেছে ইহা কোনও রাজার স্মৃতি সমাধি হইবে—যিনি দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন...কিন্তু উক্ত দার্শনিক শুনিয়া হতবাক্ হইলেন, এই অ্যাবিতে সমাধি লাভ করিবার জন্য কাহারও পক্ষে কোনও বিষয় কৃতী হওয়া অত্যাবশ্যক নহে। যে বিভাগে বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাড় সমাহিত রহিয়াছে, অথবা স্মারক রক্ষিত আছে সে বিভাগের নাম পোয়েট্‌স কর্‌নার। এখানে সমাধি, পদক, আবক্ষ মূর্তি, ফলক, কিংবা স্তম্ভ আছে। এবং এমন সব ব্যক্তির আছে, যাঁহাদের নাম ভারতবর্ষেও পরিচিত। যথা বেন জনসন, স্যামুয়েল বাটলার, জন মিলটন, টমাস গ্রে, ম্যাথিউ প্রাইয়র ইত্যাদি। এডওয়ার্ড দি কনফেসরের নামে যে চ্যাপেলটি উৎসর্গীকৃত সেখানে দুইটি করোনেশন চেয়ার আছে, এখনও উহা অভিষেকে

ব্যবহৃত হয়। তাহার একটিতে স্কটল্যাণ্ডের স্কোন নামক গ্রামের একটি ধূসরাভ লাল প্রস্তর আছে, ইহার উপরে স্কটিশ রাজাদের অভিষেক সম্পন্ন হইত। ইহা তাহাদের নিকট অতি শ্রদ্ধার বস্তু। যাহা হউক অ্যাডিসন আমাকে এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে এইস্থানের ভস্ম ও অন্যান্য মৃতদের স্মারক উপলক্ষে ভাবপূর্ণ লেখা লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছেন। তিনি 'স্পেকটেট'-এ লিখিয়াছেন, যখন আমি রাজাদের ও সেই রাজাদের উচ্ছেদকারীদের একত্র এই সমাধিতে শায়িত দেখি, যখন দেখি প্রতিদ্বন্দ্বী বুদ্ধিজীবীগণ পাশাপাশি রহিয়াছেন, ধর্মীয় ব্যক্তিগণ, যাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব মত দ্বারা পৃথিবীকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারা এইখানে সহঅবস্থান করিতেছেন, তখন আমি দুঃখের সঙ্গে নৈরাশ্যের সঙ্গে এই কথাই ভাবি যে, এই বিবাদ বিতর্কের কতটুকু দাম আছে মানুষের সমাজে?—এই কথাগুলির সঙ্গে আরও এক কবির কথা যোগ করা যাইতে পারে—শেখ সাদির কথা—

"কত না ছিল বসুধাধীশ, রাজোষ্ণীষ শিরে,
কত না ছিল তুমুল বলী মুকুল মলি' ফিরে।...
প্রাণের পাকা শষ্য তারা উড়ায়ে দেছে বায়,
কেহই আর কদাপি তার চিহ্ন নাহি পায়।"

(মূল পারসিক হইতে বিহারীলাল গোস্বামী প্রণীত সাদির 'পন্দ্‌নামা' (১৯২৫) হইতে উদ্ধৃত। 'এ ভিজিট টু ইউরোপ' গ্রন্থের লেখক যে উদ্ধৃতি ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ দিয়াছেন, তাহার পরিবর্তে এই ছন্দানুবাদটিই দেওয়া হইল।—অনুবাদক।)

টাওয়ার অভ লণ্ডন পরিদর্শন করিলাম। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ইহার সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত হইয়া আছে। ১০৭৮ সনে উইলিয়াম দি কংকারার কর্তৃক এটি নির্মিত হয়, পরবর্তী রাজগণ ইহার সঙ্গে অনেক সংযোজন সাধন করিয়াছেন। ইহা তাঁহাদের নিরাপদ আশ্রয় রূপেও স্থান দিয়াছে। বিদ্রোহী ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহে দ্বিতীয় রিচার্ড এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। টাওয়ারের বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন নামে পরিচিত—হোয়াইট টাওয়ার, মিড্ল টাওয়ার, বাইওয়ার্ড টাওয়ার ইত্যাদি। হোয়াইট টাওয়ারেই দ্বিতীয় রিচার্ড তাঁহার সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অস্ত্রশস্ত্র এখানে সংগৃহীত আছে। ইংল্যাণ্ডের ক্রাউন জুয়েল, বিখ্যাত 'কোহিনুর' সহ এখানে রক্ষিত আছে। টাওয়ার আরও বিখ্যাত, কারণ রাজাদেশে বহু ঐতিহাসিক শির এখানে ছেদন করা হইয়াছে, এবং মাঝে মাঝে অনেক ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তিকে এখানে কারারুদ্ধ রাখা হইয়াছে। তৃতীয় এডওয়ার্ড কর্তৃক ব্যালিয়ল, ব্রুস্, ওয়ালেস এবং ফ্রান্সের রাজা জনকে আটক রাখা হইয়াছে। টাওয়ারের একটি স্থানকে বলা হইল ইহা প্রাচীন শিরচ্ছেদ মঞ্চ। এইখানে কুইন আন বোলীন এবং আরও অনেকের মাথা কাটা হইয়াছে। অষ্টম হেনরির সময়ের ঘাতকেরা বেশি কর্মব্যস্ত ছিল। ১৬৬৬ সনের লণ্ডন শহরে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহার স্মরণে একটি মনুমেন্ট নির্মিত হইয়াছে, তাহার উপরে উঠিয়াছিলাম। ভিতরের দিকে চক্রাকার সিঁড়ি, ৩৪৫টি ধাপ, মোট উচ্চতা ২০২ ফুট। সেই লণ্ডন ফায়ার—দি গ্রেট লণ্ডন ফায়ার ১৩,২০০টি গৃহ এবং ৪৬০টি রাজপথ ধ্বংস করিয়াছিল। অনুরুদ্ধ হইয়া একদিন সেণ্ট পল্স ক্যাথীড্রালের প্রার্থনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। ইহার পর জুওলজিক্যাল গার্ডেন দেখিলাম। অন্যান্য যাহা দেখিয়াছি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্ক অভ ইংল্যাণ্ড, ন্যাশন্যাল গ্যালারি, হ্যাম্পটন কোর্ট, এবং এক্সচেঞ্জ। কয়েকটি হাসপাতালও দেখিয়াছি, বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেণ্ট বারথলোমিউ হাসপাতাল। কেন্সাল গ্রীনের সমাধিক্ষেত্র দেখিলাম। এইখানে আমাদের দেশের বিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সমাহিত করা হইয়াছে। দেখিলাম অ্যাথেনিয়াম ক্লাব, কয়েকটি কো-অপারেটিভ স্টোর, তন্মধ্যে আর্মি অ্যাণ্ড নেভিও ছিল। আরও বহু স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, অনেক নামও ভুলিয়া গিয়াছি। মাদাম তুসো-র রক্ষিত পূর্ণ আকারের বহু মোমের মূর্তি দেখিবার মত। বহু রাজা, খ্যাত ব্যক্তি, অনেক বিখ্যাত চোর হত্যাকারীর মূর্তি প্রদর্শনী রূপে রাখা হইয়াছে। খুব জীবন্ত মূর্তিগুলি। কয়েকটির চোখ জীবন্ত চোখের মত নড়াচড়া করে। ইহার এক অংশের নাম আতঙ্ক কক্ষ। কুখ্যাত অপরাধীদের মূর্তি ও তাহাদের দ্বারা সাধিত বহু অত্যাচারের অনেক স্মারক এখানে রক্ষিত আছে। ইহার মধ্যে চার্লস পীস নামক এক প্রসিদ্ধ নরহত্যাকারী ও চোরের মূর্তি আছে। সে তাহার মুখের

ভাব এমনভাবে বদল করিতে পারিত যাহাতে তাহাকে প্রত্যেকবার এক একটি নূতন লোকের মত দেখাইত। তাহার বন্ধুরাও সে সময় তাহাকে চিনিতে পারিত না। লোকটি ইংল্যাণ্ডে জন্মাইয়া ভুল করিয়াছে, আমাদের দেশে জন্মিলে তাহাকে দেবতা জ্ঞান করা হইত, এমন পরমাশ্চর্য ক্ষমতার অধিকারী ছিল। এই কক্ষে ফরাসী বিদ্রোহ-খ্যাত মারা, রোবসপিয়ের ও অন্যান্য অনেকের মূর্তি গড়িয়া রাখা হইয়াছে। যে ছুরির আঘাতে একুশ হাজার ব্যক্তির মাথা কাটা পড়িয়াছিল, (লুই-১৬, মারি আঁতোয়ানেৎ ইহার অন্তর্ভুক্ত)—সেই ছুরিখানি এখানে রাখা হইয়াছে। ইহার অ্যালবার্ট হল, ও ক্রিস্টাল প্যালেস দেখিলাম। এটি ইংল্যাণ্ডের একটি বিস্ময়। অবশ্য নামের জন্যই ইহার খ্যাতিটা বেশি। ইহা নির্মাণে পোনের লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইয়াছিল।

অনেক সাহিত্য বিষয়ক সভায় নিমন্ত্রিত হইয়াছি। 'টাইমস' অফিসেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। ব্রিটিশ মিউজীয়াম এবং কিউ-এর বটানিক্যাল গার্ডেনস দেখিবার উপযুক্ত। ব্রিটিশ মিউজীয়াম এক বিরাট সৃষ্টি। প্রথমে সার রবার্ট কটন ব্যক্তিগত ভাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন, অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি দাখিলপত্র দিয়ে ইহার আরম্ভ, তাহার পর তাঁহার পুত্র সংগ্রহ আরও বৃদ্ধি করেন, এবং পৌত্র ১৭০০ সনে ইহা জাতিকে দান করেন। এই সংগ্রহশালাটি ১৭৩১ সনের অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ হইয়া যায়। এই সময়ে গভর্মেণ্ট মিউজীয়ামের জন্য একটি উপযুক্ত গৃহ নির্মাণে মনোযোগী হয়। ১৭৫৩ সনের একটি আইনের বলে ব্রিটিশ মিউজীয়ামের প্রতিষ্ঠা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে মানুষের আদি ইতিহাস যেভাবে চিত্রিত হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন জীবন্ত ভাবে চিত্রিত হয় নাই। এই সংগ্রহশালায় বহু বিচিত্র জিনিস আছে, যাহা অনুশীলন করিতে একটি জীবন কাটিয়া যাইবার কথা। পুরাতত্ত্ব বিভাগটাই আমাদের মত প্রাচীন জাতির পক্ষে অধিক চিত্তাকর্ষক। অ্যাসিরিয়ান ও ইজিপশিয়ান গ্যালারির কাছে এ জন্য আমার অনেক সময় কাটিল। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে কিউনিফর্ম হরফে খোদিত টেরাকোটার দিকে আগ্রহভরা দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলাম। ইহা সেই সময়ের একখানি দলিল। অ্যাসিরিয়ার রাজার কাছে দরিদ্র নাবু-বালাতসু-ইক্‌বির আবেদন। তাহার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ সে এই আবেদনে অস্বীকার করিয়াছে। আর একখানি ট্যাবলেটে একটি দাস বিক্রয়ের কাহিনী আছে, দাসের নাম আবরাইল সারারাট। ৬৪৮ খ্রীস্টপূর্ব সনের ট্যাবলেট এটি। আর একটিতে একটি হাসবুহু নাম্নী দাসী বিক্রয়ের কথা আছে। সে এবং তাহার কন্যাকে লুকুর নিকট এক মানা ও আট শেকেলের বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছে। সে যুগেও ভাই তাহার ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে প্রবঞ্চিত করিত—এ যুগে যেমন করে। একটা ট্যাবলেটে আদালতে নালিশ করার বিস্তৃত বিবরণ আছে। বুমানিটু তাহার শ্যালকের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল। বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইত, বাগান বিক্রয় করা হইত, ব্যাবিলনের নারীদের যৌতুক বিষয়ে চুক্তিপত্র রচিত হইত। ভেষজ, জ্যামিতি, অঙ্কশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ে রচনা রহিয়াছে। মামির সংগ্রহও উল্লেখযোগ্য। একটি দেখিলাম খ্রীস্টপূর্ব হাজার বৎসর পূর্বের আমেন-রা মন্দিরের দ্বাররক্ষকের কন্যার দেহের মামি। গ্রীস এবং

রোমের পুরাতাত্ত্বিক বহু নিদর্শন সংগৃহীত আছে, তবে এশিয়া সংক্রান্ত সংগ্রহ খুব বেশি নাই। ব্রিটিশ মিউজীয়ামের লাইব্রেরির তাকগুলি যদি পর পর রাখা যায় তাহা হইলে তাহার দৈর্ঘ্য হইবে চল্লিশ মাইল। বহু লোক এই মিউজীয়াম বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করিতেছে, ইহা আমার খুব ভাল লাগিল। জ্ঞান বৃদ্ধি ইহাদের কাছে একটি আনন্দের কাজ, এবং শিক্ষায় যাঁহারা অগ্রসর তাঁহারা জ্ঞানলাভের উপায়কে সর্বসাধারণের সম্মুখে আনিয়া দেওয়াতে বড় তৃপ্তি পাইয়া থাকেন। এখানকার অনেক সম্পদই ব্যক্তিগত দান। আমাদের সদ্গুণের ঝোঁক অন্য। মানুষ ও দেবতা পরস্পরের সম্পর্কে এমন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক যাহাতে মনে হয় এইবার দেবতার উচিত তাঁহাদের রুচির পরিবর্তন সাধন করা। এই আত্মনির্ভরতার যুগে তাঁহাদের কৃপণতা এবং মানুষের উপর চাপ দিয়া কিছু আদায়ের অভ্যাস ছাড়া উচিত। তাঁহাদের দেহ বায়বীয়, সেজন্য তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের দেহ নির্মাণের জন্য আমরা সোনা, রূপা এমন কি মাটিও ব্যয় করিতে সত্যই পারি না। তাঁহাদেরও উচিত আহার, বাসস্থান, সাজপোশাক এবং অলঙ্কারের জন্য আমাদের উপর নির্ভর না করা। ইহার জন্য যে পরিমাণ অর্থ তাঁহারা গ্রহণ করেন, তাহা আমাদের দেশে স্কুল, মিউজীয়াম, বিজ্ঞান শিক্ষালয়, এবং অন্ধকারে দিশাহারা মানুষদের মনে জ্ঞানের আলো জ্বালাইবার অন্যান্য উপকরণের জন্য প্রয়োজন। যদি কৃপাপূর্বক তাঁহাদের এই দীন সন্তানদের জাতীয় বাজেট ঢালিয়া সাজিতে অনুমতি দিতেন, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতা-বশতঃ আমরা সংস্কৃত শ্লোকগুলির অর্থকে ঘুরাইয়া মুচড়াইয়া দুমড়াইয়া এমন একটি বৈজ্ঞানিক স্তরে উন্নীত করিতে পারিতাম যাহাতে তাহা মিশনারিদের, আস্তিকদের নাস্তিকদের অথবা অজ্ঞেয়বাদীদের সকল আক্রমণের বিরুদ্ধে বহু কাল আত্মরক্ষা করিতে পারিত।

ইউরোপের মিউজীয়াম-সমূহ, যেখানে পৃথিবীর নানা স্থান হইতে নৃতাত্ত্বিক নমুনা সংগ্রহ করা হইয়াছে, সেখানে দাঁড়াইলে ভারতবাসীর মনে দুঃখ ও দীনতার ভাব জাগিয়া উঠিবে। সেখানে তাহার নিজের স্থান বর্বরদের সঙ্গে। যাহারা নরখাদক, যাহারা নরবলি দেয়, ধর্মের নামে সর্বাঙ্গে উল্কি পরে, এবং অন্যান্য যে সব প্রথা বর্বর জাতির বিশেষত্ব, ভারতবাসীর স্থান তাহাদেরই সঙ্গে। ইউরোপের জাতি-সমূহ অনেক দিন আগে এই জাতীয় প্রথা ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা এখন ইহাকে বিভীষিকার চোখে দেখে। ইহা পরিতাপের বিষয় যে, আমরা যখন ভারতবর্ষে প্রাচীন হিন্দুত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি, একশত বৎসর আগেও যাহা ছিল, নরবলি, অঘোর পন্থার নরমাংস ভক্ষণ, বিধবা পোড়ান, এবং এই জাতীয় সব পুণ্যলাভের প্রথা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছি, সেই সময়ে ইউরোপীয়গণ এই সব ঐহিক ও পারলৌকিক পুণ্যলাভের পদ্ধতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। আমাদের ধর্মপ্রাণতার এই সব লক্ষণকে যে সব গভীর যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই ইউরোপীয়দের কানে তাহা পৌঁছায় না। অতএব আমাদের কর্তব্য হইতেছে আমাদের যাবতীয় দুর্বোধ্য শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া জনকত ইউরোপীয় পণ্ডিত আমাদের যে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইখানে দাঁড়াইয়া ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত জেদকে ঘৃণার

চোখে দেখা এবং দেশপ্রেমিকতার সঙ্গে তাহাদের রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, তাহাদের বিজ্ঞান এবং তাহাদের যাবতীয় শিক্ষাকে তুচ্ছ করা। আমাদের কি ঐ সব জিনিস হাজার হাজার বৎসর পূর্বে ছিল না? সবই তো আমাদের হাতের এই গ্রন্থগুলিতে রহিয়াছে? এবং আরও অনেক জিনিস যাহা ইউরোপ বা অ্যামেরিকায় পুনরাবিষ্কৃত পুনরুদ্ভাবিত হইলেই আমাদের বুদ্ধি আমাদিগকে ইহা দেখাইয়া দিবে।

আমাদের উপচিয়া পড়া জাতীয় গৌরবের সঙ্গে আরও একটি গৌরব যোগ করিয়াছি—আমরা সন্তোষজনক ভাবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি যে প্রাচীন মেক্সিকোর পুরোহিতদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা ছিল—সেই সব পুরোহিত যাহারা অধিকাংশ তরুণদের বলির অস্ত্রদ্বারা হত্যা করিত এবং তাহাদের মাংস রান্না করিয়া খাইত। প্রাচীন ধর্মের এটি একটি সুন্দর অঙ্গ, এবং আমাদের স্বদেশবাসী ইহার প্রতি বড়ই অনুরক্ত, এবং গুপ্ত সাধনা রূপে ইহা পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য উন্মাদ হইয়াছে। কিন্তু হায়, আমরা এক দুর্নীতির যুগে বাস করিতেছি। এ যুগে সহিষ্ণুতার অভাব ঘটিয়াছে। আমাদের ধর্মের স্বাধীনতা ইংরেজরা সহ্য করে এ কথা সত্য নহে। তাহারা কি অঘোরীদের পচা নরমাংস খাওয়া সহ্য করিবে? তাহাদের সকল কাজই পবিত্র কাজ। অঘোরপন্থীগণ সাধনার গভীরে পৌঁছিয়া সকল ভালমন্দ সুখ দুঃখ সুগন্ধ দুর্গন্ধকে পার হইয়া গিয়াছে। ইংরেজরা কি আমাদের দেবীর শুষ্ক তৃষ্ণার্ত জিহ্বা খুঁতহীন বালকের রক্তে ভিজাইতে দিবে? অথবা আমাদের বিধবা ভগিনীদের আত্মাকে দ্রুত স্বর্গে প্রেরণের উদ্দেশ্যে পুড়াইয়া মারিতে দিবে? আমাদের বন্ধু ঠগদের ধর্মকে তাহারা পদদলিত করিয়াছে। এই ঠগেরা ম্যালথাসের নীতিকে কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যেই ত নরহত্যাকে ধর্মের অঙ্গ রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। এ দেশ আমাদের মুসলমান বন্ধুদের ভাষায় বলা যায় দার-উল-হর্ব। ইহা এখন হিন্দুদের বাসের অযোগ্য। ইংরেজরা যখন নরবলি বন্ধ করিল, তখন হিন্দুধর্মের বৃক্ষকে পত্রহীন করিল। এবং তাহারই ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মধ্য প্রদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের ইহাই বিশ্বাস। কারণ ইংরেজ আসিবার পূর্বে এদেশে দুর্ভিক্ষ ছিল না (দ্রষ্টব্য: সার হেনরি এলিয়টের আট খণ্ডে সমাপ্ত ইতিহাস, বিশেষ করিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকের যে অংশ তাহার অন্তর্ভুক্ত।) ইংরেজরা যখন সতীদাহ উচ্ছেদ করিল, তখন হিন্দুধর্মের বৃক্ষকে শাখাহীন করিল। যখন তাহারা কলিকাতায় জলের কল স্থাপন করিল, তখন হিন্দু ধর্মের বৃক্ষকেই ছেদন করিল। আমরা এ সবের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য আন্দোলন করিয়াছিলাম। প্রত্যেকটি প্রশ্নকেই আমরা জাতীয় প্রশ্ন করিয়া তুলিয়াছিলাম। আমরা সভা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি সতীদাহ উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, বিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি, জলকল স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছি। রামমোহন রায়, মহেন্দ্রলাল সরকার, মালাবারী, এবং বম্বাইতে যাহারা কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছে, এই রকম কয়েকজন দলত্যাগী না থাকিলে, আমাদের নাম চিরপবিত্র থাকিতে পারিত, কারণ সতীদাহ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইলে আমাদের কেহ দোষ দিতে পারিত না, দোষ সম্পূর্ণ ইংরেজের হইত।

কিন্তু বিদ্রূপ থাক। এখন গুরুতর চিন্তার সময় আসিয়াছে। এখন আমাদের বিশ্বের জাতিসমূহে সত্য স্থান কোথায়। কল্পনা অথবা অলীক স্বপ্ন দেখার দিন আর নাই। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে আমরা কি ছিলাম, তাহার কোনও মূল্য আর নাই। এমন কি যদি আমরা ধরিয়াও লই তখন মহৎ এবং সৎ ছিলাম, তাহা হইলেও তাহার এখন কোনও মূল্য নাই। আমাদের গ্রন্থে উল্লেখিত মহানিম্ব বর্তমানের সিঙ্কোনা অফিসিনালিজ একই বস্তু কি না ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। কিংবা কুরুক্ষেত্র অদ্যকার রাশিয়া, অথবা ঈজিপট এবং মেক্সিকোতে ভারত উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহা ভাবিয়াও কোনও লাভ নাই। কিন্তু আজ আমরা কি, ইহা চিন্তা করার সার্থকতা আছে। কারণ তাহা দ্বারাই পৃথিবী আজ আমাদের বিচার করিবে, আমরা কি ছিলাম তাহা দিয়া নহে। একজন পুরাতত্ত্ববিদ্ বা একজন সংস্কৃতের পণ্ডিত আমাদের বিষয়ে কৌতূহলী হইতে পারে, কিন্তু ইউরোপের প্রত্যেকটি পুরুষ বা নারী পুরাতাত্ত্বিক অথবা সংস্কৃতে পণ্ডিত নহে। সত্য কথা বলিতে কি, কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে যাযাবর জাতি পঞ্জাবের সমতল ভূমিতে যে গান গাহিত তাহা জানিয়া পৃথিবী স্তম্ভিত হইয়া যায় নাই। দূরের পৃথিবী আমাদের দেশে কন্ধ এবং ব্রাহ্মণে কি তফাৎ তাহা জানে না, একজন জৈন ও একজন মুসলমানে কি তফাৎ তাহা জানে না, অতএব জৈন জীববলির নিন্দা অথবা মুসলমান সতীদাহ প্রথার নিন্দা করিলে তাহাদের কানে তাহা পৌঁছায় না। সবাই মিলিতভাবে বড় কিছু করিলে তাহা দ্বারা আমাদের বিচার হইবে। আমাদের প্রাচীন সভ্যতা এখন অচল হইয়া পড়িয়াছে, এবং সচল থাকিতে পারিত যদি তিন শত বৎসর আগের ইউরোপ আজ বর্তমান থাকিত। এমন কি আমার মতে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও দুই জাতির দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। গত পঞ্চাশ বৎসরে যে সব আবিষ্কার ঘটিয়াছে, আমাদিগকে তাহা একটি বিশেষ ধর্ম ও দর্শনের সীমার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে, এবং যাহা সকল যুগের মানুষ তাহাদের বিবেককে তৃপ্ত করিবার জন্য হীনতর জাতি-সমূহের জন্য মাঝে মাঝে রচনা করিয়া থাকে। মানুষ স্বার্থ দ্বারা চালিত হইয়া থাকে, এবং স্বার্থ যিনি বুদ্ধি এবং কার্যকারী ভিত্তির উপর করিতে পারেন, তাঁহাকেই নেতা বলিয়া মানা যাইতে পারে। তিনি বিদ্বান্ হইতে পারেন, ধার্মিক হইতে পারেন, শক্তিশালী হইতে পারেন। কোথাও তুমি অতীতের জন্য করুণা অথবা সম্মান পাইবে না, শুধু আবেগপ্রবণ মানুষ তাহা করিতে পারে। এই আবেগ জন্মগত, কাহারও শিক্ষা হেতু নহে। পরম নিষ্ঠাবান্ খ্রীস্টানও তাহার বিবেকের সম্মতিক্রমে কৃষ্ণাঙ্গের উপর প্রবল অত্যাচার করিতে পারে, যদি সে ইহা প্রমাণ করিতে পারে যে সে হ্যামের বংশধর। প্রবল যুক্তিনিষ্ঠ মানুষও পৃথিবীর সর্বত্র আগুন ও তরবারি লইয়া লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি করিয়া নিজের নীতিধর্মকে খুশি রাখিতে পারে, কারণ সে ইহা করিতেছে প্রকৃতিকে তাহার অগ্রগমনে সাহায্য করিবার জন্য, ধ্বংস পুনর্গঠনের জন্য। এবং প্রবল এবং দেশপ্রেমিক ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণতাকে নস্যাৎ করিয়া নিজের লাভ ও গৌরব অর্জনের জন্য বাহির হইতে পারে। ইহাই পৃথিবীর রূপ এবং চিরকাল ইহাই ঘটিয়াছে। অতএব আমাদের উচিত

আত্মানুসন্ধান করিয়া আমাদের ত্রুটি কোথায় তাহা বাহির করা, এবং যদি আমরা পৃথিবীর সম্মান লাভ করিতে চাহি তাহা হইলে তাহা সংশোধন করা। তাহা যদি না পারি, তাহা হইলে বর্বরদের সমশ্রেণীভুক্ত হওয়া ভিন্ন উপায় কি?

সাউথ কেনসিংটন মিউজীয়ামে শিল্প-নিদর্শন-সমূহ রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটিতে নানা মনুমেণ্ট, বিজয়-তোরণ, স্থাপত্য ডিজাইনের প্ল্যাস্টার কাস্ট ও স্ট্যাচু রহিয়াছে। মূল ট্রাজানের স্তম্ভের প্ল্যাস্টার কাস্ট রহিয়াছে। নানা জাতীয় পাত্র, হাতীর দাঁতের কাজ, ব্রঞ্জ, সোনা, রূপা, কাঠ ও অন্যান্য নানা হস্তশিল্প পৃথিবীর নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সব সংগ্রহের মধ্যে চারিটি চাইনীজ-ভিলা রহিয়াছে। এগুলি চীন-সম্রাট নেপোলিয়ানের প্রথমা স্ত্রী জোসেফিনকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু যে জাহাজে আসিতেছিল তাহা পথিমধ্যে একখানা ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ কর্তৃক আটক হয়। আমিয়াঁর সন্ধির (১৮০২) পরে ব্রিটেন ইহা ফ্রান্সকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু ফ্রান্স উহা লইতে অস্বীকার করে। এই মিউজীয়ামের একটি বিভাগে ভারতীয় ধাতু শিল্পের অনেক নিদর্শন রক্ষিত আছে। কিউতে অবস্থিত বটানিক্যাল গার্ডনস্ অপূর্ব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল দেশের উদ্ভিদ এখানে দেখা যাইবে।

ডিসেম্বর মাস আসিয়া পড়িয়াছে। পথে ঘাটে তুষারপাত আরম্ভ হইয়াছে, দিন হ্রস্ব হইয়াছে। আমারও ইংল্যাণ্ড হইতে বিদায় লইবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে। আট মাসের মধ্যে আমি সেখানে যত জিনিস দেখিলাম, তাহা কোনো ভারতীয় তাহার নিজের দেশে বাস করিয়া সমস্ত জীবন ধরিয়াও দেখিতে পারে না। ইংল্যাণ্ডের পরিমণ্ডলে এমন কিছু আছে যাহা দৃষ্টি খুলিয়া দেয় এবং মন প্রসারিত করে। আমরা এখানে যে সব বিশেষ সুবিধা পাইয়াছিলাম, তাহা ছাত্র অথবা পর্যটকদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নহে। উচ্চ অথবা নিম্ন সকল শ্রেণীর ইংরেজ এবং সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া হইতে মিডল্যাণ্ডের কৃষকগণ পর্যন্ত আমাদিগকে আন্তরিকভাবে খাতির করিয়াছিলেন। প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার সহিত তাহা আজীবন স্মরণ করিব।

আমি ১৩ই ডিসেম্বর হল্যাণ্ডের রটারডাম অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ইউরোপ মহাদেশে আমার ভ্রমণ দ্রুতগতির ভ্রমণ। অতএব যে সব স্থানে গিয়াছিলাম সেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বর্ণনা করিতে পারিব না। ইউরোপ হইতে যে সব পর্যটক ভারতে আসে, আমি সেরূপ গুণসম্পন্ন ভ্রমণকারী নহি। বম্বাই হইতে ছুটিয়া কলিকাতা আসা, সেখানে একদিন থাকা, অন্যস্থানে আর একদিন থাকা, রেলওয়ে হোটেলে, অথবা কলেক্টরের বাংলোয়, তরাই অঞ্চলে একটি বাঘ শিকার যাত্রা—এই সব মিলিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে এই উপকথার দেশের সকল রহস্য মেলিয়া ধরে। সে আমাদের দেশের সমস্ত কাহিনী জানিয়া ফেলে—আমাদের দেশ কেমন করিয়া গঠিত হইল, প্রাণী আবির্ভাবের পূর্ব যুগে কেমন ছিল, এদেশের জমি কেমন, উদ্ভিদ কি জাতীয়, এদেশের পর্বত, অরণ্য, সমুদ্র,

নদী, দেশের সরীসৃপ প্রাণী, মাছ, পাখী, স্তন্যপায়ী জীব, মেরুদণ্ডহীন প্রাণীকুল, এদেশের বাতাস যাহাতে জীবাণু উড়িয়া বেড়ায়, এবং আরও অনেক বিষয় তাহারা জানিয়া ফেলে। এবং তুমি যদি তোমাদের ধর্ম, আচরণ, রীতিনীতি, কুসংস্কার, জীবনযাত্রা, খাদ্য পানীয়, তোমাদের চিন্তাধারা ইত্যাদি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য জানিতে চাহ, তাহা হইলে সে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াই যে বই প্রকাশ করিবে তাহা পড়িও। আমি বলিয়াছি আমি সেরূপ জিনিয়াস নহি। অতএব আমার আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইবে।

১৮৮৬ সনের ১৪ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে মস্ নদীর উপর দিয়া প্রিন্সেস অভ ওয়েলস নামক স্টীমারে রটারডাম অভিমুখে চলিতেছি। নদীর দুই পাশে সবুজ সমতল জমি। সমুদ্র হইতে এ জমি হল্যাণ্ডবাসীদের বুদ্ধি-কৌশলে কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। কৌশলী রাষ্ট্রনৈতিকের ন্যায় ইহারা বাতাসকে জলের অনিষ্টকর শক্তি নষ্ট করিবার কাজে লাগাইয়াছে। দেশটি উইণ্ডমিলে ভরা। (উহারা সমুদ্র হইতে নিচুর ভূমির দেশ হইতে অধিকাংশ জল পাম্প করিয়া বাঁধের বাইরে চালান করিতেছে।) দেখিলাম সকালের মৃদু হাওয়াতে উইণ্ডমিলগুলির প্রকাণ্ড পাখাগুলি ঘুরিতেছে : এই হাওয়া চালিত কলের সাহায্যে উহারা শস্য চূর্ণ করা, কাঠ চেরার কাজ প্রভৃতি করে। আমি বুঝিতে পারি না, ভারতে এই জাতীয় হাওয়া কল ব্যবহৃত হয় না কেন। ইহা অতি প্রাচীন কালের জিনিস, অতএব হিন্দুদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার কথা নহে। অবশ্যই হাওয়া কল চালাইতে আমাদের দেশে কোনও অলঙ্ঘ্য বাধা আছে। অন্তত পক্ষে প্রাচীনকালে ছিল। আমাদের দেশের হাওয়ার গতি বারবার বদল হয়, এই জন্যই কি? আমি কানপুরে একটি অ্যামেরিকান উইণ্ডমিল বসান হইয়াছে দেখিয়াছি, কিন্তু ইহার ফল কি হইয়াছে জানি না। কয়েক বৎসর পূর্বে আর একটি ছোট হাওয়া কল দেখিয়াছি বুলান্দশহরের মেলায়। যে কারিগর ইহা প্রস্তুত করিয়াছিল সে সেজন্য মহা গর্বিত। আমরা সাড়ে নটায় রটারডামে পৌছিলাম। এটি হল্যাণ্ডের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর। অনেকগুলি প্রণালি শহরকে কাটিয়া দিয়াছে, এগুলি রাজপথের কাজ করে। নদীর ধারে ছায়াবৃত বীথি বুমপিয়েজ নামে অভিহিত, কাঠ পুঁতিয়া পুঁতিয়া তাহার ভিত্তির উপর নির্মিত। এখানকার মাটি অত্যন্ত নরম, দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন সম্ভব নহে। কাজেই ইহার ভিতর বহু কাঠ প্রোথিত করিয়া তাহার উপর অট্টালিকা নির্মাণ কারা হয়। সমস্ত অ্যামস্টারডাম নগরটিই এইভাবে নির্মিত হইয়াছে। ইটালির ভেনিসও তাই। রটারডামে একটি জুওলজিক্যাল গার্ডেন ও একটি বটানিক্যাল গার্ডেন আছে। এক্‌স্‌পেরিমেণ্টাল ফিলসফির জন্য একটি সমিতি আছে।

এখান হইতে আমি হারলেম শহরে আসিলাম। হল্যাণ্ডের এটি অন্যতম বড় শহর। এখানে আমার বন্ধু ভ্যান এডেনের অতিথি হইলাম। ইনি কলোনিয়াল মিউজীয়ামের ডাইরেক্টর। এখানকার মিউজীয়াম দেখিলাম। ডাচ ইস্ট ইণ্ডিজ হইতে সরকারের পক্ষ হইতে ইনি বহু মূল্যবান্ জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। ওলন্দাজেরা তাহাদের অধিকারভুক্ত পূর্বদেশের সকল ভূখণ্ডই ইণ্ডিয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে। জাভা, সুমাত্রা

বোরনিও, ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জ—তাহাদের কাছে ইণ্ডিয়া। ডাচ কলোনিয়াল মিউজীয়ামে আমি সাপের চামড়ায় প্রস্তুত নানা জিনিস দেখিলাম। ফরাসীরা এই চামড়া বাক্সের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করে। চাহিদা বেশি, কিন্তু যোগান বেশি নহে। সুতরাং সাপ মারিয়া যাহারা সরকারী পুরস্কার লাভ করে তাহাদের এদিকে একটি ইঙ্গিত দিলাম। জাভা ও সুমাত্রার পাখীদের পালক হইতে নানারূপ অলঙ্করণের দ্রব্য প্রস্তুত হয়। উজ্জ্বল পালক সকলকেই আকর্ষণ করে— বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত সবাইকে। মহিলাদের টুপির অলঙ্কার রূপে ইউরোপে প্রচুর পালক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দক্ষিণ ইউরোপে ইহার ব্যবসা খুব জোর চলে। আনারসের পাতার আঁশ হইতে ফিলিপিনের লোকেরা সুন্দর কাপড় প্রস্তুত করে। আমরা টাউন হল দেখিলাম, সেখানে একটি চিত্রশালা আছে। "সীজ অভ হারলেম" বা হারলেম অবরোধ নামক চিত্রখানির জন্য হারলেমের অধিবাসীগণ গর্বিত। আক্রমণকারী স্পেনীয়দের বিরুদ্ধে ঐ সময়ে স্ত্রীপুরুষ মিলিতভাবে লড়াই করিয়াছিল। এল. কস্‌টার ইউরোপে টাইপ-প্রিন্টিং প্রবর্তন করেন ওলন্দাজেরা এরূপ দাবি করিয়া থাকে। তাঁহার জন্যও হারলেমবাসীগণ গর্বিত, কারণ তিনি ছিলেন হারলেমবাসী। তিনি যে গৃহে বাস করিতেন, তাহার সম্মুখে তাঁহার একটি মূর্তি স্থাপিত হইয়াছে, তিনি যেখানে ব্লক-মুদ্রণের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন সেখানেও একতটি স্মারক করা হইয়াছে। লিনিউস তাঁহার "সিসটেমা" (শ্রেণীবিভাগ রীতি) হারলেমে বসিয়া লিখিয়াছিলেন। এখানে একটি বৈজ্ঞানিক মিউজীয়াম ও উদ্ভিদতত্ত্ব বিষয়ে একটি গ্রন্থাগার আছে। এই শেষোক্ত স্থানে আমি একটি মহিলাকে উদ্ভিদবিষয়ে চিত্রাঙ্কণ করিতে দেখিলাম। তিনি নিজে উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ইউরোপে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। হারলেমের পাশে পূর্বে একটি হ্রদ ছিল। ইহা হইতে জল নিষ্কাশিত করিয়া সত্তর হাজার একর জমি চাষের জন্য উদ্ধার করা হইয়াছে। প্রচুর হায়াসিন্থ ও টিউলিপ ফুল এবং অন্যান্য বাল্‌ব বা কন্দ হারলেমের চারিদিকে উৎপন্ন হয়। এগুলি বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ইউরোপে টিউলিপের জন্য এক জাতীয় মেনিয়া বা উন্মাদনা জাগিয়াছিল আড়াইশো বৎসর পূর্বে। সেই সময় ইহার একটি কন্দ বা মূল ষাট হাজার টাকায় বিক্রয় হইয়াছে।

সন্ধ্যাবেলা হারলেমের একজন বৈজ্ঞানিক ভারত হইতে আগত এই ব্রাহ্মণকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন। আলাপ শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিষয়ে আরম্ভ হইল। আমি বলিলাম সত্য ব্রাহ্মণের কোনও বিশেষ দেশ নাই, কোনও বিশেষ মতবাদ নাই। ব্রাহ্মণ সকল দেশের। তাহার শিক্ষা বিশ্বজনীন ন্যায়ধর্ম বহুকাল পূর্বে সে আবিষ্কার করিয়াছে, সমগ্রের সে একটি অংশমাত্র। কিন্তু সে যাহা প্রচার করিয়াছিল পৃথিবী তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতএব অকাল-বৃদ্ধির ভারে নুইয়া পড়িল। হাজার বৎসর ব্যাপী রফা করিতে করিতে এমন স্তরে নামিয়া আসিল যাহাতে আলোকভীরুদের তাহা সহনযোগ্য হয়। কিন্তু জ্ঞানের অগ্রগতির ফলে অবশ্যই একটা উদারতা আসিবে, যাহা অন্তত কিছুদিনের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বিজ্ঞান-চেতনা-সম্পন্ন

মানুষের ধর্মীয় আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করিতে পারিবে। সংস্কৃতে পণ্ডিতদের আমি বিশেষ করিয়া সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক পদ্ধতি এবং উত্তর মীমাংসা সযত্নে পড়িতে বলিয়াছি। কিন্তু সবার উপরে ভগবদ্‌গীতা। আমি বলিয়াছি, আমার মতে ইউরোপের পণ্ডিতগণ প্রাচীন ভারত সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা গঠনের পথে দুইটি বাধা পাইয়াছেন। প্রথম বাধা, তাঁহাদের বিশ্বাস, পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর হইল সৃষ্ট হইয়াছে; দ্বিতীয় বাধা, বাইবেলে কথিত দেশগুলির প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিক ঝোঁক। তাঁহারা বরং বলিবেন আমরা মনু পাইয়াছি ঈজিপ্ট হইতে, বলিবেন না ঈজিপ্ট মেনেস পাইয়াছে আমাদের নিকট হইতে। আমরা অ্যালজেব্রা আরব দেশ হইতে পাইয়াছি এ কথা তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিবেন, কারণ আরবরা লিখিতভাবে কোথাও উল্লেখ করেন নাই যে উহা তাহারা ভারত হইতে পাইয়াছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমরাই তাঁহাদের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব গঠন করিতে সাহায্য করিয়াছি, ইহা যে যথাযথ স্বীকার পাইয়াছে, আমি এরূপ কোথাও দেখি নাই। তাঁহারা এড্ডা ও ডের নিবেলুংগেন লিডকে আমাদের পুরাণ সংস্কৃত মহাকাব্য হইতে অধিক প্রশংসা করিবেন। আমার বন্ধুগণ বলিয়াছিলেন ইউরোপে আমাদের দেশ হইতে প্রচারক পাঠাইয়া ইউরোপকে আমাদের ধর্মে দীক্ষিত করা উচিত। আমি বলিয়াছিলাম, আগে নিজেদের ঘর সামলাই। আমাদের দেশ এখন একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, আধ্যাত্মিক ও ঐতিহ্য বিষয়ে যুদ্ধ। তবে ইউরোপের ন্যায় তাহা জমি দখলের যুদ্ধ নহে। আমাদের সমস্ত ঐতিহ্য ব্যাপার আধ্যাত্মিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, যাহার ফলে কিভাবে বাড়ি প্রস্তুত করিতে হইবে, কি খাইতে হইবে, কি হইবে না, কোন্ ঔষধ খাইতে হইতে, কোন্‌টি হইবে না, কোন্ পানীয় গ্রহণ করিতে হইবে, কোন্‌টা হইবে না, এই কাপড় পরিবে. এইটি পরিবে না, এই তারিখে যাত্রা শুভ, এই তারিখে নহে, মৃত্যু এই স্থানে শ্রেয়ঃ ইত্যাদি মানিয়া চলিতে হয়। কিন্তু ঐহিক দাবি এই বন্ধন হইতে আমাদিগকে মুক্ত করিতে চাহে। আধ্যাত্মিকতা ঐতিহ্যের এবং অলৌকিক শাস্ত্রে সম্মান বহন করিতেছে, আর ঐহিক প্রয়োজনের পিছনে আছে ভীরু সাধারণ বুদ্ধি এবং চির-সঙ্কোচ এবং চির-সন্দেহযুক্ত বিজ্ঞান। তথাপি ভবিষ্যতে কি ঘটিবে বলা যাইতে পারে। আমার বন্ধু যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দেশে ফিরিয়া গেলে পৃথক থাকিব কি না, কারণ বন্ধু বলিলেন, তোমার চিন্তাধারা ইউরোপীয়দের ন্যায়,—প্রাচ্য জাতীয় নহে। আমি বলিলাম, প্রাচ্যদিগকে হাল্কাভাবে দেখিবেন না। সূর্য পূর্ব দিকে উদয় হয়, ইহা আত্মিক অর্থেও সত্য। আরও পূর্ব দেশবাসী কনফিউসিয়াসকে তাঁহার শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, মানবের কর্তব্য কি, এক কথায় বলিয়া দিন উত্তরে তিনি বলিলেন, অন্যেরা তোমার প্রতি যাহা করিলে তোমার নিকট অপ্রীতিকর বোধ হয়, তুমি অন্যের প্রতি সেরূপ করিও না। পাঁচশত ত্রিশ বৎসর পরে আর এক বিখ্যাত প্রাচীবাসী পূর্বের বিপরীত প্রান্ত হইতে ঐ একই কথা বলিয়াছিলেন। এই দুইয়ের মধ্য দেশে, অর্থাৎ ভারতে, কনফিউসিয়াস ও খ্রীস্টজন্মের বহু বৎসর পূর্বে আমাদের ঋষিগণ শুধু এই প্রকার উক্তিই করেন নাই, তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, শুধু মানুষের প্রতি

নহে, মৃত্যু-যন্ত্রণা-বোধ-সম্পন্ন প্রাণী মাত্রেরই প্রতি সম ব্যবহার করিবে। বহু-পদ-বিশিষ্ট কেন্নো দেখিয়াছেন? আমাদের দেশকে ইহার সহিত তুলনা করুন এবং মনে করুন আমি তাহার একখানি পা। দেহ হইতে পৃথক হইলে আমার মৃত্যু, কিন্তু যুক্ত থাকিলে আমি তাহার অগ্রগমনে সাহায্য করি। অনেক পা পূর্বে পৃথক হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহারা এঞ্জিন হইতে বিচ্ছিন্ন চাকার ন্যায়, অগ্রগমনে আর সাহায্য করিতেছে না।

পরদিন মিস্টার ভ্যান এডেন আমাকে অ্যামস্টারডামে লইয়া আসিলেন। আমরা প্রথমে গেলাম ডক্টর হেুস্টেরমান-এর নিকট। তাঁর বয়স ৮০ বৎসর। পৃথিবীর একজন সেরা প্রকৃতি-বিজ্ঞানী। তিনি আমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং ব্রিটিশ ভারতের কি পরিমাণ উন্নতি হইতেছে সে বিষয়ে নানা প্রশ্ন করিলেন। স্থানীয় পশুশালার তিনি প্রেসিডেন্ট, সেখানে অন্যান্য অনেক পশুর মধ্যে কয়েকটি সিংহ ও শাবকসহ সিংহী দেখিলাম। ইহার পর মিস্টার স্থইর্সট্রার নিকট আসিলাম, ইনি কে, জুওলজিক্যাল গার্ডনস্ নাটুরা আর্টিস ম্যাজিস্টর তত্ত্বাবধায়ক। ইঁহার পৃথিবীর বহু জাতীয় প্রজাপতির ও পোকার একটি সংগ্রহ আছে। অ্যাকোয়ারিয়ামের তত্ত্বাবধায়ক মিস্টার জি. ইয়ান্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। অ্যামস্টারডামের এই অ্যাকোয়ারিয়ামটি ইউরোপের মধ্যে একটি সেরা অ্যাকোয়ারিয়াম। ইহার মধ্যে দুই সারিতে লবণাক্ত জল ও সাদা জল—দুই স্থানের মাছই আছে। চার বৎসর পূর্বে মিস্টার ইয়ান্‌সে সমুদ্র হইতে প্রয়োজনীয় জল পাইয়াছিলেন। অবিরাম স্রোত বহাইয়া ইহা রক্ষিত হইতেছে। এক দিকে এই জল পরিশ্রুত হইয়া পাম্‌পের সাহায্যে উপরে উঠিতেছে। এখানকার সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সংগ্রহশালা—এখানকার রির্কস মিউজিয়াম। এখানে বিখ্যাত শিল্পীদের অনেক চিত্র রহিয়াছে। রেমব্রাণ্টের বিখ্যাত চিত্র নাইট ওয়াচ, ল' কনফ্রের দে মারশাঁ দ', দ্রা' ওফেলিন দ' আম্‌সতারদাম্ব ইত্যাদি। উত্তর সাগরের খাল ও উত্তর হল্যাণ্ডের খাল জার্মান সমুদ্রের সঙ্গে অ্যামস্টারডামকে যুক্ত করিয়াছে। শহরটিও অনেকগুলি খালের দ্বারা বিভক্ত। হল্যাণ্ডের খাল ১৩০ ফুট প্রশস্ত ও উত্তর সাগরের খাল ২০০ হইতে ৩৩০ ফুট প্রশস্ত। শহরটি প্রকারান্তরে ৯৫টি দ্বীপের দ্বারা গঠিত, এগুলি পরস্পর ৩০০টি সেতু দ্বারা যুক্ত। জমি নরম, তাই এখানেও বহু কাঠ পুঁতিয়া তাহার উপর নগর নির্মিত হইয়াছে। এগুলিকে পাইল বলা হয়। রাজপ্রাসাদ ১৪০০০ পাইলের উপর নির্মিত। ভিত্তি দৃঢ় হইলেও অট্টালিকা অধিক ভারী হইলে তাহার চাপে উহা নিচে নামিয়া যাইতে পারে। বৃহৎ শস্য গোলাটি ১৮২২ সনে সাড়ে তিন হাজার টন শস্য সমেত এইভাবে নষ্ট হইয়াছিল। অ্যামস্টারডাম হীরককাটা শিল্পের জন্য খ্যাত। এই কাজে দশ হাজার কর্মী নিযুক্ত আছে, অধিকাংশই জ্যু। কোস্টার্সের প্রতিষ্ঠানটি সর্ববৃহৎ, এখানে হীরককাটার চাকাগুলি মিনিটে ২ হাজার বার ঘুরিতেছে। এক গুণিতে যত সময় লাগে তাহার মধ্যে চাকা ত্রিশ বার ঘুরে।

হল্যাণ্ডের শিক্ষিতদের অনেকেই ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মান বলিয়া থাকে। বাণিজ্যের ভাষা ইংরেজী, কূটনীতির ভাষা ফরাসী এবং জার্মান শক্তিশালী প্রতিবেশীর ভাষা রূপে

শেখা হয়। একজন কূটনীতিক আমাকে বলিলেন, ফরাসী ভাষায় নিখুঁতভাবে ভাব প্রকাশ করা যায়। আমি বলিলাম, ইহাতেই ত অসুবিধাবোধ করা উচিত। তিনি আমার দিকে বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। আমি এ কথা বলিয়াছিলাম, কারণ রাজনীতিকেরা স্পষ্ট অর্থবোধক ভাষাই ত সর্বাপেক্ষা বেশি এড়াইয়া চলিতে চাহেন। সোজাসুজি হ্যাঁ বা না বলা পরিত্যাজ্য। কিন্তু উহা ঘুরাইয়া কৌশলপূর্ণ ভাষায় বলিলে প্রশংসাই হয়। কোনও কোনও ব্যক্তির এরূপ কৌশলপূর্ণ ভাষায় বলা সহজে আসে, কাহারও বা ইহা শিখিয়া লইতে হয়। ইউরোপের লোকেরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চলে। অপরাধীকে হত্যা করা সেখানে একটি আর্ট, তেমনি সত্যকেও উহারা কৌশলে হত্যা করে। একমাত্র দলীয় সাংবাদিকতায় সত্যকে অবিজ্ঞানোচিত পদ্ধতিতে হত্যা করা চলে। অস্ত্র যত ভোঁতা হয়, তত অর্থলাভ ঘটে। আমি যে কৌশলের কথা বলিতেছি বর্বরদের তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অর্ধ বর্বর সমাজে ইহা আরম্ভ মাত্র, অত্যন্ত স্থূল, এবং তুচ্ছ ব্যাপারে উল্লাস সভ্য সমাজে ইহা পাকা শিল্প।

অ্যামস্টারডাম হইতে প্যারিসে আসিলাম। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরী-সুন্দরী এই 'পারি' সুন্দরীকে তাহার নিকুঞ্জরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার সমস্ত সুন্দর, ইহার সুগঠিত পার্কগুলি ইহার ঝকঝকে পরিষ্কার পথ, সম সৌন্দর্যে গঠিত প্রাসাদগুলি পথের দুইধারে শোভা পাইতেছে। যে অলক্ষ্য সৌন্দর্য-দেবতা এই শহর গড়িয়াছেন, তাঁহাকে অনুরোধ জানাই, তিনি দয়া করিয়া আমাদের কলিকাতা শহরের উপর যে ঘৃণ্য প্রেত তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাকে তাড়াইয়া দিন, কারণ সে আমাদের শহরের দুই পার্শ্বে দুটি রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী যোগাযোগের ছোট পথটিও সুন্দর করিয়া গড়িতে দিতেছে না।

প্যারিসে পৌঁছাইবার পর আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়া উঠিলাম। প্রাচ্য দেশে রাজকীয় জাঁক শুধু রাজকীয় ব্যক্তিদের জন্যই নির্দিষ্ট। পাশ্চাত্ত্য দেশে সেরূপ নহে, সেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিও একদিনের জন্যও অন্ততঃ রাজার হালে থাকিতে পারে, তাহাকে শুধু প্যারিসের গ্র্যাণ্ড হোটেলে আসিতে হইবে। এসব দেশে লোকে হোটেলে থাকাই বেশি পছন্দ করে, তাহার কারণ সভ্যতা যৌথ প্রচেষ্টায় অধিক সুবিধা পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। আমার স্বদেশবাসী অনেক সময় বুঝিতে পারেন না, প্রত্যেক ইংরেজ পরিবারের নিজস্ব গৃহ নাই কেন। তাঁহাদের ধারণা দারিদ্র্যই ইহার কারণ। যথেষ্ট টাকার অভাব, ইহা মিথ্যা নহে, কিন্তু দারিদ্র্য বলিতে আমরা যাহা বুঝি ইহাদের তাহা নহে। শুধু টাকা খরচ করিয়া একখানা বাড়ি করিলেই সেখানে যথেষ্ট মনে করা হয় না, আনুষঙ্গিক অনেক বেশি খরচ করিতে হয়। আর একটা কারণ—সকলের পক্ষে জমি সুলভ নহে, যাহাদের অধিকারে জমি তাহারা সহজে ইহা অন্যকে ছাড়িতে চাহে না। তদ্ভিন্ন যেমন-তেমন করিয়া একখানা চালাঘর তুলিয়া সেইখানেই বংশ বংশ ধরিয়া বাস করা উহাদের রীতি নহে। বাড়ি করিলে তাহা যত্নপূর্বক রক্ষা করা কি জিনিস তাহা আমরা জানি না, উহারা জানে। তাহার খরচ ও সেজন্য পরিশ্রম কম নহে। এবং আমাদের দেশের ন্যায় ওদেশে পরিবার অনুপস্থিত থাকিলে কোনও বিধবা আত্মীয়া বাড়ির তত্ত্বাবধান করিবে এমন আত্মীয়া পাওয়া যায় না। তাই

উহারা বাসস্থানের জন্য মাটির গভীরে মূল প্রবেশ করায় না। উহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। লণ্ডনে গ্রীষ্ম কাটাইল, হেমন্তকালে স্কটল্যাণ্ডে, কিংবা ফ্রান্সে বা জার্মানীতে, এবং শীতকালে ইউরোপে। সেজন্য নির্দিষ্ট আয়ের ব্যক্তির পক্ষে বাড়ি করা বিড়ম্বনা। আসামে ও বর্মাতে যেমন অনেক বাড়িতে তাঁত আছে, সেরূপ তাঁত রাখিয়া আমরা যেমন নিজের কাপড় নিজে প্রস্তুত করিয়া লই না, প্রয়োজন মত কিনিয়া লই, ইংরেজরাও তেমনি ব্যবসায়ী বাড়ীর মালিকের বাড়ী প্রয়োজনের মত ভাড়া করিয়া লয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতে কোনও ব্যক্তির যদি একটি প্রাসাদ থাকে এবং মাসিক দুই হাজার টাকা আয় থাকে, তাহা হইলে গ্র্যাণ্ড হোটেলে পাঁচশো টাকায় সে সব সুবিধা ও আরাম পাওয়া যায় তাহা সে তাহার নিজের বাড়িতে পাইবে না।

আমার সঙ্গে মঁসিয়ো আরনু এবং অধ্যাপক বেলোঁর জন্য পরিচয় পত্র ছিল। ইঁহারা দুইজনেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী। আমার সঙ্গে আরও জীববিজ্ঞানের মিউজিয়ামের ডাইরেক্টর মঁসিয়ো ফ্রেমির পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। ইনি বিশ্ববিখ্যাত রাসায়নিক। ইনি ইংরেজী বলিতে পারেন না। আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করিলেন জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পরিচালক মঁসিয়ো মাক্‌সিম করনু। ইনি জাতীয় কৃষি সমিতিরও সভ্য। ডক্টর ফ্রেমি আমাকে প্রীতির সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার তন্তু বিষয়ে খুব অনুরাগ আছে—বিশেষ ভাবে 'রিয়া' (Boehmeria, nivea, H. and A.) সম্পর্কে। ভারতবর্ষে আমরা এই রিয়া (চায়না গ্র্যাস, অসমীয়া রিহা) দ্বারা কি করিতেছি তাহা তাঁহাকে বলিলাম। আমাদের উহা হইতে তন্তু ছাড়াইবার উপযুক্ত যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারি নাই। অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে, গভর্মেণ্ট হইতে পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, তথাপি কোনও ফল হয় নাই।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যন্ত্র লইয়া পরীক্ষার সময় উপস্থিত ছিলাম কিনা। আমি বলিলাম দুইটি যন্ত্র দেখিয়াছি, এবং একটির পরীক্ষার সময় ভারত গভর্মেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি বিচারক রূপে উপস্থিত ছিলাম। ডক্টর ফ্রেমি তাঁহার সংগৃহীত রিয়া তন্তু আমাকে দেখাইলেন। আলজিয়ার্স হইতে কাঁচা বাকল তাহা হইতে প্রস্তুত বয়নের উপযুক্ত তন্তু দেখাইলেন। পরিষ্কার তন্তু, এবং এইরূপই ইহা হওয়া উচিত। সিল্কের ন্যায় দেখিতে উজ্জ্বল, অসাধারণ দৃঢ় এবং দীর্ঘ। প্রস্তুতের সময় ইহাকে অনেকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করা হইয়াছিল। ডক্টর ফ্রেমি নিজেই এই প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রস্তুতে কি পরিমাণ খরচ পড়ে তাহা সন্তোষজনকভাবে জানিতে পারিলাম না, অবশেষে আমি তাঁহাকে প্রকারান্তরে বলিলাম যে রিয়া হইতে কত ভালভাবে তন্তু উৎপাদন করা যাইতে পারে ইহা যদি দেখাইবার জন্যই হয়, ব্যাপকভাবে ব্যবহারের উপযুক্ত করিয়া তোলা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাঁহার এত কষ্ট স্বীকার করিবার কারণ নাই, কারণ রিয়ার তন্তু কত ভাল হইতে পারে তাহা বহু পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। ডক্টর ফ্রেমি স্মিতহাস্য করিয়া বলিলেন, তাঁহার পদ্ধতি শুধু যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সফল হইয়াছে তাহাই নহে, ইহা ইতিমধ্যেই লিল-এর কারখানায় বয়নের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে। তিনি আমাকে আরও

জানাইলেন, ইহার এত চাহিদা যে আলজিয়ার্স হইতে তাহা মিটান সম্ভব হইতেছে না। এবং ইহার শুষ্ক বল্কলের জন্য ফ্রান্সের বাজার উন্মুক্ত আছে, যে-কেহ উহা এখানে বিক্রয় করিতে পারেন। ভারত হইতে কিছু নমুনা পাঠাইলে তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে রাজি আছেন। তবে নূন্যপক্ষে ছয় টন বাকল পাঠাইতে হইবে। আমি তাঁহাকে আরও জানাইলাম, অন্য এক জাতীয় গাছ আছে, বিয়ার সঙ্গে তুলনীয়—আর্টিকেসি শ্রেণীর (Maoutia Puya, Wedd) বাংলার তরাই অঞ্চলে ও আসামে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। মিউজিয়ামের সহকারী জীববিজ্ঞানী মঁসিয়ো জুল পোয়ার্স এবং অধ্যাপক ব্যুরো আমাকে রাসায়নিক গবেষণাগারটি দেখাইলেন। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা নানা পরীক্ষা চালাইতেছে। তাহাব পর মাইক্রোস্কোপ স্কুল দেখিলাম, সেখানেও তরুণ-তরুণীরা পর্যবেক্ষণের কাজ চালাইতেছে। প্যারিসের আরও কয়েকটি বিজ্ঞান শিক্ষালয়ে পরিদর্শন করিয়াছি, তাহার বর্ণনা দিবার প্রয়োজন নাই।

প্যারিসে ইডেন থিয়েটার ও নিউ অপেরা দেখিলাম দুটিই বিরাট প্রেক্ষাগৃহ, নির্মাণে বিরাট ব্যয় হইয়াছে। নিউ অপেরা নির্মাণে দুই কোটি টাকার উপরে খরচ হইয়াছে, শুনিলাম। আমি অভিনয় বুঝি নাই, কিন্তু নৃত্য উপভোগ করিয়াছি, দৃশ্যপট ভাল লাগিয়াছে। ইডেন থিয়েটারে বহু মেয়ে এক সঙ্গে নাচে, লণ্ডনের আলহামব্রাতে যেমন। ইহাদের পোশাক দুঃসাহসিক, সোনা ও নকল রত্নখচিত—আলোয় চোখ ঝলসাইয়া দেয়। নাচিবার সময় বিভিন্ন বর্ণের আলো তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হয়, তখন রূপকথার জগৎ যেন বাস্তব রূপ ধরিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়। বড়দিনে কলিকাতার প্যান্টোমাইমও ভাল কিন্তু তাহাতে এত অর্থব্যয় সম্ভব নহে। দুই দৃশ্যের মধ্যবর্তী সময়ে আমি একটু ঘুরিয়া বেড়াইলাম, যাঁহাদের সহিত দেখা হইল তাঁহারা আমাকে শ্যাম্পেন পানে অনুরোধ জানাইলেন। আমার পাগড়িকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি ইউরোপের কোনও ভাষা জানি না। তাঁহারা একের পর এক নানা ভাষা চেষ্টা করিলেন, আমি দুঃখের সঙ্গে ঘাড় নাড়িতে লাগিলাম এবং যে ভাষায় উত্তর দিলাম তাহা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতি ব্যবহার করে না। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে যে সব হাস্য পরিহাস চালাইলেন, তাহা আমি উপভোগ করিতে পারি নাই, কারণ তাহা আমার কাছে গ্রীক। বুলভার-এ বেড়াইতে গেলাম। কিন্তু তথাকার গাছগুলি তখন প্রায় সবই পত্রশূন্য। তথাপি দুই পাশের চমৎকার ফুটপাথ এবং সুন্দর সুন্দর দোকান ও কাফে মিলিয়া এটি পৃথিবীর একটি সেরা বীথিকা। শাঁজ এলিজেতেও গিয়াছিলাম। সদা স্ফূর্তি যুক্ত বহু লোকের ভিড়। প্রত্যেকে চমৎকার পোশাকে সজ্জিত। আমি কৃষ্ণাঙ্গদের জমকাল পোশাকের বিরোধী নহি, কিন্তু অন্য দেশ হইতে আমাদানি করা বস্ত্রাদিতে রুচিভ্রম ঘটিয়াছে, স্বদেশী রুচির কোনও সমতা তাহাতে রক্ষিত হয় নাই। ইউরোপের জনসাধারণ জীবনকে উপভোগ করে, নূন্যতম উপভোগ্যও তাহারা বেশি পরিমাণ উপভোগ করিতে জানে। আমাদের যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র সত্ত্বেও, ইউরোপীয়গণ তাহাদের ভাবনাচিন্তাকে ভাবনাচিন্তার হাতে অনায়াসে ছাড়িয়া দিতে পারে। অনেকগুলি প্যানোরামা চিত্রও দেখিলাম। এই বিস্তীর্ণ

চিত্রের একটিতে ছিল যুদ্ধক্ষেত্র, এমন বাস্তব ভঙ্গিতে চিত্রিত যে অদ্যাবধি ইহার মধ্যকার একটি রক্তাক্ত মৃত সেনাকে ভুলিতে পারি নাই।

ত্রিয়ঁফ দ' ল' এতোয়াল, নেপোলিয়নের বিজয় উপলক্ষে নির্মিত স্মৃতিতোরণ দেখিলাম। নানা দেশে বিজয়ের পরে নেপোলিয়ন যে বারোশোটি কামান হস্তগত করিয়াছিলেন, সেগুলি গলাইয়া যে কলোন্ ভাঁদোম নির্মাণ করিয়াছিলেন সেটিও দেখিলাম। ১৮৭১ সনে কমিউনিস্টগণ বেদী হইতে স্তম্ভটিকে নামাইয়া ফেলিয়াছিল, পরে তাহা পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছে। নেপোলিয়নের দেহ বর্তমানে ওতেল দে অ্যাঁভালিদ-এ সমাহিত রহিয়াছে। এটি অক্ষম সেনাদের আবাসস্থল। মিউজীয়ামগুলির মধ্যে আমি ত্রোকাদেরো মিউজীয়ামটি দেখিয়াছি। এইখানে নানা মূর্তি ও অনেক নৃতাত্ত্বিক নমুনা রাখা আছে। আর দেখিয়াছি লুভ্র্ মিউজীয়াম। ইহার বহু বিভাগ—ফরাসী ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প; ইটালিয়ান, ফ্লেমিশ ও ফ্রেঞ্চ পদ্ধতির পেইন্টিং; গ্রীক রোম্যান ও ঈজিপশিয়ান প্রাচীন নিদর্শনসমূহ—ভাস, মূর্তি, এবং জাহাজের মডেল। ভীনাস অভ্ মিলো এইখানে রক্ষিত আছে। পিকচার গ্যালারিটি লুভ্র্ মিউজীয়ামের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক চিত্রশালা। 'ইম্যাকিউলেট কন্‌সেপশন' এবং ভিখারী বালক বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি বিখ্যাত নোত্র্ দাম্ পরিদর্শন করিলাম। দ্বাদশ শতাব্দীতে এই ক্যাথীড্রালটি নির্মিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান প্রবেশ পথ তিনটি, এই প্রবেশপথগুলিতে নিউ টেস্টামেন্ট হইতে গৃহীত বিষয়বস্তু খোদিত আছে। প্রকাণ্ড একটি ঘণ্টা আছে। উহার নাম ল' বুরদঁ, ওজন ৩২২ হানড্রেডওয়েট। ভিতরে ঐকতান সঙ্গীত গৃহটি বহুচিত্রশোভিত। গ্যালারিটি ১৯৭টি ভারী ভারী স্তম্ভে আলম্বিত। ইহার অর্গ্যানটিতে পাঁচ হাজার পাইপ আছে। মেঝে মারবল পাথরের। মূর্তিগুলির মধ্যে অশ্বারোহী শার্লমেন ও তৎসহ দণ্ডায়মান রোলাঁ ও অলিভার। নোত্র্ দামের নিকট পালে দ' জুসটিস এবং লা স্যাঁত শাপেল দেখা যাইবে। প্যারিসে যাঁহারা আসেন তাঁহারা বিখ্যাত শবাগারটি দেখিয়া থাকেন। পথেঘাটে যে সব মৃতদেহ পাওয়া যায় তাহা শনাক্ত করণের জন্য এখানে রাখা হয়। পচন আরম্ভ হইলে ফোটোগ্রাফ তুলিয়া সেইগুলি টাঙাইয়া রাখা হয়। পাঁচ বৎসরের একটি ছেলের ফোটোগ্রাফও সেখানে দেখিলাম। কয়েকদিন পূর্বে তাহার দেহটি পথে পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু দাবিদার কেহই নাই। রাজপ্রাসাদ দেখিলাম। প্যানথিয়ন পূর্বে গীর্জা ছিল, বর্তমানে বিখ্যাত ব্যক্তিদের সমাধিস্থান। ভেক্টর হিউগোর দেহ এইখানে রহিয়াছে।

আমার গাইডকে জিজ্ঞাসা করিলাম তোমাদের বর্তমান গভর্মেন্ট কিরূপ মনে কর? সে এদিক ওদিক চাহিয়া চাপা গলায় বলিল, বর্তমান গভর্মেন্ট সুবিধাবাদী গভর্মেন্ট, আমি পছন্দ করি না। সে যাহা বলিল, তাহা ভয়ে ভয়ে বলিল কেন বুঝিলাম না। কারণ স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব যাহাদের নীতি সেখানে বাক্-স্বাধীনতাকে ভয় পাইবার কি আছে? ব্রিটিশ গভর্মেন্টের অধীন আমাদের যেটুকু স্বাধীনতা আছে, ইহাদের নিজেদের গভর্মেন্টের কাছে তাহা নাই। আমরা মধ্য যুগে বাস করিলেও তাহার ভয়াবহতা হইতে মুক্ত আছি।

প্যারিস হইতে কোলোয়ন যাইবার সময় তুষার-পাত হইতেছিল। কোলোয়নে পৌঁছিয়া দেখিলাম শহরটি তুষারে ঢাকিয়া গিয়াছে। বহির্দৃশ্য সবই শুভ্রতামণ্ডিত, মাঠ ঘাট গাছপালা ঘরবাড়ি, এমন কি কাকও শাদা হইয়া উঠিয়াছে। ওতেল দ' অলার্দ-এ গিয়া উঠিলাম। হোটেলটি রাইন নদীর ধারে। শ্রীরামপুরের ধারে হুগলি নদী যতটা প্রশস্ত, রাইনও এখানে ততটা। গভীরতাও এক রকম। জল ঘোলাটে। বহু স্টীমার এ পথে যাতায়াত করে। কিন্তু কোলোয়ন অতীতে যাহা ছিল তাহার সহিত বর্তমান শহরটির তুলনা হয় না। তখন এটি 'মুক্ত' শহর ছিল। নদীর তীরে ছোট ছোট হাতে ঠেলা গাড়ি দেখিলাম, এগুলির মালিক এগুলিকে কুকুরের সহায়তায় টানিতেছে। চলিবার কালে কুকুরগুলি ক্রমাগত ডাকিতেছে। আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল থাকাতে কোলোয়নে বেশি কিছু দেখা হইল না। মাত্র ক্যাথীড্রাল ও চার্চ দেখিলাম। সেন্ট উরসুলা চার্চটি সুন্দর। ১২৪৮ সনে ভিত্তি স্থাপিত হয়, সম্পূর্ণ কাজ শেষ হইয়াছে ১১৮০ সনে। লাল প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে নির্মাণে। বিরাট আকার ক্রস্‌বিদ্ধ হইবার পরবর্তী অবস্থার একটি খ্রীষ্ট মূর্তি রহিয়াছে। ইহা পাথরে নির্মিত, জীবন্ত মনে হয়। যীশুর জন্মের পরে যে তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি পূর্বদেশ হইতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের সমাধি এখানে রহিয়াছে। যতদূর স্মরণ হয়, আমাকে কয়েকটি মাথার খুলি দেখান হইয়াছিল, বলা হইয়াছিল সেগুলি 'মাজি' বা জ্ঞানী ব্যক্তিদের। একটি বৃহৎ টোপাজ (পোখরাজ)-এর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। এই পাথরটি ডেভিল বা শয়তান 'সপ্তপর্বত' হইতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। একাদশ শতাব্দীতে 'হান' (হুন) নামক যাযাবর বর্বরদের হাতে এগারো হাজার কুমারী বা ভার্জিন নিহত হইয়াছিল, গীর্জার প্রাচীরে তাহাদের চিহ্নাদি রাখা হইয়াছে। কোলোয়নে 'ওডিকোলোন' তৈয়ার হয়।

এখান হইতে বার্লিন রওনা হইবার সময়েও তুষারপাত হইতেছিল। ১৮৮৬, ৩১শে ডিসেম্বরে আমি বার্লিনে পৌঁছিলাম। এই সময়টি অতিরিক্ত ঠাণ্ডার সময়, কিন্তু পথে আমি খুব অসুবিধা বোধ করি নাই। জার্মানির রেল কামরাগুলি বিশেষ ভাল। কামরা গরম রাখিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বেশ আরামদায়ক উষ্ণতা রক্ষিত হয়। তাপ-জনন ব্যবস্থার সঙ্গে কামরার দেয়ালে একটি ডায়াল সংযুক্ত আছে, তাহার হাতল ঘুরাইয়া কামরা বেশি গরম বা কম গরম করা যাইতে পারে। বার্লিনে সেন্ট্রাল হোটেলে উঠিলাম। এই হোটেলে পাঁচশোটি শয়নকক্ষ আছে। প্রথম শ্রেণীর অন্যান্য হোটেলের ন্যায় এটিতেও বিদ্যুতের আলোর ব্যবস্থা আছে। পেইন্ট করা গ্লাস এবং দেয়ালচিত্রে কক্ষগুলি অলঙ্কৃত। নানা রূপক চিত্রে শোভিত করাতে ইউরোপের সর্বত্রই একটি অনুরাগ দেখা যায়। হোটেলের সঙ্গে যুক্ত একটি বড় হল ঘর আছে, তাহার ছাত কাঁচের। ইহা একজাতীয় গৃহমধ্যস্থ উদ্যান। এখানে গিয়া হোটেলবাসীরা বসিয়া কফি পান করে। এই উদ্যানের সঙ্গে যুক্ত থিয়েটার রুমে যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবস্থা আছে। এজন্য হোটেলবাসীদের অতিরিক্ত কিছুই দিতে হয় না। একটি ত্রুটি —এখানে গাইডের সংখ্যা একটু বেশি, তাহারা একটু অত্যাচারী বলিয়া বোধ হইল। আমার ঐখানে বাস কালে তখন রাত্রিদিন তুষারপাত হইতেছিল। কিন্তু পাইপের সাহায্যে

হোটেলে সত্তর ডিগ্রী ফারেনহাইট মাত্রার তাপ সর্বদা রক্ষিত হইত। সাধারণ বাড়িতে এ জন্য স্টোভ ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে ইংল্যাণ্ডের মত খোলা অগ্ন্যাধার নাই, এখানে সেইরূপ পাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। আমি হোটেলবাসী হইলেও কার্যতঃ আমি ছিলাম জার্মান সাম্রাজ্যের প্রিভিকাউনসিলর অধ্যাপক রেয়োলোর অতিথি। ইনি একজন সংস্কৃতে পণ্ডিত ব্যক্তি। ভারতের সর্ববিষয়ে তাঁহার কৌতূহল। সম্প্রতি তিনি প্রাচীনকালের শতরঞ্জ বা দাবা খেলা ও তাস খেলার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার বার্লিন থাকা কালে তিনি একটি সোনার ফলকের আকরভূমি আবিষ্কারে ব্যস্ত ছিলেন। এই ফলকটি হাঙ্গারিতে মাটির নীচ হইতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি অনুমান করিয়াছেন এটি আগের যুগেব হাতীর মাথায় ব্যবহৃত একটি অলঙ্কার। আমার মনে হয় তাঁহার ধারণা ঠিক। হান্‌রা তখন সেনাদলে হাতী ব্যবহার করিত এরূপ অনুমান করা অযৌক্তিক নহে। আমাদের সঙ্গে হানদের সম্পর্ক ছিল। তাহাদের আদি ভূমি তিব্বত হউক বা না হউক, আমাদের প্রতিবেশী, হিমালয়ে মালভূমির অধিবাসীদিগকে, আমরা হুনিয়া বলিয়া থাকি। পূর্ব দিকে চীনাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া তাহারা পশ্চিমদিকে ইউরোপ বিধ্বস্ত করিতে যাত্রা করিয়াছিল। অস্ট্রো-হাঙ্গারির মাগিয়ারগণ তাহাদের বংশধর। আমি অধ্যাপক রেয়োলোকে, আমরা কি ভাবে হান্‌দের সঙ্গে সম্পর্কিত তাহা বলিলাম, এবং কি ভাবে ভারতের রাজহস্তীদের ললাট দেশ অলঙ্কৃত করিবার জন্য ঐরূপ অলঙ্কার ব্যবহৃত হইত তাহাও বিবৃত করিলাম। অধ্যাপকের সঙ্গে বার্লিনের নানা দর্শনীয় জিনিস দেখিতে বাহির হইলাম। একটি মিউজিয়ামে কতকগুলি উৎকৃষ্ট মৃৎপাত্র দেখিলাম। ইহার প্রস্তুত-পদ্ধতি লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু এক বৃদ্ধ তাহার বাল্যকালে পদ্ধতিটি দেখিয়া মনে রাখিয়াছিল, এবং তাহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া আধুনিক কালে পুনরায় ইহা প্রস্তুত হইতেছে। আরও বহু চিত্তাকর্ষক জিনিস দেখা হইল, এবং একটি অপেরা, অভিনয়ও দেখিলাম।

১৫

নৃতত্ত্ব বিষয়ক মিউজীয়াম দেখিলাম সব শেষে। ডক্টর বাস্‌টিয়ান ইহার প্রেসিডেন্ট। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাতা আসিয়াছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস কলিকাতার অনেকেই তাঁহাকে চিনিবেন। তাঁহার মিউজীয়ামের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র তিনি সহস্র অভিযানে ঘুরিয়াছেন। তিনি তাঁহার সংগ্রহের প্রায় সবই আমাকে দেখাইলেন। প্রাচীন মেক্সিকোর একটি খোদাই করা তিনি আমাকে দেখাইলেন। এটি নরবলির দৃশ্য। এক উচ্চ পরিবারের কর্তব্যপরায়ণ সন্তান তাহার পূর্ব-পুরুষদের পূজিত আত্মার নিকট নিহত ব্যক্তির মুণ্ডটি অর্ঘ্যরূপে সমর্পণ করিতেছে। আর এই সুন্দর উপচারটির জন্য এক দাবিদার পিছন হইতে হাত বাড়াইয়াছে। সে পাতালরাজ, রক্তের গন্ধ পাইয়া সে তাহার পাতালবাস হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। পিতৃপুরুষ পূজারী, মুণ্ডটি তাহার পিতৃপুরুষের তৃপ্ত্যর্থে আনিয়াছে, অতএব তাহা পাতালরাজ, অর্থাৎ যিনি যমরাজ, তাঁহাকে সহজে দেওয়া চলে না। ইহা লইয়া তর্ক আরম্ভ হইয়াছে, দুইজনের মধ্যে, কিন্তু তাহার পরিণামে কি হইয়াছে তাহা আমি জানি না, কারণ তাহা ঐ পাথরে চিত্রিত হয় নাই। মিউজিয়ামটি নূতন কিন্তু তবু আমি যতগুলি সেরা মিউজিয়াম দেখিয়াছি, এটি তাহার অন্যতম। সর্বত্র নব জার্মানির জাতীয় জাগরণের চিহ্ন প্রত্যক্ষ।

আবহাওয়া এমন দুর্যোগপূর্ণ যে তাহার মধ্যে বাহির হইয়া সকল স্থান দেখা সম্ভব ছিল না। সমস্ত দিনরাত্রি ধরিয়া তুষারপাত হইয়াছে, সমস্ত পথ গভীর তুষারে ঢাকা পড়িয়াছে, চাকার গাড়ি অচল, পথে স্লেজ ব্যবহৃত হইতেছে, রেলগাড়ি চলিতেছে না, এবং আমি তুষার-বদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছি। সৌভাগ্যবশতঃ আমি সম্রাট প্রথম উইলিয়াম-এর সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। আমার বন্ধু আমাকে প্রিন্স বিসমার্কের কাছে লইয়া যাইতেন, কিন্তু তিনি তখন বার্লিনে ছিলেন না। প্রায়ই আমি ঘরের বাহির হইলে পথ হারাইয়া ফেলি, বার্লিনেও তাহা হইয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে আমি বড়দিন উপলক্ষে শপ্রে নদীর তীরে স্থাপিত স্টল দেখিতে গিয়াছিলাম। যখন সন্ধ্যা আসন্ন তখন খেয়াল হইল, ফিরিতে হইবে। কিন্তু পথ হারাইলাম। পুরা এক ঘণ্টা ধরিয়া নানা পথে একটি স্লেজের আশায় ঘুরিলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। পুলিসের লোককে, পথিককে জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু তাহারা আমার কথা বোঝে না। তখন অন্ধকার গভীর হইয়াছে, আমার উদ্বেগ বাড়িয়া যাইতেছে। অবশেষে একটি বালিকার দেখা পাইলাম। তাহার একটি চক্ষু অন্ধ। তাহার কাছে শুধু সেন্ট্রাল হোটেল এই নামটি উচ্চরণ করিলাম। সে আমার গন্তব্য বুঝিতে পারিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। পরে জানিতে পারিলাম, সে তাহার পথ হইতে দুই মাইল অতিরিক্ত হাঁটিয়া আমাকে নিরাপদে হোটেলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

এক সন্ধ্যায় এক বন্ধু আমাকে তাঁহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে একজন ছিলেন দার্শনিক। তিনি জার্মান দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে এবং ইউরোপে বর্তমানে দর্শনে যে অগ্রগতি ঘটিয়াছে সে সম্পর্কে অনেক কিছু বলিলেন। এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা ভারতীয়গণ এ বিষয়ে কি মত পোষণ করি। আমি বলিলাম, এ বিষয়ে আলোচনা করিবার যোগ্যতা আমার নাই, তবে এইটুকু বলিতে পারি, আপনারা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন, তাহা হইতে ভারতীয়গণ নূতন কিছু পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য তাঁহারা আপনাদের যুক্তির সূক্ষ্মতাকে প্রশংসা করিতে পারেন। কিন্তু ভারতীয় ঋষিগণ সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান ইউরোপীয় মানস সে সত্যের ধারণা করিতে পারিবে না। ঋষিগণের উপলব্ধ সত্যের নিকট কাণ্ট, জাকোবি, ফিখ্‌টে, শেলিং, হেগেল প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগকে মনে হইবে তাঁহারা একই চক্রপথে ক্রমাগত পাক খাইতেছেন। আরও অনেক বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু নিজেকে সংযত করিলাম। কারণ হঠাৎ উপলব্ধি করিলাম, ইঁহারা মনে করিবেন আমি গভীর জ্ঞানী এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিবার আমি সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আমার জন্ম লগ্নে কোনও দুষ্টগ্রহের প্রভাব আছে যাহাতে সহজেই লোকে আমাকে ভুল বোঝে।

আমি যে বিষয়ে অজ্ঞ সে বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে মনে করিলে অবশ্য কম ক্ষতি হয়। কাহার কাছে প্রতিবাদ করিব? কি ভাবে প্রতিবাদ করিব? এবং করিয়া কি লাভ হইবে? ইহা অপেক্ষা বায়ুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া পাতার ভিতর যে মর্মর ধ্বনি জাগায় তাহা থামাইতে বলা বরং সহজ। কারণ মানুষ যখন একটি বিশেষ ধারণা মনে গাঁথিয়া লয়, তখন তাহা তাহার মন হইতে দূর করা বড়ই কঠিন। ঠিক সেই নিগ্রো সর্দারের মত। তাহাকে খ্রীস্টান ধর্ম সম্পর্কে বহু কথা এবং খ্রীস্টের পুনর্জীবন ইত্যাদি সব বলা হইলে তবু শেষকালে সে বলিত, "কবর খুঁড়িয়া না তুলিলে মৃত ব্যক্তি কখনও কি বাহিরে আসিতে পারে?" লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করিতেছি, আমি যাহা জানি বলিয়া মনে করা হয়, সে বিষয়ে আমাকে অধিকাংশ সময়েই ভাসা ভাসা জ্ঞান অর্জন করিতে হইয়াছে। তাহাতে প্রথমেই আমাকে পণ্ডিত বলিয়া যে ধারণা জন্মে তাহা আরও গভীর এবং আরও খারাপ। কিন্তু ইহা সকল সময়ের জন্য চলিতে পারে না, অথচ বিজ্ঞান, দর্শন এবং রাজনীতি জানি এই মিথ্যা পরিচয়েই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহন করিতে হইবে।

রেলওয়ে লাইন হইতে তুষার অপসারণের পরেই গাড়ি চলা আরম্ভ হইল, আমিও বার্লিন ত্যাগ করিয়া ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ড্রেসডেন পর্যন্ত বেশ আরামেই কাটিল। আমার সঙ্গে একজন মিলিটারি অফিসার ছিলেন, তিনি ইংরেজীতে কথা বলিতে সক্ষম। ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রেজিমেন্ট প্যারিস অবরোধে সহায়তা করিয়াছিল। তিনি যুদ্ধের অনেক ঘটনা খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, শুনিয়া মনে হইল পুনরায় এরকম একটি যুদ্ধ বাধিলে তিনি খুশী হন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যুদ্ধের ভয়াবহতা কি কখনও আপনার মনকে আঘাত দেয় নাই? তিনি

বলিলেন, এক একটি যুদ্ধের পরে তাঁহার স্নায়ু, কিছু ক্লান্ত হইয়াছে। অতঃপর তিনি ভীষণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ, অবরোধ, এবং পিতৃভূমির গৌরবরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, এ সব ছোটখাটো ঈর্ষাবিদ্বেষ অথবা পিতৃভূমির গৌরব বিষয়ে আপনার ধারণা আমার কাছে বড় নহে, আমি দেখি এ কাজে লক্ষ লক্ষ সক্ষম মানুষ আবদ্ধ থাকে, সেজন্য তাহারা মানুষের উন্নতির কাজে লাগিতে পারে না, এই ক্ষতিটাই আমার কাছে বড় মনে হয়। বহু খাল এখনও কাটা হয় নাই, বহু জলাভূমি হইতে এখনও জল নিষ্কাশন বাকি আছে, জঙ্গল সাফ করিতে হইবে। আরও পথ চাই, আরও রেলওয়ের বিস্তার চাই, সমুদ্রে আরও লাইটহাউস প্রয়োজন, বহু নদীর তলার মাটি কাটিতে হইবে, অনেক পর্বত কাটিয়া সুরঙ্গ-পথ প্রস্তুত করিতে হইবে। এক সময় ছিল, যখন মানুষ জাতির সুবিন্যাসের জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল, সে উদ্দেশ্য এখন আর নাই। এখন লোকসংখ্যার চাপ কমাইবার জন্য ভিন্ন দেশে বহু লোককে পাঠাইয়া দেওয়া চলে, তাহারা পৃথিবীর দূরতম অঞ্চলে গিয়া উদ্বৃত্ত জমি অধিকার করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জীবনযাত্রা চালাইলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, জাতিতে জাতিতে মিলন ঘটিবে, পরস্পরের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরার পথ সুগম করিলে বাণিজ্য এবং শিক্ষাবিস্তারের দ্বারা জাতীয় জীবনের প্রবাহহীনতা সহজে রোধ করা সম্ভব হইবে। ইউরোপের এই সব যুদ্ধের উপযোগী প্রস্তুতি ও মনোভাব দেখিয়া আমার মনে হয়, মানুষের যতদূর উন্নতি সম্ভব, তাহা দ্বারা দেবতার মস্তক ও হাত লাভ করিতে হইবে ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু ভিতরের মনটা তাহাদের বানরের রহিয়া গিয়াছে।—শেষ মন্তব্যটি হাসিতে হাসিতে করিলাম। ভদ্রলোকও তেমনি হাসিয়াই বলিলেন, আপনার সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া লাভ নাই। আমি বইতে পড়িয়াছি, আপনারা ব্রাহ্মণেরা পশুহত্যাতেও আপত্তি করেন। আমরা তেমন নির্বোধ নহি। আমরা গোরু-ভেড়া হত্যা করি তাহার মাংস খাইবার জন্য, শিকারের উপলক্ষে পশুহত্যা করি ক্রীড়ার আমোদের জন্য, আমরা দয়াপরবশ হইয়াও পশুহত্যা করি, খোঁড়া ও বৃদ্ধ অশ্ব হত্যা করি দীর্ঘ যন্ত্রণা ভোগ হইতে তাহাকে মুক্তি দিবার জন্য। আমি বলিলাম, মার্জনা করিবেন, আমি যদি মনে করি উহাদের হত্যা করেন খরচ বাঁচাইবার জন্য? যদি ইহা দয়াধর্ম হয়, তাহা হইলে ত হটেনটটেরা বেশি দয়ালু, কারণ তাহারা তাহাদের বৃদ্ধ এবং অকর্মণ্য আত্মীয়বর্গকে মরুভূমিতে রাখিয়া আসে, সেখানে তাহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সহজে প্রাণত্যাগ করে। আমরা আরও অনেক বিষয়ে আলাপ করিলাম, এবং অল্পকালের মধ্যেই আমরা পরস্পর বন্ধু হইয়া পড়িলাম। তিনি ড্রেসডেনে নামিয়া গেলেন, আমি একা চলিতে লাগিলাম। অবশেষে নিজের মনে তত্ত্বচিন্তায় নিযুক্ত হইলাম। আমি নিচের পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখি, সব যেন ক্ষণস্থায়ী মরীচিকা। চলমান বামনের দল উন্মাদের মত পরস্পরকে ধাক্কা মারিতে মারিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। ইহারই সুবিস্তীর্ণ চিত্র মনের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আমাদের গুরুগণ আমাদিগকে এই সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে থাকিতে বলিয়াছেন, শান্ত সমাহিত থাকিতে বলিয়াছেন, যেখানে কোনও মেঘ ছায়াপাত করে না, যেখানে

ঝড়ের গর্জন কানে আসে না, নিস্পৃহ মনে নিচের এই উন্মাদের লড়াই অবলোকন করিতে বলিয়াছেন।

কিন্তু মহাশয়, পৃথিবীতে যে ক্ষুধা আছে, বেদনাবোধ আছে, তাহা ব্যক্তিগতভাবে আমি দমন করিতে পারি, কিন্তু উহাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা ব্যথাবেদনা আমি কেমন করিয়া দমন করিব? অন্যের প্রতি এই দুঃখময় সমবেদনা, এবং আমার নিজের মধ্যে যে আত্মাভিমান আছে, তাহা আমাকে আমার এই কল্পলোকের উচ্চতা হইতে নিচে নিক্ষেপ করিল, এবং স্মরণ করাইয়া দিল আমিও ত উহাদেরই মত বামন, আমিও ত উহাদেরই একজন। হায়, যাহারা এই হতভাগ্য বামনদিগকে তাহাদের মত বিরাট বানাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, যদি তাহাদের জুতার ফিতা খুলিবার উপযুক্ত হইতাম!

কিছুক্ষণ পরেই টেটশেন নামক একটি স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। এটি অস্ট্রিয়া সীমান্তে অবস্থিত। এইখানে আমি রেলের লোকদের কাছে জানিতে চাহিলাম ভিয়েনা যাইতে হইলে এখানে আমাকে গাড়ি বদল করিতে হইবে কি না। কারণ টিকিটের উপর লেখা ছিল—বার্লিন হইতে ড্রেসডেন, ড্রেসডেন হইতে বোডেনবাখ, বোডেনবাখ হইতে ভিয়েনা। কিন্তু আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, হয় তাহা তাহারা বোঝে নাই, অথবা তাহারা যাহা বলিল তাহা আমি বুঝি নাই। তাহারা যাহা বলিল তাহাতে আমি বুঝিলাম আমি এই ট্রেনেই যাইতে পারিব। অতএব আমি বিছানায় আরাম করিয়া ঘুমাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সেটি রাত্রিকাল।

মধ্যরাত্রি পার হইয়া গেল, বড়দিনে রাত্রি শেষ হইবে, ট্রেনখানি ইন্টারন্যাশন্যাল এক্সপ্রেসের পূর্ণ গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় কনডাক্টর আসিয়া আমাকে আমার গভীর নিদ্রা হইতে জাগাইয়া দিল। সে আমার টিকিট পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। সেই ঠাণ্ডায় ঘুমন্ত চোখে টিকিট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। ভাবিলাম মুহূর্তে তাহার পরীক্ষা শেষ হইবে। কিন্তু তাহার কোনও তাড়া ছিল না। সে বহুক্ষণ ধরিয়া টিকিটটি দেখিল, ভাবিলাম প্রত্যেকটি অক্ষর বানান করিয়া পড়িতেছে এবং মুখস্থ করিতেছে। আলো ছিল মৃদু, তাই সে উঠিয়া প্রখর আলোর দিকে গেল, ইহাই তখন আমার মনে হইল। এতক্ষণে আমি সম্পূর্ণ জাগিয়া উঠিয়াছি, এবং একটি সন্দেহ যেন মনে ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছে। তবে কি আমাকে সে কোনও রক্তপিপাসু সমাজতন্ত্রী অথবা ডাইনামাইট ফাটান নিহিলিস্ট ভাবিয়াছে? আয়নায় মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল, দেখিয়া ভাবিলাম নিশ্চয় সে আমাকে খারটুমের মেহদির মর্যাদা বিশিষ্ট কোনও লোক বলিয়া মনে না করিয়া পারিবে না। অতএব আমি দাড়ি ঠিক করিয়া লইয়া চোখে-মুখে হিংস্রতা ফুটাইয়া কনডাক্টরের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। সে একাই ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে সৈন্যসামন্ত কিছু আনে নাই, যদিও আনা উচিত ছিল। কিন্তু আমি হতাশ হইয়া দেখিলাম, সে নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে আমি ভুল গাড়িতে চড়িয়াছি, অতএব আমাকে অতিরিক্ত মাশুল দিতে হইবে। এবং সে অনেকগুলি টাকা। আমি অনেক কথাই বলিলাম, কিন্তু সে নাছোড়, টাকা দিতে হইবে। আরও অনেক কিছু বলিবার পর আমি তাহাকে অতিরিক্ত

মাশুল দিব না বলিলাম। অর্থাৎ ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলাম কথাটি। সে চলিয়া গেল, ভাবিলাম, চিরতরে। কিন্তু আমার ধারণা ভুল। এটি এক্সপ্রেস ট্রেন, পরবর্তী স্টেশনে থামিবার কথা নহে, কিন্তু সে সেই স্টেশনে থামাইয়া আমাকে নামিতে বাধ্য করিল, এবং আমার বিছানাপত্র ছুঁড়িয়া নিচে ফেলিয়া দিল; ট্রেনও তাহার ইঙ্গিত পাইয়া স্টেশন ছাড়িয়া গেল। আমি একা সেই বোহেমিয়ার পাহাড় অঞ্চলে পড়িয়া রহিলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, রাত্রি ঘোর অন্ধকার, শুধু চারিদিকের তুষারের প্রতিফলন একটু আধটু যাহা চিকচিক করিতেছে। স্টেশন ঘর পর্যন্ত গেলাম, এবং একটি লোককে সেখানে দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া আমার লগেজটি রেল লাইনের উপর হইতে আনিতে বলিলাম। লোকটি এমন ভাবে চমকাইয়া উঠিল, যেন ভূত দেখিয়াছে। ভয় হইল লোকটি ভয়ে পলাইয়া না যায়। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি ভীষণ ভাবে হাসিয়া উঠিলাম। সেও সাহসে একটু হাসিল, কিন্তু সন্দেহ তখনও তাহার মন হইতে দূর হয় নাই। আমি তাহাকে ঠেলিয়া লগেজের কাছে লইয়া চলিলাম, এবং দুইজনে মিলিয়া সেটিকে একটি নিরাপদ স্থানে আনিয়া তুলিলাম। অতঃপর তাহার কাছে “হ্বিন” (Wine) কথাটি অনেকবার উচ্চারণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম যে আমি ভিয়েনায় যাইব। তাহাকে আমার টিকিট দেখাইলাম এবং ‘বোডেনবাখ’ নামটিতে অঙ্গুলি রাখিয়া তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম আমার মুশকিলটা কি। যেন একটুখানি বুঝিল, তাহার মুখ দেখিয়া সেইরূপ বোধ হইল। কিন্তু সহানুভূতি দেখান দূরের কথা, সেও আমার নিকট স্টেশন হইতে তাহার স্টেশন পর্যন্ত ভাড়া দাবি করিল। আমি এতক্ষণে যথেষ্ট বিজ্ঞ হইয়াছি, অতএব ভাড়া দিতে আর অস্বীকার করিলাম না। খারটুমের মেহ্‌দির পদে উঠবার বাসনা আর নাই। আমার কাছে যে কয়েকটি মার্ক মুদ্রা ছিল, তাহা সমস্তই টেবিলের উপর রাখিলাম। সে মাথা নাড়িল। অর্থাৎ আরও চাই। আমার কাছে কাগজের নোট যাহা ছিল তাহাও উহার সঙ্গে যোগ করিলাম। তথাপি সে মাথা নাড়িতে লাগিল। আমি একটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলাম ভাঙানি দাও। ভাঙানি নাই? তাহা হইলে আর আমি কি করিতে পারি? তুমি যাহা পার কর। এই বলিয়া আমি চেয়ারে হতাশ ভাবে বসিয়া পড়িলাম। লোকটি একখানা কাগজে কি লিখিয়া পোর্টারের হাতে দিল এবং কি সব বলিল।

পোর্টার লগেজ তুলিয়া লইয়া আমাকে টাকাগুলি ওখান হইতে কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে বলিল। কিছুক্ষণ ভালই চলিলাম, কিন্তু তুষার ক্রমে গভীর বোধ হইতে লাগিল, কয়েক ফুট গভীর। শুধু সরু গলিতে তত গভীর নহে। কিন্তু বেশি লোক চলিয়া তাহাকে কাঁচের মত শক্ত করিয়া তুলিয়াছে, এবং তেমনিই পিছল। আমি যে কোথায় চলিতেছি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একটি পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের পথ ইহারই পাশ দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে। আমাদের দক্ষিণদিকে পাহাড় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। বাম পাশে অন্ধকারে যতদূর বোধ হইল পাহাড়ের পাশ খাড়া নিচে নামিয়া গিয়াছে, সবটাই তুষারে ঢাকা। ভাবিলাম, এখন এখান হইতে পা ফসকাইলে নরম তুষারের ভিতর সুরঙ্গ কাটিয়া নিচে গিয়া পড়িতে হইবে। লোকটি আমার আগে

চলিতেছে, আমিও যতদূর পারি তাহার প্রায় পায়ে পায়ে চলিতেছি। ভয় ছিল আবার কোনও দুষ্টবুদ্ধি তাহার মাথায় ভর না করে। এইভাবে অনেক দূর যাইবার পর নিচে নামিয়া আমরা একটি বড় নদীর ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। একটি কাঠের সেতু ছিল নদীর উপর, সেটি পার হইলাম। এইখানে লোকটি আমার নিকট হইতে যে কয়েকটি রৌপ্য মুদ্রা ছিল তাহা লইয়া চলিয়া গেল, সম্ভবত নদী পারের 'টোল' দিতে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে ফিরিয়া আসল এবং আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। পথে একদল স্ত্রীপুরুষকে দেখিলাম, তাহারা সম্ভবত বড়দিনের উৎসব শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। রাত্রি প্রায় ৩টার সময় আমরা একটি ছোট শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। শহরটি আধাজাগ্রত, হাসির শব্দ, গানের শব্দ এবং উৎসবের আরও নানারকম শব্দ কানে আসিল। একটি বড় বাড়ির কাছে আসিয়া আমার সঙ্গের লোকটি আমার নিকট হইতে স্বর্ণমুদ্রাটি লইয়া ভিতরে তাহা ভাঙাইতে চলিয়া গেল, বলিয়া গেল পথে আমি যেন অপেক্ষা করি। আমি তখন অতিশয় ক্লান্ত, এবং নিদ্রাকাতর হইয়া পড়িয়াছি, আমার পা দুইখানি অসাড় হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমি আধ খোলা দরজায় হেলান দিয়া চোখ বুঁজিলাম। এইভাবে অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর হঠাৎ একটি লোক আমার সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া পড়িয়া গেল, অবশ্য আমরা দুইজনেই একসঙ্গে পড়িয়া গেলাম। প্রথমে ইহা দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু লোকটি সটান মাটিতে পড়িয়া নাক ডাকাইতে লাগিল। অনেক চেষ্টা করিয়া নিজে খাড়া হইলাম এবং লোকটিকে তুলিবার চেষ্টা করিলাম, ঠাণ্ডায় মারা যাইতে পারে এমন ভয় ছিল। বহু কষ্টে তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিলাম এবং টানিতে টানিতে দেয়ালের কাছে আনিয়া তাহার সঙ্গে উহার পিঠ ঠেকাইয়া দিলাম। এতক্ষণে সে তাহার জ্ঞান কিছু ফিরিয়া পাইয়া কেন যেন আমার উপর ভীষণ খাপ্পা হইয়া উঠিল এবং চিৎকার করিয়া কি বলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে রেলওয়ে পোর্টার ফিরিয়া আসিতে আমি তাহাকে ফিরিয়া গিয়া ভিতরের লোকদের কাছে ইহার অবস্থার কথা জানাইতে বলিলাম। অতঃপর আমরা আরও কিছুদূর চলিবার পর একটি হোটেলে গিয়া পৌঁছিলাম। এইখানে সে আমাকে স্টেশন মাস্টারের দেওয়া বাড়তি মাশুলের রসিদখানি দেখাইল। তাহাকে তাহা দিলাম, এবং তাহার নিজের পাওনাও গ্রহণ করিয়া ইঙ্গিতে আমাকে বুঝাইল যে, যেটুকু রাত্রি অবশিষ্ট আছে, সেটুকু আমাকে এই হোটেলেই ঘুমাইয়া কাটাইতে হইবে। তাহার পর সে একখণ্ড কাগজে আউস্‌সিগ শব্দটি এবং তাহার পরে ৯-১৮ লেখাতে বুঝিতে পারিলাম, এই শহরটির নাম আউস্‌সিগ এবং বোডেনবাখ-ভিয়েনা লাইন এই শহরের পাশ দিয়া গিয়াছে এবং আমাকে ৯-১৮তে ট্রেন ধরিতে হইবে। আমার অনুমান সত্য। ঠিক সময়ে ট্রেন ধরিয়া ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আউসসিগ হইতে ভিয়েনা দীর্ঘ পথ। ট্রেনটি তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে তুষার-ঢাকা দেশের উপর দিয়া। যেন বিরাট এক তুষার-সমুদ্র, মাঝে মাঝে বড় পাহাড় মাথায় তুলিয়া আছে, ছোট ছোট পাহাড় অসংখ্য, গভীর খাদ মাঝে মাঝে দেখিতেছি, ঘন পাইন বন, এবং শহর ও গ্রামগুলি এই পটে ছবির মত দেখাইতেছে। প্রাচীন ভাঙা কাস্‌ল্‌ উচ্চ পাহাড়ে

মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে। বসন্তকাল না আসা পর্যন্ত এ তুষার জমি হইতে নড়িবে না। কেবল মনে হইতেছিল ব্রিটেনে, ফ্ল্যাণ্ডার্সে অথবা ফ্রান্সে জমি যেমন বেড়া-গাছে সুন্দর ভাবে ঘেরা দেখিয়াছি, এখানেও যদি সে রকম থাকিত তাহা হইলে চোখদুটি কিছু বিশ্রাম পাইত। কণ্টকিত পত্র হলি, হর্ণবীম, বীচ, দীর্ঘশাখাযুক্ত এল্‌ডার অথবা শোভনদৃশ্য সুইট ব্রায়ার, ব্ল্যাক-থর্ণ, হোয়াইট-থর্ণ, ইউ, অথবা প্রিভেট, এই সব গাছের নিরেট ঘন দুর্ভেদ্য বেষ্টনী রচনা যাহা ইংল্যাণ্ডের ক্ষেতে দেখিয়াছি, এখানে তাহা নাই, তাই এ দৃশ্য বৈচিত্র্যহীন বোধ হইল। ছাঁটকাটহীন উদ্দাম বৃদ্ধির প্রশ্রয় Euphorbias, Jatrophas এবং Zizyphus প্রভৃতি দেখায় অভ্যস্ত আমার স্বদেশবাসী আমার বেড়াঘেরার সৌন্দর্য লইয়া কবিত্ব করিতে দেখিয়া হাসিবেন, কিন্তু যত্ন রুচি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, জীবনের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারেও কি পরিমাণ সৌন্দর্য যোগ করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহাদের ধারণা নাই বলিলেই চলে। গাড়ির কামরায় আমার সহযাত্রী ছিলেন একজন অস্ট্রিয়ান সামরিক অফিসার। — লেফটেনান্ট এ. বুয়ের্‌গের অভ পেটের্স্‌গের্সে। সমস্তদিন প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর আমাকে তিনি একটি করিয়া সিমার দিতেছিলেন এবং কপালে হাত দিয়া দুঃখ করিতেছিলেন, তিনি ইংরেজী জানেন না, জানিলে আমার সহিত আলাপ করিতে পারিতেন। পৃথিবীটা এতই স্বার্থপর যে সে কখনও ভাল হইতে পারে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে প্রায়ই সন্দেহ জাগে। সম্ভবতঃ পৃথিবীটা যেমন হওয়া উচিত তেমনি দেখিবার উগ্র আগ্রহ হইতেই এরূপ সন্দেহ জাগে। ভুল হয়, ইহার যদি একটি উজ্জ্বল দিক থাকে, তেমনি ইহার একটি অন্ধকার দিকও থাকিতে পারে। কিন্তু সে যাহাই হউক আমার এই সহযাত্রীর ন্যায় লোককে দেখিলে মনে হয় পৃথিবীটা বাস করিবার পক্ষে খারাপ নহে। অপরাহ্নে আমরা প্রাগ অতিক্রম করিয়া গেলাম এবং দ্বিনা অতিক্রম করিবার সময় সন্ধ্যা নামিয়া আসল। ইহার পরেই সাম্রাজ্যিক শহর ভিয়েনার সীমানার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমি গিয়া উঠিলাম হোটেল মেট্রোপোলে। এইখানে অ্যামেরিকান ও ইংরেজ পর্যটক আসিয়া উঠেন। কিন্তু আমি এ শহরে প্রকৃত পক্ষে এম. এ দ স্কালার অতিথি হইলাম। প্রথাগতভাবে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন, এবং আমাকে ভিয়েনা দেখাইবার ভার লইলেন। অনেক বিষয়েই শহরটি প্যারিসের মত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সর্বত্র, প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ, সব স্থানেই হাসিখুশি মুখ। ডানিউব নদী দেখিতে গেলাম, শহর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। সম্রাটের প্রাসাদও দেখিলাম। এটি নিজেই একটি মিউজীয়াম। একটি বিরাট গ্রন্থশালা আছে, বহু চিত্রের সংগ্রহ এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ক অনেক বস্তু, এবং খনিজ তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব বিষয়ক অনেক সংগ্রহ আছে। মূল্যবান্ পাথর ও মুদ্রাও অনেক রহিয়াছে।

ভিয়েনা এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে আমার সর্বাপেক্ষা অধিক যাহা মনোহরণ করিয়াছে তাহা এই যে এই সব দেশের গভর্মেণ্ট বিদেশে ব্যবহারের উপযোগী নানা জিনিস উৎপাদনের জন্য নিজ নিজ দেশের লোকদিগকে অবিরাম উৎসাহ দিয়া চলিয়াছেন। ভিয়েনাতেও বহু জিনিস বিদেশে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হয়। পৃথিবীর সর্বত্র অস্ট্রিয়ার কনসাল

রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই সব দেশের প্রয়োজন কি, চাহিদা কত, কি মূল্য, শুল্ক কি পরিমাণ, ইত্যাদি যাবতীয় সংবাদ নিয়মিত দেশের গভর্মেন্টের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। এই সব সংবাদ সাপ্তাহিক সার্কুলারে মুদ্রিত হয়। ইহার সম্পাদনা করেন এম. এ. দ. স্কালা। দূতাবাসগুলি হইতে নানা নমুনাও পাঠান হইয়া থাকে, যাহাতে তাহার অনুকরণে সেই সব প্রস্তুত হইতে পারে। এ চেষ্টা তাঁহাদের ব্যর্থ হয় নাই। জার্মানির প্রস্তুত শুধু যে ইউরোপ হইতেই ইংল্যাণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদি উচ্ছেদ করিতেছে তাহা নহে, খাশ ইংল্যাণ্ডেও সাফল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। ভারতে যে ধরনের আদিকালের উৎপাদন ব্যবস্থা চলিতেছে তাহাতে জার্মানদের পদ্ধতি এদেশে প্রবর্তন করায় কিছু লাভ হইবে না। এমন কি ইংল্যাণ্ডেও এমন কোনও কেন্দ্রীয় অফিস নাই যেখানে বসিয়া সমস্ত ব্যক্তিগত উত্যমের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সকলকে পরামর্শ ও কর্মপ্রেরণা দান করা যাইতে পারে। এসব ব্যাপারে আমরা সবেমাত্র ট্রিপোটোলেমাস ইয়েলোলির স্তরে পৌঁছাইতেছি মাত্র। (স্কটের 'দি পাইরেটস' দ্রষ্টব্য।) ভিয়েনাতে অনেক বিজ্ঞানসেবীর সঙ্গে পরিচিত হইলাম, ইঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হের এম ফ্রাইশনার, রোয়েৎসিনা, ফিন্‌শ্‌, শিনডাশনের, বেক, ফ্রাৎস হেগের, কার্ল আনটন, লুডহ্বিগ, ফন লোরেন্‌স, লিবুরনাউ এবং আউগুস্ট ফন সেল্‌ৎসাইন। ইঁহাদের সঙ্গে এবং কয়েকজন বণিকের সঙ্গে ভারতীয় চা ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য অস্ট্রিয়ায় প্রচলন করা যাইতে পারে কি না সে বিষয়ে আলোচনা করিলাম। তাঁহারা এবিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন বলিলেন।

২৭ শে ডিসেম্বর সোমবার আমি ভিয়েনা ত্যাগ করিলাম। পরদিন অধিকাংশ সময় অস্ট্রিয়ান আল্‌প্‌স পর্বতমালা পার হইতে কাটিয়া গেল। এই পর্বতমালা দেখিতে হিমালয়ের মত কিন্তু সে রকম উচ্চ অথবা খাড়া নহে। পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে এমন কয়েকটি স্রোতস্বিনীর গতিপথ ধরিয়া রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। এই সব পাহাড় উচ্চতায় চার হাজার ফুটের বেশি নহে। আল্‌প্‌স পর্বত অঞ্চলের কৃষকদের অবস্থা তাহাদের ছোট ছোট কুটির দেখিয়া মনে হইল না যে খুব ভাল। হিমালয় পর্বতের ধারের কনাইত এবং কোলিদের ছোট ছোট গর্তঘরের মত ইহাদের বাসগৃহ। অপরাহ্নে আমরা ইটালির সীমান্তে পঁতেব্বা নামক একটি ইটালিয়ান শহরে আসিয়া পৌঁছিলাম। আল্‌প্‌স-এর ইালিয়ান অংশ পার হইতে আরও কিছু সময় লাগিল। তাহার পর আমরা সমতল ভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। রাত্রি ১০-৫৫টায় আমি ভেনিসে পৌঁছিলাম।

আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইবার পূর্বে কিছুক্ষণ ধরিয়া ভেনিস ও ইটালির মূল ভূখণ্ড যুক্তকারী একটি সেতুর উপর দিয়া চলিলাম। ভেনিসবাসীর ভাষায় টেরা ফার্‌মা। দুই ধারে ল্যাগুনের বা মরা সমুদ্রের অগভীর জল, দূর আড্রিয়াটিক সমুদ্রের দিকে বিস্তৃত। এই জল ২০০ বর্গ মাইল অধিকার করিয়া আছে। একটি প্রকৃতি-সৃষ্ট ডাইক বা এমব্যাংকমেণ্ট—লিত্তোরাল—অধুনা লুপ্ত রাজ্যের জমিদারিকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। কয়েকটি খাল লিত্তোরালকে ভাগ করিয়া দিয়াছে, জোয়ারের সময় ইহার ভিতর দিয়া নৌকা চলে এবং মরা সমুদ্র বা ল্যাগুনের মধ্যস্থ কৃত্রিম খালে প্রবেশ করে। পনের শত বৎসর পূর্বে জোয়ার

আসিয়া যখন এই মরা সমুদ্রে প্রবেশ করে, সে সময় কয়েকটি ছোট ছোট দ্বীপ ইহার ভিতর হইতে মাথা তুলিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটি খুব ছোট ছোট দ্বীপের গুচ্ছ ছিল। উহাই এই ভেনেৎসিয়ার ভ্রূণ অবস্থা। আমাদের লক্ষ্মী যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন, এই ভেনেৎসিয়াও জল হইতে তেমনি উঠিয়া কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া এশিয়া মাইনর পর্যন্ত তাহার শাসনসীমা বিস্তার করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই জলাভূমিতে অবস্থিত ছোট ছোট দ্বীপগুলি মূল ভূখণ্ড হইতে আগত অগণিত পরিবারকে আশ্রয় দিয়াছে। ইহারা অ্যালারিকের পরিচালনাধীন বর্বরদের ও অ্যাটিলার হাত হইতে বাঁচিবার জন্য এখানে ছুটিয়া আসিয়াছিল। এখানে ইহাদের জীবন দীর্ঘকাল এমনই করুণ এবং শোচনীয়ভাবে কাটিতেছিল যে রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসকামীরাও ইহাদিগকে অনুকরণ করিবার কোনও উৎসাহ বোধ করে নাই। তাহাদের নৌকা ভিন্ন কোনও সম্পত্তি ছিল না, মাছ ব্যতীত কোনও খাদ্য ছিল না, লবণ ভিন্ন অন্য কোনও খনিজ দ্রব্য ছিল না। রোম একদিনে নির্মিত হয় নাই, ভেনিসও তাহাই। কয়েক শতাব্দী লাগিয়ছিল মূল ভূখণ্ডের অনেকখানি দখল করিয়া এখানে একটি শক্তিশালী সাধারণতন্ত্র গঠন করিতে। ঐ স্থানের আশ্রয়প্রার্থীদের উত্তরপুরুষগণ লেভান্টের দ্বীপগুলির উপর বিজয়পতাকা উড়াইয়া, ধর্ম অভিযান চালাইয়া, ইউরোপ ও এশিয়ার সমস্ত বাণিজ্য নিজেদের হাতে আনিয়া এমন একটি সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল, যাহাতে মৃত্যুর পূর্বে 'ডোজ' (তোম্মাসো মোচেনিগো) ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুশয্যায় ঘোষণা করিতে পারিয়ছিলেন—আমি দেশকে শান্তিপূর্ণ এবং সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় রাখিয়া যাইতেছি। আমাদের বণিকগণ এক কোটি সুবর্ণ মুদ্রা (ডুকাট) ব্যবসায়ে খাটাইতেছে, ইহা হইতে তাহারা প্রতি বৎসর চল্লিশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করিতেছে। আমাদের ৪৫টি গ্যালি জাহাজ আছে, তিনশোটি যুদ্ধ জাহাজ আছে, তিন হাজার বাণিজ্য জাহাজ আছে, এবং বায়ান্ন হাজার নাবিক আছে। এক হাজার উচ্চবংশের ব্যক্তি আছে, তাহাদের প্রত্যেকের আয় সাতশো হইতে চার হাজার ডুকাট। বড় নৌবহর পরিচালনার জন্য আটজন নৌঅফিসার আছে, ছোট ছোট নৌবহরের জন্য অপর একশো জন আছে। ইহা ভিন্ন বহুসংখ্যক রাজনীতিবিদ্ আইনবিদ্ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি আছে। ভেনিস ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তবু তাহার এই উন্নতি নিকটস্থ কোনও প্রবল বাধা না থাকাতেই অধিক সম্ভব হইয়াছে, কারণ তাহাদের চরিত্রবল খুব বেশি ছিল না। নেপোলিয়ান বলিয়া গিয়াছেন ভেনিসবাসীরা স্বাধীনতার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। মিথ্যা বলেন নাই। বিচারকদের খেয়ালখুশির উপর বিচার নির্ভর করিত এবং বেনামা চিঠির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণ মানুষকে চরম দণ্ড দেওয়া হইত। যে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা, গোপনে বিচার করা, ভূগর্ভস্থ কক্ষে বন্দী করা বা হত্যা করা হইত, কিন্তু কেন, তাহা জনসাধারণের জানিবার উপায় ছিল না। ভেনিস ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খল পরাইয়াছে, অবশেষে চারিধারে শুধু শৃঙ্খল ছাড়া অন্য কিছু দৃশ্যমান হয় নাই। তথাপি ভেনিস সমৃদ্ধ হইয়াছে, এবং তাহার সাফল্য কয়েক শতাব্দী স্থায়ী হইয়াছে। 'ইউরোপে তখন অন্ধকারের যুগ, শুধু ভেনিসে আলো জ্বলিতেছিল—যদিও তাহা অত্যন্ত

ক্ষীণ। তাই শক্তির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাধিবার সঙ্গে সঙ্গে ভেনিস ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জেনোয়ার রিপাবলিক তাহাকে বার বার জলযুদ্ধে পরাভূত করিয়াছে, টার্কগণ তাহাদের দূরের যাবতীয় অধিকৃত স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, এবং শেষকালে অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে সে পণ্য সামগ্রীর ন্যায় ক্রীত-বিক্রীত হইয়াছে।

রিয়াল্‌টোর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া নানা চিন্তায় মাতিয়া ছিলাম। গ্র্যাণ্ড ক্যানালের উপর এই সেতুটি বিখ্যাত। একটি মাত্র স্ফটিকের খিলানের উপর দাঁড়াইয়া আছে। এই খালটিই ভেনিসের যানবাহন চলার বড় পথ। আমার দক্ষিণ দিকে রিয়ালটো—বিখ্যাত রিয়ালটো—ভেনিসের বণিক—দি মার্চাণ্ট অভ ভেনিস-এ যাহার উল্লেখ আছে। একটি ছোট্ট বাড়ি, এক মৎস্যজীবী বাস করে, আমাকে গাইড ঐ বাড়িটি দেখাইয়া বলিল, ঐখানে শাইলক দি জ্যু তাহার টাকার ভাণ্ডার রাখিত। সম্মুখের একটি উচ্চ অট্টালিকা দেখাইয়া গাইড বলিল ঐখান হইতে পথের অপর পার্শ্বে সর্বাধুনিক সংবাদ সম্বলিত বহু ছোট ছোট কাগজ নিক্ষিপ্ত হইত, পরে উহার প্রত্যেকখানি এক 'গাৎসেত্তা' মূল্যে বিক্রয় হইত। ইহা হইতেই আমাদের বর্তমান 'গেজেট' নাম হইয়াছে। এইভাবে আমার গাইড রিয়ালটোর বহু দর্শনীয় দ্রব্যাদি দেখাইল। ভেনিসের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় মনে হইল পিয়াৎসা, অর্থাৎ স্কয়ার অভ সেণ্ট মার্ক। এইখানে সেণ্ট মার্কের গীর্জা রহিয়াছে। ইহার প্রবেশদ্বারের উপরে ১২০৫ সনে কনস্টাণ্টিনোপল হইতে আনীত চারিটি অশ্বমূর্তি রহিয়াছে। নেপোলিয়ন কর্তৃক ইহা প্যারিসে নীত হইয়াছিল, কিন্তু পরে পুনরুদ্ধার করা হইয়াছে। চার্চের ভিতরে প্রচুর উৎকীর্ণ অলঙ্করণ ও মোজেইকের কাজ রহিয়াছে। সৃজন দৃশ্যে গডকে প্রবীণ ভদ্রলোকের চেহারায় দেখানো হইয়াছে, মুখ ডিম্বাকৃতি, চোখ দুইটি খুব উজ্জ্বল নহে, কৃষ্ণবর্ণ শিরে মুকুট শোভা পাইতেছে, ইহার পর ডোজের প্রাসাদের সভাগৃহগুলি ও ভূগর্ভস্থ কক্ষগুলি পরিদর্শন করিলাম। অস্ত্রাগারে এইখানে প্রাচীনকালে আড্রিয়াটিক সমুদ্রের বিবাহে যে নৌকা ব্যবহৃত হইত তাহার মডেল রহিয়াছে। আসল নৌকাখানিতে সোনার কাজ করা ছিল। সেই সোনার জন্য নেপোলিয়ান নৌকাটিকে ভাঙ্গিয়া সোনা সংগ্রহ করেন। পোপ স্বয়ং ডোজদিগকে আড্রিয়াটিকের সঙ্গে বিবাহ দিতেন। ১১৭৭ সনে ডোজ পোপের কয়েকটি কাজ করিয়া দেওয়াতে তাহার বিনিময়ে ডোজ জিয়ানিকে একটি অঙ্গুরী দিয়াছিলেন। দিবার কালে বলিয়াছিলেন, সমুদ্রের উপর কর্তৃত্ব জ্ঞাপক এই অঙ্গুরীটি গ্রহণ কর। প্রতি বৎসর তুমি ও তোমার পরবর্তীগণ চিরকাল ধরিয়া সমুদ্রকে বিবাহ করিবে। ইহাতে সকলে জানিতে পারিবে সে তোমাদের অধিকারে রহিয়াছে, এবং স্ত্রী যেমন স্বামীর শাসনাধীনে থাকে তেমনই আমি এই সমুদ্রকে তোমাদের শাসনাধীনে সমর্পণ করিতেছি। ভেনিসে কাঁচ ও লেস্ শিল্প প্রতিষ্ঠান কয়েকটি দেখিলাম। এগুলির বাণিজ্যিক মূল্য যথেষ্ট। সেণ্ট মার্কোর গ্র্যাণ্ড হোটেল ভিকটোরিয়াতে আমার এক সিন্ধুবাসী ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

ভেনিস হইতে আমি ফ্লোরেন্সে আসিলাম। বহু বিস্তীর্ণ শুভ্র তুষারক্ষেত্র পার হইয়া আসিতে আমি এট্রাস্‌কান অ্যাপেনিন পর্বতমালা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। কোথাও সবুজের

চিহ্ন নাই, উচ্চ চূড়া পৃষ্ঠ অনুর্বর, এবং শূন্য, সমতল ক্ষেত্র হইতে তিন হাজার ফুট উচ্চে মাথা তুলিয়াথে, কিন্তু নিম্ন পার্শ্বক্ষেত্র চেস্টনাট ও কাঠপ্রদানকারী বৃক্ষ সমূহে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। অ্যাপেনিনের ভিতর হইতে বহু স্রোতস্বিনী তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। ডান্টে তাঁহার 'ইনফারনো' ৩০ সর্গে ইহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ইহারা ছুটিয়া আসিয়া আরনো নদীতে পড়িতেছে। ফ্লোরেন্স ফুলের শহর। চারিদিকের দৃশ্য অপরূপ। এখানে ভাগ চাষীদের খামার, ওখানে দ্রাক্ষাক্ষেত, ফুলের বাগান, চিত্রার্পিতবৎ ভিলাসমূহ। ফ্লোরেন্সে বাহিরের পরিদর্শকেরা একবার ডুয়োমো ক্যাথিড্রাল দেখেন। ইহার সুদৃশ্য গম্বুজ মাইকেল এঞ্জেলোকেও মুগ্ধ করিয়াছিল। ডুয়োমোর নিকট সাঁ জিওভানির ব্যাপটিস্টারিতে গাইড আমাকে তিনটি ব্রঞ্জ নির্মিত প্রবেশদ্বার দেখাইল। বা-রিলীফ পদ্ধতিতে প্রস্তুত। অর্থাৎ যে সব মূর্তি তাহাতে উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহা তল হইতে সামান্য উচ্চ। মাইকেল এঞ্জেলো ইহাদের দুইটিকে তাঁহার চিত্রে 'স্বর্গের দ্বার' নামে বিখ্যাত করিয়াছেন। কিন্তু এ স্থানের সর্বাপেক্ষা দ্রষ্টব্য আমার কাছে গ্লি উফফিৎসি, যাহাতে ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত শিল্প সংগ্রহ রহিয়াছে। ইতিপূর্বে আর কোথাও এমন আশ্চর্য সুন্দর সব পেইন্টিং, উৎকীর্ণ চিত্র, ভাস্কর্য, ব্রঞ্জ মূর্তি, মুদ্রা, মণিরত্ন এবং মোজেইক দেখি নাই। আমি রাফায়েল চিত্রিত ম্যাডোনার সম্মুখে আধ ঘণ্টার উপর দাঁড়াইয়াছিলাম, তবু সরিয়া যাইতে মন চাহিতেছিল না। দেখিলাম একজন মহিলা শিল্পী উহার মিনিয়েচার পেইণ্ট করিয়া লইতেছেন। তখন কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মিনিয়েচারটি আমাকে বিক্রয় করিতে পারেন কি না। আমি ভাবিয়াছিলাম কুড়ি ফ্রাঁর অধিক হইবে না। কিন্তু তিনি তিনশো ফ্রাঁ চাহিলেন। অত দিবার আমার সাধ্য ছিল না। ফ্লোরেন্সের প্রধান চার্চগুলি দেখিলাম, বিশেষ করিয়া সাঁ লোরেনৎসো এবং সাঁতা ক্রোচে। সাঁতা ক্রোচে চার্চে গ্যালিলিও, ডান্টে, মাকিয়াভেল্লি, মাইকেল এঞ্জেলো, আলফেরি ইত্যাদির মনুমেন্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে ধারণা হইবে সে সময় কত বিখ্যাত ব্যক্তি এই ফ্লোরেন্সে জন্মিয়াছেন। আমি সব সময়েই ভাবিয়াছি মাকিয়াভেল্লির এত দুর্নাম কেন। তাঁহার 'দেল প্র্যাঁসিপ' গ্রন্থে তিনি যাহা বলিয়াছেন সভ্য দুনিয়ার আচরণ তাহা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা ত আমরা প্রতিদিনই দেখিতেছি। প্রিন্স কিভাবে বিশ্বস্ততা বজায় রাখিবে? তিনি ইহার উত্তর দিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থের ১৮ সংখ্যক অধ্যায়ে। কিন্তু নীতিবাদীগণ অথবা মাকিয়াভেল্লির সমর্থকগণ ইহার যে উত্তরই দিন, এ প্রশ্নের বাস্তব উত্তর সব সময়ই প্রিন্সের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে। প্রিন্সের শ্রেষ্ঠ রক্ষীদুর্গ প্রজাবর্গের প্রীতি মাকিয়াভেল্লি বলিয়াছেন। তিনি কৌশলী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল কৌশল সত্ত্বেও তিনি মেদিচিগণকে ফ্লোরেন্সের বাহিরে রাখিতে পারেন নাই। তিনি সাধারণ তত্ত্ববাদী ছিলেন না। প্রথম জীবনে তিনি সফল কর্মী ছিলেন, এবং তথ্যের দিকে তাঁহার খুব নজর ছিল। তত্ত্ববাদীদিগকে কর্মক্ষেত্রে নামাইবার চেষ্টা পৃথিবীর পক্ষে নিষ্ঠুরতা ব্যতীত আর কিছু নহে। তাঁহাদিগকে নিজ নিজ তত্ত্ব লইয়া স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রনীতি বিষয়ের লেখকরূপে বিষ্ণুশর্মা এবং বাস্তব রাষ্ট্রনৈতিক কর্মীরূপে

চাণক্য অপেক্ষা মাকিয়াভেল্লি বহুগুণে নিম্নস্তরের। ফ্লোরেন্সের অধোগতি দুঃখের বিষয়। যে সাফল্য সে লাভ করিয়াছিল, তাহার উপযুক্ত ছিল সে। ছোট্ট শহর হইতে সে সমৃদ্ধিতে অনেক বড় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সামরিক খ্যাতির প্রতি আমার কোনও আস্থা নাই। তাহার গণতান্ত্রিক নীতিতে সে অভিজাত সম্প্রদায়কে শাসন বিভাগের সকল প্রকার কাজ হইতে দূরে রাখিতে পারিয়াছিল ইহা বিস্ময়ের বিষয়। পক্ষান্তরে ভেনিস তাহার 'গোলডেন বুক'-এ অভিজাত বংশের বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদের নাম তালিকাভুক্ত করিতেছিল কারণ তাহারাই একমাত্র রাজকার্যের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সিনিয়র গিগলিওলি জুওলজির অধ্যাপক, তাঁহার নিমন্ত্রণেই আমি ফ্লোরেন্সে আসিয়াছি। অপর এক অধ্যাপক, সিনিয়র কারনেল, এবং সিনিয়র পাওলো মাঁতে গাৎসা, সেনেটর, এই শহরে অবস্থানকালে আমাকে যথেষ্ট খাতির করিয়াছেন। বিজ্ঞানের মিউজীয়াম সমূহ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। প্রাণী বিজ্ঞান বিভাগে যে সব অস্থি কঙ্কাল প্রভৃতির মডেল আছে তাহা খুব মূল্যবান্। একদল বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে গত শতাব্দীতে (অষ্টাদশ) এগুলি নির্মিত হইয়াছে, এবং এগুলির প্রত্যেকটি অংশ বৈজ্ঞানিক বিচারে নির্ভুলভাবে প্রস্তুত। ফ্লোরেন্স হইতে অতঃপর আমি রোমে আসিলাম।

১৮৮৬ সনের ৩১শে ডিসেম্বর আমি এই মহৎ নগরীটির সঙ্গে প্রথম পরিচিত হইলাম। কত শতাব্দী ধরিয়া রোম পাশ্চাত্ত্য জগতের রাষ্ট্রনৈতিক, আধ্যাত্মিক ও নীতিধর্মের পরিণাম নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। এসকুইলিন পাহাড়ে উচ্চভূমিতে নির্মিত কনটিনেন্টাল হোটেলে উঠিয়াছিলাম। প্রাচীন রোমের এইটি mons Esquilinus। সেরভিউস তুল্লিউস যে সাতটি পাহাড় রোমের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছিলেন এইটি তাহাদের সপ্তম ও শেষ। সেজন্য ইহার নাম হইয়াছে সাত পাহাড়ের শহর। এই পাহাড় শুনিয়া কেহ মনে ভাবিবেন না ইহা উত্তর ভারতের হিল স্টেশনে যেমন দেখা যায় তেমন পাহাড়। আগে এগুলি কেমন ছিল জানি না, বর্তমান রোম যে পাহাড়ে নির্মিত সেগুলি সামান্য উচ্চ স্থান মাত্র। সবটা একত্রে সাধারণ ডাঙ্গা জমি বলিলেই ঠিক হইত কিন্তু শহরের গৌরবময় অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ তাহা বলিলাম না। কৃষি বিভাগের সচিব সিনিয়র নিকোলা মিরাগলিয়ার সঙ্গে প্রথমে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ইটালিয়ান গভর্মেন্টের নিকট আমার নাম খুব অপরিচিত ছিল না। কারণ অল্পদিন পূর্বে, আমাদের ভাইসরয়ের অনুমতিক্রমে ইটালিয়ান গভর্মেন্ট রোমে নির্মিত একটি সোনার ঘড়ি ও চেন আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। সিনিয়র মিরাগলিয়া তাঁহার সেক্রেটারি সিনিয়র তুতিনোর সহিত আমাকে রোমের বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানগুলি দেখাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার পর আমি হাতে যেটুকু সময় ছিল তাহা রোমের দৃশ্যাদি দেখিবার কাজে ব্যয় করিলাম। বিখ্যাত সকল স্থানই দ্রুত দেখিয়া গেলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভ্যাটিক্যানের ভিতরে যাইতে পারিলাম না, কারণ তখন ছুটি চলিতেছিল, এবং বিশেষ অনুমতি সংগ্রহ করিবার সময় আমার ছিল না।

অবশ্য কলোসিয়াম (কোলোসিউম) অথবা ফ্লাবিয়ান অ্যামফিথিয়েটার দেখিয়াছি। ইহার আরম্ভ হইয়ছিল ভেসপাসিয়ানের দ্বারা এবং জেরুসালেম ধ্বংসের দশ বৎসর পর, ৮০

খ্রীষ্টাব্দে, ইহার নির্মাণ কার্য শেষ হয়। রোমে ঐতিহাসিক এত জিনিস আছে যে ইহার যে-কোনও একটি লইয়া যে-কোন ব্যক্তি রোম সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করিতে পারে। দেখিলেই অতীতের ছবিটি মনে জাগিয়া উঠে, মনে কত ভাবের উদয় হয়। আমারও এইরূপই মনে হইতেছিল যখন আমি কলোসিয়ামের দ্বিতীয়তলে দাঁড়াইয়া নিচের সুবিস্তীর্ণ অ্যারিনা বা আঙ্গিনা দেখিতেছিলাম। এইখানে গ্লাডিয়েটরগণ মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইত, এবং বন্য জন্তুগণ গর্জন করিতে করিতে ইহাদের সঙ্গে লড়াই করিত, আর সম্রাট্‌গণ, সিনেটরগণ, ভেস্টাল ভার্জিনেরা এবং তৎসহ সাতাশী হাজার রোমবাসী দর্শক তাহাতে আমোদ অনুভব করিত। উন্মুক্ত গ্যালারিতে এত দর্শকের স্থান হইত। ডোরিক, আইয়োনিক এবং কোরিনথিয়ান ভঙ্গির স্তম্ভের উপর এই গ্যালারির খিলান নির্মিত হইয়াছিল। সেদিনের সমস্ত চিত্রখানি আমার মনশ্চক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং লেখকদের ফ্যাশান ছিল মহম্মদের নিন্দা করা। তাঁহাকে পৃথিবীর চোখে নির্মমতম ভ্যাণ্ডাল বলিয়া জাহির করা। কিন্তু যখন নিজ চোখে দেখিলাম মন্দিরগুলি গীর্জায় পরিণত হইয়াছে, প্রাচীন সৌধগুলির অলঙ্করণ ভাঙ্গিয়া খ্রীস্টান অট্টালিকা গড়া হইয়াছে, দেবদেবীদিগকে খৃস্টান কালাপাহাড়েরা এমন করিয়া নষ্ট করিয়াছে যে তাহা আর চিনিবার উপায় নাই, তখন আমি আমার বাল্যকালে খ্রীস্টান শিক্ষকদের নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহা স্মরণ করিয়া না হাসিয়া পারি নাই। পৃথিবীর সকলেই একটি কথা ভুলিয়া যায় যে, খ্রীস্টান হউক, মুসলমান হউক বা হিন্দু হউক, তাহার সৎকাজ বা অসৎকাজ সেই ব্যক্তির উপর নির্ভর করে, ধর্মের উপর নহে। একজন ব্র্যাডল, বহু ধর্মোপদেষ্টা হইতে উচ্চস্তরের, কুমীর পবিত্র গঙ্গামাতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও সে কুমীরই থাকিয়া যায়।

রোমের আবির্ভাবের আগে ক্যাপিটল পাহাড়ের নাম ছিল শনি। কথিত আছে শনিদেবতা এইখানে একটি নগর গড়িয়াছিলেন। একদা শনিদেব অন্যান্য দেবতাদের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠেন, কারণ তিনি তাঁহার পিতা ইউরেনাসকে কাস্তের সাহায্যে অঙ্গহানি ঘটাইয়াছিলেন, এবং তাহার এক কুৎসিত অভ্যাস ছিল নিজ সন্তান জন্মিবামাত্র খাইয়া ফেলা সেইজন্যই তিনি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া তাঁহার অস্থায়ী বাসের জন্য ক্যাপিটল পাহাড় মনোনীত করিয়াছিলেন। অস্থায়ী, কারণ তাঁহার ধারণা ছিল তাঁহার কুকার্য স্বর্গের বন্ধু এবং আত্মীয়বর্গ কিছুদিনের মধ্যেই ভুলিয়া যাইবে, তখন তিনি ফিরিয়া যাইতে পারিবেন। তিনি এখানে আসিয়া দেখেন, ইটালির লোকেদের বড়ই দুরবস্থা, তাহারা বর্বরতার চূড়ান্ত অবস্থায় বাস করিতেছে। তাহাতে দুঃখবোধ করিয়া তাহাদের বৃক্ষ-কোটর, গুহা প্রভৃতির বাস হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে কি করিয়া সভ্য জীবন যাপন করিতে হয়, ঘরবাড়ি নির্মাণ করিতে হয়, জমি চাষ করিতে হয় তাহা শিখিবার জন্য তিনি অনুরোধ উপরোধ এবং তাঁহার যাবতীয় বাক্‌ক্ষমতা প্রয়োগ করিলেন। আমার গাইড বলিল, একজন নিকৃষ্টধর্মী পেগান দেবতা এমন ভাল শাসনকর্তা হইতেই পারে না।

আধুনিক কালে পালাৎসো দেল কাঁপিদোগলিওতে একটি মনোরম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। কবি পেট্রার্কাকে এইখানে লরেল ভূষিত করা হইয়াছিল সে সময়। সেটি ১৩৪১ সনের কথা। পেট্রার্কা একজন অসামান্য ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাঁহার ভাবাবেগপূর্ণ প্রেম কাহিনী তাঁহার সময়ে সমস্ত ইউরোপে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়াছিল। ফ্লোরেন্সে তাঁহার জন্ম, কিন্তু তাঁহার পরিবারকে এই স্থান হইতে নির্বাসিত করাতে তিনি আভিনিয়ঁতে চলিয়া যান। ১৩২৭ সনে একটি চার্চে লরা নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং তাঁহার মনে তাহার প্রতি দুর্জয় প্রেম জাগিয়া উঠে। লরা ছিল অপরের স্ত্রী। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরণ (তাঁহার মৃত্যু হয় ১৩৭৫ সনে) তিনি লরার প্রতি তাঁহার নিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং এই প্রেম স্বভাবতঃই ছিল আত্মিক প্রেম। দূর হইতে তিনি তাঁহার দেবীকে মনে মনে পূজা করিতেন, এবং তাঁহার কাব্যে প্রধানতঃ এই প্রেমের বিষয়ই স্থান পাইয়াছে। ইটালিয়ান গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে ইহার স্থান উচ্চ। লরা বৃদ্ধ হইয়া পড়িল, তাহাদের সৌন্দর্য গত হইল, কিন্তু তখনও পেট্রার্কা তাঁহার দুর্জয় প্রেমের নিষ্ঠা অপরিবর্তিত রাখিয়াছেন। তাঁহার বন্ধুগণ ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি বলিয়ছিলেন "plaga per allentar l'arco mon sana—ধনু আর আঘাত হানিতে পারে না, কিন্তু মারাত্মক আঘাত সে পূর্বেই হানিয়াছে। আমি যদি তাহার দেহকে ভালবাসিতাম তাহা হইলে আমার বহু পূর্বেই পরিবর্তন ঘটিত।" পরিচিত পারসিক কাহিনীর মজনুন তাহার প্রণয়িনী সম্পর্কে বন্ধুদের প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিল তাহা অন্য জাতের। মজনুন ছিল সুপুরুষ যুবক, তাহার প্রণয়িনী ছিল কুৎসিত-দর্শনা বালিকা। তাহার এই রুচিতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তাহার বন্ধুরা সে কথা বলিলে তাহার উত্তরে মজনুন বলিয়াছিল, "হায়, তোমরা যদি মজনুনের দৃষ্টিতে লয়লাকে দেখিতে!"

আমার রোমের গাইডটি একজন দেশপ্রেমিক। ১৮৪৯ সনে ফরাসীরা যখন রোম ঘিরিয়া ফেলে তখন এই লোকটি অবরুদ্ধদের মধ্যে ছিল। ইটালির সংহতি ও স্বাধীনতার জন্য এই গাইডটি গ্যারিবালডির অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার দেশপ্রেম প্রশংসনীয়, কিন্তু উহা একদেশদর্শী। ইটালি যোদ্ধাদের খাতির করিয়াছে বেশি, কিন্তু যাহারা অজ্ঞতা, দারিদ্র্য প্রভৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মরিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি বিশেষ ফিরিয়া চাহে নাই। সেজন্য এক দার্শনিক ইটালি সম্পর্কে বলিয়াছেন, the last refuge of scoundrelism। কিন্তু আমি যদি জনসনের মত সমালোচক হইতাম তাহা হইলে বলিতাম, Religion, philanthropy and partiotism are the last solace of unrestful disappointed. (ধর্ম, পরহিত এবং দেশপ্রেম, এই তিন, অশান্ত হতাশদের শেষ আশ্রয়)। আমরা প্রায়শঃ এমন ব্যক্তিদের দেখা পাই যাহাদের অদম্য উদ্যম ও উৎসাহ আছে, অথচ যাহারা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এবং এমন সব নরনারীকে দেখি যাহারা প্রথম জীবনের কোনও ভুলের জন্য স্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই ভুল সবসময়ে স্বকৃত নহে, অন্যের শয়তানিতে ঘটিয়াছে। এমন সব মানুষ তাহাদের সেই উৎসাহ ও শক্তি প্রকাশের কোনও দিকে সুযোগ না পাইয়া দেশপ্রেম ও ধর্মকর্মকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে, শয়তানেরা নহে। ইহারা নিচের

স্তরে পড়িয়া থাকে, এবং তাহাদিগকে যে প্রত্যেকেই (দার্শনিকও বাদ নহে) লাথি মারিয়া যাইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। দুনিয়ার দস্তুর ইহাদিগকে লাথি মারা।

ইটালি উপদ্বীপটির দৈর্ঘ্য পার হইয়া আসিবার কালে এখানকার কৃষককুলের দুরবস্থার কথা স্মরণ না করিয়া পারিলাম না। ইটালির জমি সুফলা। সিল্ক, সুরা, জলপাইয়ের তেল, এবং অন্যান্য অনেক জিনিস এখান হইতে বাহিরের বাজারে রপ্তানি হয়। কিন্তু যাহারা নিজহাতে পরিশ্রম করিয়া এসব উৎপাদন করে, জমি তাহাদের বিশেষ কিছুই দেয় না। উত্তর অঞ্চলের লমবার্ডিতে সিল্কগুটির চাষ হয়, কিন্তু যাহারা প্রায় পৌনে দুই কোটি তুঁতগাছ জন্মায় ও পালন করে তাহাদের বাস নিকৃষ্ট কুঁড়ে ঘরে। তাহাদের ভাগ্যে আহার্য যাহা মেলে তাহাতে তাহাদের কোনও মতে জীবন রক্ষা হয় মাত্র। কিন্তু এই যে তাহাদের শ্রমে ৫০ লক্ষ পাউণ্ড বার্ষিক আয় হয়, তাহা কি শুধুই যুদ্ধাস্ত্র, সৈন্যদের জন্য? এদেশের মধ্য অঞ্চলেও দারিদ্র্য রহিয়াছে, এবং দক্ষিণেও ঐ একই চিত্র দেখিলাম। নেপলস্ স্টেশন হইতে দ্রুত ছুটিয়া পমপেই-এর ট্রেন ধরিবার কালে রেলওয়ে পোর্টার বখশিশের জন্য অনুনয়-বিনয় করিতে থাকে। তখনই মনে পড়ে, হ্যাঁ, এইবার দেশের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি। মনে হয় যেন মহা ঐশ্বর্যশালী পূর্ব দুনিয়ার মশলার সুগন্ধ নাকে প্রবেশ করিতেছে।

আঠারশত নয় বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ৭৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট, অপরাহ্ন, প্রায় একটার সময় প্রকৃতি বিজ্ঞানের লেখক প্লিনির ভগ্নী, ভেসুভিয়াস পর্বত হইতে যে ধূম উদ্গিরণ হইতেছিল তাহার দিকে ভ্রাতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ঐ ধোঁয়া বিরাট এক বিপর্যয়ের সূচনা করিতেছিল। প্লিনি তাঁহার নৌকাগুলি সমুদ্রে ভাসাইয়া উহার আরও কাছে আসিলেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য। নিকটস্থ শহরগুলি যদি বিপন্ন হয় তবে সেখানকার লোকদের সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি নৌকা হইতে স্টাবাইতে অবতরণ করিতেই দেখিলেন, গভীর রাত্রির অন্ধকার হইতেও দিনটি বেশি অন্ধকার হইয়া উঠিল। মাটি ভীষণ ভাবে কাঁপিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে তপ্ত অঙ্গার ও চুনে পরিণত প্রস্তর খণ্ড চারিধারে বৃষ্টিধারার ন্যায় বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া খোলা মাঠের নিরাপদ স্থানে গেলেন, তাঁহার মাথার সঙ্গে এক বালিশ বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাঁচিতে পারিলেন না। দম বন্ধ হইয়া তিনি মারা গেলেন। মাটি, তপ্ত অঙ্গার, ঝামা-পাথর, এবং জ্বলন্ত কৃষ্ণ প্রস্তরখণ্ড ভেসুভিয়াস হইতে অবিরাম বর্ষণের ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই হেরকুলানিউম এবং পম্‌পেই শহর দুটি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। কালক্রমে পম্‌পেই শহর বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গেল, তাহার আশা আকাঙক্ষার সমাধি ঘটিল। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে নুচেরিয়ার সহিত তুচ্ছ কলহ বাধিয়া উঠিয়াছিল। যাহার ফলে নেরো পম্‌পেইকে শাস্তি স্বরূপ দশ বৎসরের জন্য সর্বপ্রকার নাটক অভিনয়ের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল, সমস্তই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। পম্‌পেইকে পৃথিবী বিস্মৃত হইল, যেমন বন্ধুগণ। আমি এবং আপনি বিস্মৃত হইবেন, এবং তখন আমাদের স্থলে 'অন্য আমি' এবং 'অন্য আপনি' দেখা দিবে। ১৬০০ বৎসর যাবৎ এখানে যে একটি শহর ছিল তাহা

কাহারও স্মৃতিতে রহিল না; এবং এই ১৬০০ বৎসর ধরিয়া এইখানে শস্য ফলিয়াছে, দ্রাক্ষালতা বর্ধিত হইয়াছে, অথচ ইহারই নিচে এতকাল ধরিয়া কত ঘরবাড়ি, দোকানপাট, থিয়েটারগৃহ, প্রাসাদসমূহ, মন্দির, বিচারালয়, অ্যামফিথিয়েটার, স্নানাগার, বন্দীশালা, রুটি কারখানা, পানথেয়ন, সালুস্টের গৃহ ইত্যাদি চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, খনন কার্যের ফলে এসব তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ১৭৫৫ হইতে এই খনন আরম্ভ হইয়াছে। দৃশ্যাদি বিষয়ে বলিবার বিশেষ কিছু নাই। দুটি শহর যে এই দুর্ভাগ্যের হাতে পড়িয়াছিল তাহাই ইহাদের আকর্ষণ। যে ভাবে ইহা প্রায় অক্ষত অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ১৮০০ বৎসর পূর্বেকার রোমান সমাজ-জীবনের উপর ইহা অনেকখানি আলোকপাত করিতেছে। নেপল্‌সের একটি মিউজীয়ামে এই স্থানের বহু মূল্যবান্ জিনিস সুরক্ষিত আছে। সমাধি হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত পম্‌পেই শহরটির পোর্তা দেল্লা মারিনা হইতে হেরকুলানিউমের গেট পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিলাম। পম্‌পেই হইতে পুনরায় নেপ্‌ল্‌স-এ ফিরিয়া আসিলাম।

প্রবাদ আছে, প্রয়াগে প্রথমে মাথা মুড়াও, তাহার পর হে পাপী, তোমার যেখানে মরিতে ইচ্ছা হয়, সেইখানে গিয়া মর। আর একটি প্রবাদ, মৃত্যুর পূর্বে নেপ্‌ল্‌স দেখিয়া লও। আমি এই দুইটি কার্যই করিয়াছি, এইবার আমি শান্তিতে মরিতে পারিব। তবে নেপল্‌স্ 'দেখিয়া লও' অর্থে দেখিয়াছি, বেশী দেখা হয় নাই, হাতে সময় কম ছিল। শুধু মিউজীয়ামগুলি, অ্যাকোয়ারিয়ামটি এবং ভার্জিলের সমাধি দেখিয়াছি। ক্যাটাকুম বা ভূনিম্নস্থ সমাধিগুলির নিকট পালাৎসিও কাঁপোদিমত-এ একটি সুন্দর মিউজীয়াম আছে, ইহাতে পেইণ্টিং, পোর্সিলেন ও অস্ত্রাদি আছে। মুজেও নাৎসিওনালে বড় একটি আর্ট গ্যালারি আছে, এবং মামির সুন্দর একটি সংগ্রহ আছে। ইহা ব্যতীত মোজেইক, স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার, মুদ্রা, পমপেই ও হেরকুলানেউম হইতে আনীত অন্যান্য অনেক জিনিস আছে। নেপল্‌সে একটি উৎকৃষ্ট অ্যাকোয়ারিয়াম আছে। ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত অ্যাকোরিয়ামে রক্ষিত মৎস্যগুলির বিবরণ ঐখানে বিক্রয় হয়, তাহাতে পরিদর্শনকারীর খুব সুবিধা হয়। ইহাতে মাছগুলির চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। ভার্জিলের সমাধির নিকট একটি বড় সুরঙ্গ আছে। সুরঙ্গের নেপল্‌স-এর দিকটিতে একটি ছোট পবিত্র স্থান আছে, সেটি একখণ্ড লাল কাপড় দিয়া ঢাকা। তাহার উপর কয়েকটি ছোট ও বড় আকারের পিতলে নির্মিত দেবতার মূর্তি যত্ন করিয়া রাখা আছে। পুরোহিত আমাকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল, তোমাকে কিছু পূজা দিতে হবে। উক্ত কাজ করিলাম। কয়েকটি তাম্রমুদ্রা মেঝেতে রাখিলাম। সামান্য হইলেও পুরোহিত খুশি হইলেন। কারণ তিনি, আরও দাও বলিলেন না। অতএব তাঁহাকেও একটি লিরা দিলাম। খুব খুশী হইলেন তিনি কিন্তু কি বলিলেন তাহা বুঝিলাম না। নেপল্‌স-এর ভেসুভিয়াস হোটেলে দুইজন পার্শী ভদ্রলোককে দেখিলাম, যদিও তাঁহাদের সঙ্গে আমি আলাপ করি নাই। নেপল্‌স হইতে সোজা ব্রিনদিসি চলিয়া আসিলাম। এখানে জাহাজ আমাকে আলেকজান্দ্রিয়াতে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ৩রা জানুয়ারি, ১৮৮৭ সকালে আমি ইউরোপ ত্যাগ করিয়া সাধারণ ডাক বহনের পথে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আট মাস সাতাশ দিন ইউরোপে বাস করিয়াছি।